NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

EPA

PAPER VIII

MODULES - 29, 30, 31 & 32

ELECTIVE PUBLIC
ADMINISTRATION
HONOURS

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ ঃ সেপ্টেম্বর, 2011

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

বিষয় ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঐচ্ছিক পাঠক্রম (অষ্টম পত্র) সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ ই. পি. এ. — 29

রচনা
অধ্যাপক পঞ্চানন চ্যাটার্জী

সম্পাদনা
অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায়

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ ই. পি. এ. — 30

রচনা
অধ্যাপক দেবাশীষ চক্রবর্তী

সম্পাদনা
অধ্যাপক অমিয় চৌধুরী

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ ই. পি. এ. — 31

রচনা
অধ্যাপক পিনাকী প্রসাদ ভট্টাচার্য

সম্পাদনা
অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ ই. পি. এ. — 32

রচনা
অধ্যাপক পিনাকী প্রসাদ ভট্টাচার্য

সম্পাদনা
অধ্যাপক অমিয় চৌধুরী

ঘোষণা

এই পাঠ সংকলেনর সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) বিকাশ ঘোষ
(কার্যনির্বাহী) নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

E.P.A. – 8

জনপ্রশাসনের ঐচ্ছিক পাঠক্রম

পর্যায়
29

একক	1	স্থানীয় সরকার	7-17
একক	2	স্থানীয় সরকারের আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি	18-23
একক	3	স্থানীয় রাজনীতি, স্থানীয় সরকার	24-27
একক	4	স্থানীয় সরকার, গণতন্ত্র ও উন্নয়ন	28-33

পর্যায়
30

একক	5	গ্রাম শাসনের বিবর্তন	35-59
একক	6	গ্রাম শাসনের কাঠামো	60-75
একক	7	গ্রামীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া	76-99
একক	8	গ্রামীণ শাসনব্যবস্থা : নব সাংবিধানিক মর্যাদা	100-116

পর্যায়
31

একক 9	নগর প্রশাসনের বিবর্তন	117-134
একক 10	নগর প্রশাসনের কাঠামো	135-164
একক 11	নগর প্রশাসনে রাজনীতি	165-170
একক 12	নয়া সাংবিধানিক মর্যাদা	171-181

পর্যায়
32

একক 13	মহিলা স্বায়ত্তশাসন	182-199
একক 14	স্বায়ত্তশাসন ও পরিবেশ	220-222
একক 15	মানবাধিকারের বিকাশ ও বিস্তার	223-236

একক ১ □ স্থানীয় সরকার—ধারণা ও রূপ

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য
১.১ প্রস্তাবনা
১.২ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ
১.৩ স্থানীয় সরকার—সংজ্ঞা ও ধারণা
১.৪ স্থানীয় সরকারের তত্ত্ব ও ঐতিহ্য
১.৫ স্থানীয় সরকার ও গণতন্ত্রের সম্পর্ক
১.৬ জন স্টুয়ার্ট মিলের প্রতিনিধিমূলক সরকার
১.৭ বিংশ শতাব্দীতে স্থানীয় সরকারের এক চ্যালেঞ্জসমূহ
১.৮ সারাংশ
১.৯ অনুশীলনী

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল স্থানীয় সরকার যে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াজাত একটি সরকার তা ব্যাখ্যা করা। এটা কেবল একটা নিছক প্রশাসনিক সংস্থা নয়। এটা একটা রাজনৈতিক সংস্থা।

১.১ প্রস্তাবনা

স্থানীয় সরকার-এর ধারণার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে স্থানীয় সরকার-এর ক্রমবিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

স্থানীয় সরকারের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে স্থানীয় সরকারের তত্ত্ব ও ঐতিহ্য আলোচনা করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার সম্পর্কে সনাতনী ভারতীয় ধারণা বা গান্ধীবাদী ধারণার আলোচনা না করে কেবলমাত্র পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের ধ্যানধারণায় স্থানীয় সরকারের চিন্তাসমূহের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। কারণ এখন স্থানীয় সরকার গণতন্ত্র ও ধারণাকে পাশ্চাত্য দেশের মডেলে বিচার-বিশ্লেষণ করা হচ্ছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও জন-প্রশাসনের সাহিত্যে।

তারপর স্থানীয় সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

এই এককে চেষ্টা করা হয়েছে অংশীদারী গণতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা ও উন্নয়ন রাজনীতিতে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করার।

১.২ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ

আধুনিক রাজনীতির আলোচনায় গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ বা Democratic Decentralisation হচ্ছে একটি বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় ধারণা। এই ধারণা অত্যন্ত জনপ্রিয়, কারণ এই ধারণা স্থানীয় জনসাধারণকে নিজেদের জীবনযাত্রা-সংক্রান্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয় পরিচালনার ব্যাপারে নিজেদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ইতিবাচক সুযোগ দান করে। এই ধারণা তৃণমূল স্তর পর্যন্ত গণতন্ত্রের বিস্তার ঘটায়। সর্বনিম্নস্তর পর্যন্ত প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রকে বিস্তার করার লক্ষ্যে এই ধারণা লক্ষ লক্ষ মানুষকে যুক্ত করে গণতন্ত্রকে বাস্তবে অর্থবহ করে তোলে। ভারতে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের রূপ হচ্ছে গ্রামীণ এলাকায় পঞ্চায়েত এবং শহরাঞ্চলে পৌরসভা এবং নগরাঞ্চলে পুরসভা।

এখন এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, স্থানীয় স্তরে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান 'জাতীয় উন্নয়ন ও জনগণের অংশগ্রহণের' জন্য খুবই জরুরী ও কার্যকরী উপায় এবং তা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হয়। সরকারের ক্ষুদ্র একক হিসাবে গণতন্ত্রের তৃণমূল প্রতিষ্ঠানগুলি জনগণের মধ্যে দায়িত্ববোধ সঞ্চার করে ও জনগণের মধ্যে গণতন্ত্রের মূল্যবোধগুলিকে উদ্দীপিত করে। শুধু তাই নয়, উন্নয়নমূলক কাজকর্মে ও জনগণের নানাবিধ কাজে স্থানীয় সরকার সুযোগদান করে। ভারতের মতো একটি উপ-মহাদেশীয় অঞ্চলে এই গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে 'পঞ্চায়েতীরাজ' ধারণা অতি প্রাচীন। কিন্তু সেই প্রাচীনতার ধারণায় আজকের ভারতে পঞ্চায়েত দেখতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক রাজনীতির গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ধারণার প্রেক্ষিতেই আজকের ভারতে পঞ্চায়েত, পুরসভা ও পৌরসভাগুলিকে দেখা যায়।

আধুনিক কালের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 'গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ' একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক তত্ত্ব। 'বিকেন্দ্রীকরণ' কথাটির ব্যঞ্জনা ব্যাপক। বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে কেন্দ্র থেকে অপসারণশীলতা, ক্ষমতার হস্তান্তর (devolution), ক্ষমতা অর্পণ (delegation) প্রভৃতি ধারণা রয়েছে। অর্থাৎ, বিকেন্দ্রীকরণ কথাটি ব্যাপকভাবে অর্থবহ।

বিকেন্দ্রীকরণ বলতে একটি বিশেষ প্রক্রিয়াকে বোঝায় যেখানে সরকার তার কিছু দায়িত্ব সম্পাদনের দায় ও ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত নিম্নতর কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রদান করে।

বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সংস্থাসমূহের অস্তিত্ব ও ক্ষমতার স্বাধীনতা মোটামুটি স্বীকৃত। অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. ল্যাস্কি তাঁর "A Grammar of Politics" গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন যে, "It is a training in self-government. It confides the administration of powers to those who will feel most directly the consequences of those powers."

লিওনার্ড ডি. হোয়াইট, বিকেন্দ্রীকরণের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন, "Decentralisation denotes the transference of authority, legislative, judicial or administrative from higher level of government to lower."[1]

অধ্যাপক অশোককুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "Democratic Decentralisation possesses two virtues. It is consistent with the democratic trend and it is also technically the most efficient method of

1. White Leonard D. 1959, 'Decentralisation,' Encyclopedia of social science. Vol. V New york McMillan.
2. Asoke Kumar Mukhopadhyay--- Panchayat Administration in West Bengal, World Press. Kolkata. 1980.

formulation and execution of the local plan projects."[2]

ইকবাল নারায়ণের মতে, "Democratic Decentralisation is a political ideal and local self government is its institutional form."[3]

'গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ' ধারণার প্রেক্ষাপটে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে "স্থানীয় সরকারের" ধারণা আলোচিত ও বিবেচিত হয়।

এই কর্তৃপক্ষের ব্যাপক স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত। এই স্থানীয় সরকারের মোট রাজস্বের অংশ বিশেষ স্থানীয়ভাবে আরোপিত করের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। এই স্থানীয় সরকারের সমগ্র আয় স্থানীয় পরিষেবায় ব্যয়িত হয়।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পরিষেবা থেকে স্থানীয় সরকারের পরিষেবা স্বতন্ত্র।

এই আলোচনা-সূত্রে স্থানীয় সরকারের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

(১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব।

(২) এই কর্তৃপক্ষ স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৩) সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এই কর্তৃপক্ষের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত।

(৪) স্থানীয় পরিষেবার ব্যবস্থা এবং

(৫) স্থানীয় কর ব্যবস্থা।

Tony Bryne তাঁর **Local Government in Britain** গ্রন্থে স্থানীয় সরকারের ঐ পাঁচটি বৈশিষ্ট্যেরই উল্লেখ করে বলেছেন যে, "It is elected, multipurpose operate on a local scale, has a clearly defined structure and is subordinate to Parliament."

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে, একটি দেশের জাতীয় সরকার (national) এবং স্থানীয় সরকার (Local government) একেবারে সম্পূর্ণ ভিন্ন, পৃথক ও বিপরীত মেরুর ব্যবস্থা নয়। অর্থাৎ জাতীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই একথা মনে করা ভুল হবে। তাই বলা হয় যে স্থানীয় গণতন্ত্র এবং জাতীয় গণতন্ত্র একই ব্যবস্থা। পৃথক ও বিচ্ছিন্নভাবে স্থানীয় গণতন্ত্র বলে স্বয়ম্ভু কিছু থাকতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আরো বলা যায় যে, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান হচ্ছে জনগণের অংশগ্রহণ যার দ্বারা দায়বদ্ধতা ও তথ্যজ্ঞাপকতা মূর্ত হয়ে ওঠে। "Local and national democracy are one system. There is no such thing as "local democracy", separate and autonomous and justified solely in terms of the self governing community." এই প্রসঙ্গে আরো বলা হয় যে, "Participation and communication are the twin aspects of democratic life; but so too are information and accountability."

১.৩ স্থানীয় সরকার—সংজ্ঞা ও ধারণা

3. Igbal Narayan, 1963-Democratic Decentralisation. The India the Image. and the reality. Indian Journal of public Administration. Vol. IX. NO.1.

ভূমিকা ঃ স্থানীয় সরকার হল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। স্থানীয় সরকারের কর্তৃত্ব ও কার্যপরিচালনা নির্দিষ্ট স্থানীয় এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। দেশের জাতীয় সরকার থেকে স্থানীয় সরকার আকার-প্রকারে ক্ষুদ্র।

বিভিন্ন সংজ্ঞা ঃ উইলিয়াম হ্যাম্পসন বলেছেন, "Local authorities have clearly defined geographical boundaries, multipurpose on compendious bodies, directly elected and having independent power of raising taxation."[1]

অধ্যাপক অশোককুমার মুখোপাধ্যায় স্থানীয় সরকারের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তাঁর **The Panchayat Administration in West Bengal** গ্রন্থে লিখেছেন যে "স্থানীয় সরকার বলতে বোঝায় স্থানীয় জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত সংস্থা দ্বারা সেবামূলক ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাজকর্ম সম্পাদন। এই নির্বাচিত সংস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের আইন দ্বারা এমনভাবে গঠিত হবে যার থাকবে যথেষ্ট আর্থিক ক্ষমতা ও স্থানীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও নীতি প্রনয়নের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।" "Local-self government thus means the management of services and regulatory functions by locally elected councils and officials responsible to them, under statutory and inspectorial supervision of the central legislature and executive but with enough financial and other independence to admit of a fair degree of local initiative and policy-making."

বেঙ্কটরঙ্গাইয়া ও পট্টভিরাম সম্পাদিত 'Local Government in India' : Selected Readings শীর্ষক গ্রন্থে স্থানীয় সরকারের ধারণা সম্পর্কিত এক অর্থবহ আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে—"স্থানীয় সরকার বলতে রাষ্ট্রের থেকে ক্ষুদ্রাকৃতির কোন পল্লী, গ্রাম, শহর, নগর বা অন্য যে কোন এলাকার শাসনকে বোঝায়। এই প্রশাসন পরিচালিত হয় স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি কর্তৃপক্ষের দ্বারা।

■ স্থানীয় সরকার—নির্দিষ্ট সংজ্ঞা ঃ

Dilys M. Hill-এর Democratic theory and Local Government গ্রন্থে বলা হয়েছে, "By local government is generally meant a system of territorial units with defined boundaries, a legal identity, an institutional structure, powers and duties laid down in general and special statutes and a degree of financial and other autonomy."

সাধারণ ভাবে স্থানীয় সরকার বলতে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও আইন কাঠামো যার নির্দিষ্ট ক্ষমতা ও কাজ বিশেষ আইন দ্বারা নির্দিষ্ট ও যার আর্থিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রয়েছে।

১.৪ স্থানীয় সরকারের তত্ত্ব ও ঐতিহ্য

হিতবাদী (Utilitarian) দার্শনিকদের জনক জেরিমি বেন্থাম সর্বপ্রথম "The Local Government" শব্দটি প্রয়োগ করেন। স্থানীয় সরকার সম্পর্কে তাঁর মত অবশ্য ছিল অস্পষ্ট।

এই সময়ের সংস্কারবাদী লেখকগণ স্থানীয় সরকারকে গণতন্ত্রের শত্রু বলেই মনে করতেন। কারণ গণতন্ত্র হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন দ্বারা পরিচালিত জাতীয় সরকার, এক ও অভিন্ন আইন ও শাসন, পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তে প্রতিযোগিতার দ্বারা স্বীকৃত মেধার ভিত্তিতে সরকারি চাকুরীতে নিয়োগ প্রভৃতি। গণতন্ত্রের এই সকল উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যগুলি স্থানীয় অদক্ষতা ও কূপমন্ডুকতা দ্বারা নষ্ট হয়ে যায়। তাই তাঁদের কাছে স্থানীয় সরকার ছিল গণতন্ত্রের শত্রু।

1. W. Hampson—Local Government and Urban Politics.

পরবর্তীকালে রোমান্টিকতাবাদ দ্বারা পরিচালিত হয়ে "No Representation--No Taxation" নীতির ভিত্তিতে rate-payer হিসাবে স্থানীয় নাগরিকেরা স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে শাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে "স্থানীয়তা" কে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে রেখে স্থানীয় সরকার গঠনে উদ্যোগ শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয় যে— "Localness" remained a central theme which was held to be a crucial to any democratic system of local government...The definition of localness and the idea of collections of local people responsible to themselves in their community, remains a continuing part of English thinking on democracy." (স্থানীয় সরকার-এর যে কোন গণতান্ত্রিক তত্ত্বে "স্থানিকতা"-কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে ধরা হয়...স্থানিকতা ও স্থানীয় জনসাধারণের নিজস্ব দায়িত্বশীলতা বৃটিশ গণতন্ত্রের ধ্যান ধারণার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।)

১.৫ স্থানীয় সরকার ও গণতন্ত্রের সম্পর্ক

ঐতিহাসিক ভাবে বিচার করতে হলে, গণতন্ত্র ও স্থানীয় সরকারের মধ্যেকার সম্পর্কে তিনটি পরস্পর বিরোধী মতামত দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমত, Smith এবং রোমান্টিকতাবাদীরা বলেন যে, গণতন্ত্রের নীতির সম্পূর্ণ বিপরীতে রয়েছে স্থানীয় সরকারের ঐতিহ্য। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রের মূলনীতি সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, সমতা ও সারা দেশে এক ও অভিন্ন আইন ও শাসন কখনই স্থানীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না। কারণ স্থানীয় সরকারের বাস্তব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সংকীর্ণতা, গ্রাম্যতা, কূপমণ্ডূকতা, ব্যক্তি-স্বার্থপরতা যা বিচিত্র ও বিভিন্ন ধরনের হয় এবং তারফল স্থানীয় সরকার বলতে বোঝায় দুর্নীতি ও চরম স্বৈরতান্ত্রিকতা। তৃতীয়ত, অভিমত হচ্ছে জন স্টুয়ার্স মিল-এর। তিনি ও তাঁর অনুগামীরা গণতন্ত্র ও স্থানীয় সরকারকে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে দেখেছেন শুধু তাই নয়। তাঁরা মনে করেছেন গণতন্ত্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে স্থানীয় সরকার।

সমালোচকদের মতে, "John Stuart Mill, like Tocqueville, justifies local government as political education and unique setting for fraternity." সুতরাং এই দৃষ্টিতে স্থানীয় সরকার হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত, তা যত ক্ষুদ্র বা তাৎপর্যহীন বা গুরুত্বহীন কাজ স্থানীয় সরকার সম্পাদন করুক না কেন।

কিন্তু জন স্টুয়ার্ট মিলের বিপরীতে বক্তব্য রেখেছেন অধ্যাপক Langond। অধ্যাপক Langond-এর মতে— "Democracy was concerned with the nation-state as a whole and with majority-rule, equality and uniformity. Local self government, by contrast, was parochial and was concerned with local differents and reparatism. The two were essentially opposed and it was only a historical accident that they had developed together in the 19th century."[5] "গণতন্ত্রের ধারণা সাম্য ও সমানাধিকার, জাতি-রাষ্ট্র এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের সাথে যুক্ত। এর বিপরীতে হচ্ছে স্থানীয় সরকারের ধারণা। কারণ স্থানীয় সরকার হচ্ছে সংকীর্ণ ও ভৌগোলিক ভাবে বিচ্ছিন্ন এক শাসনব্যবস্থা। সুতরাং গণতন্ত্র ও স্থানীয় সরকার হচ্ছে পারস্পরিক বিপরীত ধারণা। কিন্তু ইতিহাসের একটি দুর্ঘটনা হচ্ছে যে গণতন্ত্র ও স্থানীয় সরকার ঊনবিংশ শতাব্দীতে একত্রে হাত ধরাধরি করে বিকশিত হয়েছিল।"

5. Georges Langond-'Local government and Democracy', Public Administration, Vol. 31, (1953). P-26-31.

অধ্যাপক Langond আরও বলেছেন যে, স্থানীয় সরকার দ্বারা রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার হয়—জন স্টুয়ার্ট মিলের এই যুক্তিও ভুল। কারণ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, অধিক সংখ্যক জাতীয় নেতা স্থানীয় সরকারের নেতৃত্ব থেকে উঠে আসে। বরং স্থানীয় সরকারের নেতারা গণতন্ত্রের মহত্ত্ব অনুভব করা অপেক্ষা সংকীর্ণতার গন্ডীতেই আবদ্ধ থাকতে চান। গণতন্ত্র সম্পর্কে শিক্ষা ও ধ্যানধারণা নাগরিকেরা বস্তুত জাতীয় স্তরের বিষয়সমূহ ও জাতীয় রাজনীতি থেকেই শিক্ষা লাভ করে।

Dr. Leo Moulin, যিনি একজন বেলজিয়াম সরকারের আমলা ছিলেন, তিনিও জন স্টুয়ার্ট মিলের ঐ যুক্তিকে খন্ডন করেন। তাঁর মতে ব্যক্তির স্থানীয় রাজনীতিতে ভূমিকা খুবই সীমিত, সেই সীমিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা একটি দেশের জাতীয় স্তরের ব্যাপকতা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এছাড়া স্থানীয় রাজনীতির চরিত্র ও জাতীয় রাজনীতির চরিত্র ভিন্ন ধরনের। অধ্যাপক Langond-এর মতো তিনিও আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন যে, "local vested interests and possible venality were inappropriate to a modern democratic society."[6]

অবশ্য এই ধরনের সমালোচনার উত্তরে ইংরেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দল যাঁরা জন স্টুয়ার্ট মিলের অনুগামী ছিলেন, তাঁরা বলেন যে, গণতন্ত্র কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নয়, বা সামাজিক-রাজনৈতিক সমতা বা এক ও অভিন্ন আইন, শাসন ও বিচারধারা নয়। তাই স্থানীয় সরকার ও গণতন্ত্র কখনই পরস্পর বিরোধী নয়। Keith Panter-Brick বলেন যে—ব্যক্তির কন্ঠস্বরের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে স্থানীয় সরকার খুবই প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান।.....অংশগ্রহণ গণতন্ত্রের মূল শর্ত যা স্থানীয় সমাজে পারস্পরিক ধৈর্য, সহনশীলতা ও সহযোগিতা দ্বারা সম্ভব ও তার ফলেই গণতান্ত্রিক রাজনীতির অনুশীলন সম্ভব।.....স্থানীয় সরকার সর্বোপরি দুইটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রসার ঘটায়—একের ও অন্যের দাবির ন্যায্যতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও পরস্পর বিরোধী দাবির মধ্য থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একটিকে নির্বাচন করা।

"Local government was still essential to allow the individual to voice his needs.....Participation is vital to democracy since it is in the community that people appreciate and tolerate each othe's views and learn the art of practical politics.....Local government finally teaches two prime democratic virtues, the justness of one's claims and those of others. and the need to select from among competing claims those that are to be given priority."[7]

এই বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিত বলা যায় যে, "Theories of Local government emphasise two aspects of political life. One is local self-government in the community. The other is the part which local units play in the state as a whole." স্থানীয় সরকারের তত্ত্ব দুইটি রাজনীতিক দিকের নির্দেশ দেয়—সমাজে তার ভূমিকা ও বৃহৎ রাষ্ট্রে তার ভূমিকা।

১.৬ জন স্টুয়ার্ট মিলের 'প্রতিনিধিমূলক সরকার'

জন স্টুয়ার্ট মিল প্রতিনিধিমূলক সরকারকে রাজনৈতিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহন হিসাবে দেখেছিলেন। যেহেতু নাগরিকের সরকারকে 'কর' (tax/rate) প্রদান করেন, সেই হেতু তাঁদের বক্তব্য সরকারি নীতি নির্ধারণ

6. Dilys M. Hill—Democratic theory and Local Government, Gearge Allowed Union. P-24
7. Ibid—P-25

ও পরিচালনার ক্ষেত্রে থাকা প্রয়োজন। মিল-এর মতে, 'জনপ্রিয় সরকার' (Popular government) হয়তো দক্ষ সরকার প্রদান করতে পারে না, কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতার ব্যাপারে আলোচনার ভিত্তিতে পরিচালিত সরকার (government based on discussion) এর কোন বিকল্প নাই। স্থানীয় সরকার বেশ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিশদভাবে সরকারি কাজকর্ম দেখা সম্ভব হয় ও এই কাজে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকায় রাজনৈতিক শিক্ষায় তাঁরা শিক্ষিত হন। বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারপন্থীদের ছিল দুইটি উদ্দেশ্য— (1) to establish local responsible bodies (দায়িত্বশীল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা) এবং (2) efficient administration of new services (নতুন পরিষেবার দক্ষ প্রশাসন)। এই দুইটি উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি সুসংগঠিত রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের। যা পরস্পরবিরোধী দুইটি বিষয় ছিল—(১) জন স্টুয়ার্ট মিল ও ফেবীয়ানগণ কর্তৃক উত্থাপিত কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় স্তরে গণতান্ত্রিক জনপ্রতিনিধিমূলক সরকার। (২) হিতবাদী ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মীদের দ্বারা উত্থাপিত কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় স্তরে দক্ষ প্রশাসনের দাবি।

যে সময় জন স্টুয়ার্ট মিল প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের পক্ষে প্রচার করছিলেন সেই সময়টা ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যাপ্তির সময়। সিডনি ওয়েব এবং বিয়াট্রিস ওয়েব প্রমুখ ফেবীয় সমাজতন্ত্রীগণ মনে করতেন যে, সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষের ক্ষমতারও বৃদ্ধি ঘটে। তাই তাঁরা স্থানীয় সরকারকে এমন একটি উপায় বা মাধ্যম হিসাবে দেখেছিলেন যার দ্বারা আপামর দরিদ্র শ্রমজীবী জনগণকে তাঁদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা (Services) অধিকমাত্রায় প্রদান করা যায়। এই পরিষেবা 'মুনাফা' প্রবৃত্তি (profit motive) দ্বারা ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত না হয়ে যদি স্থানীয় সরকার দ্বারা 'জনসেবা' প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে সেটা "Municipal socialism" বা পৌর সমাজতন্ত্র। **Dilys M. Hill** বলেছেন যে, "The webb's vision was of civic responsibility and civic pride. It represents perhaps the high point of local self- government in radical and socialist thinking"[৪]

W. Hardy Wickwar[৯] স্থানীয় সরকারের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে বলেছেন যে, স্থানীয় সরকার মূলত ছয়টি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, ব্যক্তি নয়, গোষ্ঠী হচ্ছে সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু (the group, not the isolated individual was the basic fort of social life)। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক ভাবে গঠিত স্থানীয় সম্প্রদায় থেকেই স্থানীয় সরকারের উদ্ভব ঘটে (local self-government had grown out of traditional community life based on historic local units)। তৃতীয়ত, এই ঐতিহাসিক ভাবে গঠিত সম্প্রদায় কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্য সাধক অস্থায়ী সেবা-প্রদানকারী সংগঠন থেকে গুরুত্বপূর্ণ। চতুর্থত, নূতন যান্ত্রিক কৃৎকৌশলের উন্নতিতে সমাজের ব্যবহারের মাত্রা যেভাবে বৃদ্ধি ঘটেছে তা স্থানীয় এলাকা অতিক্রম করে চলেছে। পঞ্চমত, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে স্থানীয় শাসন যথাসম্ভব মুক্ত থাকবে। ষষ্ঠত, এক ধরনের "পৌর সমাজতন্ত্র" (Municipal Socialisim)-এর আদর্শ অনুসৃত হয় স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে। ফেবীয় সমাজতন্ত্রীরা মনে করেন যে, এই ৬টি নাকি মানুষের পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্ব ও শুভেচ্ছা ও শুভবুদ্ধির পরিচালনা দ্বারা বাস্তবায়িত করা সম্ভব। G. D. H. Cole প্রমুখ সমাজবাদীরা স্থানীয় সরকার দ্বারা এই ধরনের 'ভ্রাতৃত্ববোধ' দ্বারা পরিচালিত Municipal Socialism-এ বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মধ্যবিত্ত ধোপদুরস্ত বাবুদের পরিবর্তে কলকারখানার শ্রমিক বা Guild-worker-এর দ্বারা পরিচালিত স্থানীয় সরকার দ্বারা এই ধরনের Municipal Socialism-এর কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ স্থানীয় সরকারের ধারণা ছিল তাঁর কাছে এক ধরনের guild-এর মতো।

---

8. Ibid.

9. Ibid—P-30

Cole-এর মতো Webb দম্পতিও মনে করতেন যে, এই ধরনের স্থানীয় সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বের পাশাপাশি কার্যগত প্রতিনিধিত্ব (Functional Representation) নীতির পক্ষেও সওয়াল করেছেন। মেরী পার্স্টার ফলেটও প্রাত্যহিক জীবনের সাথে যুক্ত লোকেদের নিয়ে বিশেষত প্রতিবেশী দ্বারা গঠিত পরিমণ্ডলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার কথা বলেছেন। মেরী ফলেট ও তাঁর ধ্যান-ধারণা যেহেতু "স্থানীয়" (Location) ধারণার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চেয়েছেন, তাই সম্প্রদায়গত সাধারণ স্বার্থ (Community based common interest) এবং অরাজনৈতিক লক্ষ্য (non-political goals) হচ্ছে এই ধরনের স্থানীয় সমাজতন্ত্রের (Municipal Socialism) আদর্শ।

১.৭ বিংশ শতাব্দীতে স্থানীয় সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জসমূহ

আধুনিক যুগের জয়যাত্রা বিংশ শতাব্দীতে যেভাবে পৌঁছেছে তার ফলে বিশেষভাবে উদ্ভব ঘটেছে আধুনিক রাজনৈতিক দলব্যবস্থা ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর। রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীদের কাজকর্মের ফলে স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে।

এর সাথে ঘটেছে জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি যার ফলে "অর্থনৈতিক মানুষ" (economic man) এবং "রাজনৈতিক মানুষ" (political man) পৃথক হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে অনেক মানুষ স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে ভোট-দানে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকছেন। অনেক সময় স্থানীয় সরকারের ব্যাপারে বেশির ভাগ মানুষ নিঃস্পৃহ থাকছেন। স্থানীয় সরকারে কে নির্বাচিত হলেন, তাঁরা কী করেন সেই ব্যাপারে মানুষ যেমন কৌতূহল প্রকাশ করেন না, পৌর প্রশাসন স্থানীয় স্তরে পরিচালন ব্যবস্থার প্রক্রিয়া কী, তাও তাঁরা জানতে চান না। বলা যায় যে "They accepted what was provided, complained when they were personally dissatisfied and had little interest in local government as such."

তাই এখন গণতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে Political elite অর্থাৎ দলের নেতাদের মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি ব্যবস্থা মাত্র। সুতরাং এখন political elite-দের শাসন চলছে গণতন্ত্রের নামে। তার ফলে "স্থানীয় সরকার" একেবারে প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। এটাই হচ্ছে আধুনিক গণতন্ত্রের বাস্তব অবস্থা।

এই সব কিছুর ফল হচ্ছে যে, গণতন্ত্র এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে—মানুষ যা করছে সেটাই গণতন্ত্র, যা করা উচিত সেটা এখন আর গণতন্ত্র নয়।

১৯৬০-এর পরবর্তী দশকে গণতন্ত্রের তত্ত্বের উপর এসেছে তিন ধরনের আঘাত। প্রথমত, গণতান্ত্রিক সরকার ক্রমশ হয়ে উঠেছে গোপনীয়তার স্তম্ভ এবং সরকার নিজের দায়বদ্ধতার প্রশ্নে হয়ে থাকছে নিরুত্তর। দ্বিতীয়ত, ভোটাররা ক্রমশ হয়ে উঠেছেন রাজনীতি-বিমুখ। তৃতীয়ত, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত আধুনিক গণতন্ত্রে দরিদ্র, বৃদ্ধ, অসমর্থ, অসংগঠিত ও বঞ্চিত মানুষের প্রতিবাদের কোন জায়গা থাকছে না। এখানে সমাজের পক্ষ থেকে কাউকে দেখার কেউ নাই। যা আছে তা হলো কায়েমী স্বার্থ।

মানুষ এখন 'ভোটার' পরিচিতিতে তৃপ্ত নয়। তাই ভোটের প্রতি মায়া-মোহ-গুরুত্ব হ্রাস পেতে শুরু করেছে। অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচনে ভোটারের অনীহার সুযোগ গ্রহণ করে রাজনৈতিক দল বা নির্বাচনে প্রার্থীরা নির্বাচনে ভোট জালিয়াতি করছে, ভোটারদের তোয়াক্কা না করে, ফলে দেখা যাচ্ছে যে "real political power lies outside the community."

এই সমস্ত কিছুর প্রতিক্রিয়া হিসাবে নতুন করে আবির্ভাব হচ্ছে স্থানীয় সরকারের। এখানে বলা যেতে পারে যে, স্থানীয় সরকারের পুনরাবির্ভাব। কারণ এখন কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার এমন কি বিশ্বব্যাঙ্ক সকলেই বলছেন যে, স্থানীয় সরকার হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এঁদের মতে "Local authorities are not stalemated by conflict, but provide services in a democratic manner."

জনকল্যানমূলক কার্যাবলীর প্রসার বিভিন্ন রাষ্ট্রকে বাধ্য করেছে স্থানীয় সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে এবং প্রকৃত অর্থে "স্থানীয় সরকারকে" প্রায় "স্থানীয় রাষ্ট্রে" (Local state) পরিণত করতে।

কিন্তু এর পাশাপাশি একটা বিপরীত চিত্রও লক্ষ্য করা যায়। যেমন ১৯৩০-এর পরবর্তী দশকে নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের পরিবর্তে জনসেবামূলক কাজ করা জন্য অন্য নূতন ধরনের সংস্থা গড়ে উঠতে থাকে Board or Corporation বা Area Authority নামে। বলা হতে থাকে যে, "the increasing technical scale of operations and need for a broader financial base"-এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তার জন-পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের পরিবর্তে সরকার নিজের মনোনীত ব্যক্তি ও দক্ষ ইঞ্জিনীয়ার ও সরকারি আমলাদের গঠিত পরিচালকমন্ডলী দ্বারা এই ধরনের Board বা Corporation গঠিত হতে থাকে। তার ফলে মানুষের জীবনে হ্রাস পেতে লাগলো গণতান্ত্রিক নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের।

সামাজিক ও ভৌগোলিক বিশ্বজনীনতার যুগে "স্থানীয়"-কে দেখা হচ্ছে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে। এই অবস্থায় বলা যেতে পারে যে, "Any theory of 'local self-government' is therefore in danger of overlooking this divergence of attitude and concerns. It may, if it stresses the desirability of increased local autonomy too strongly, increase a tendency towards the deffence of the status quo and towards parochialism." স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত যে কোন তত্ত্ব এখানকার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সমূহকে গুরুত্ব না দিয়ে চলার বিপদ সম্পর্কে অবহিত নয়। কারণ ঐ তত্ত্বসমূহ খুব বেশি করে স্থানীয় সরকারের স্বাতন্ত্র্যকে গুরুত্ব দান করার ফলে এক ধরনের রক্ষণশীলতা ও সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে।

■ অংশীদারী/গণতন্ত্র (Participatory Democracy) ঃ

১৯৬০ এর পরবর্তী সময় থেকে 'অংশীদারী গণতন্ত্রের' আন্দোলন চলতে শুরু করে। নগর উন্নয়ন কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে গ্রামে অংশীদারী গণতন্ত্রের ধারণা ব্যক্ত হয়। পরবর্তীকালে এটা গোষ্ঠী (group) এবং প্রতিবেশী সন্নিহিত এলাকা অর্থাৎ পাড়া (neighbourhood) ক্ষেত্রে প্রকৃত গণতন্ত্রের মাধ্যম হিসাবে কাজ করতে শুরু করে। জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সংযোগের অভাব ও সরকারি কাজকর্মে অসন্তুষ্টি থেকে 'অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্র' গুরুত্ব লাভ করতে থাকে। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র পদ্ধতির উপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয় ব্যক্তির উপর ফলাফলের (consequence/effect) বা প্রভাবের উপর ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সাবেকী গণতন্ত্র মূলত ছিল নৈতিক প্রণোদনসম্পন্ন—কিভাবে মানুষ সম্মিলিতভাবে বাস করতে পারে ও সুখী সমাজ গড়ে তুলতে পারে সেটাই ছিল সাবেকী গণতন্ত্রের লক্ষ্য। কিন্তু অংশীদারী গণতন্ত্র তিনটি মূল মন্ত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করে— equality, participation and local control। সংক্ষেপে বলা যায় যে, "Participatory democracy claims to enrich men's individual personalities and happiness and to develop their potentialities." (অংশীদারী গণতন্ত্র মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিকাশ ঘটায়।)

আধুনিক কালে তাই স্থানীয় সরকরের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কিত আলোচনায় নূতন ধরনের তাত্ত্বিকীকরণ (theorising) ঘটছে—"Think globally and act locally." তার ফলে আধুনিক তত্ত্বে স্থানীয় সরকারের মোটামুটি

ভাবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদন পরিলক্ষিত হয়— (1) nationally determined but locally provided services. (2) a need to explose 'community' ideas and ideals, (3) a concern with administrative efficiency as defined by technical criteria.

এই অবস্থায় আজকের দিনে স্থানীয় সরকারগুলি হয়ে উঠছে রাজনীতির মস্ত আখড়া। দলের স্থানীয় শাখা সংগঠন জাতীয় রাজনীতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং নির্বাচিত স্থানীয় কাউন্সিল ও রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক স্থানীয় জাতীয় পরম্পরা-পরিপূরক হয়ে উঠেছে।

স্ব-শাসিত জনগোষ্ঠী (Self-governing community) রাজনীতির আখড়া হওয়ার কারণ হল যে, এখানে প্রায় সকল বিষয়েই যেমন স্কুল পরিচালনা, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, গৃহনির্মাণ, রাস্তাঘাট উন্নয়ন ও পুনর্নির্মাণ প্রভৃতি সকল বিষয়েই এখন 'বিরোধ' (conflict) পরিপূর্ণ। তাই আলোচনা ও সমঝোতা দ্বারা মীমাংসার কাজ স্থানীয় স্তরে চলতেই থাকে। অর্থাৎ স্থানীয় স্তরে যেটা চলছে সেটাকে এক কথায় বলা হয় 'রাজনীতি' বা Politics।

বর্তমান পরিস্থিতিতে তাই "স্থানীয় সরকারের' রাজনীতির তত্ত্ব ও প্রয়োগ গুরুত্ব দান করছে কেন্দ্র-স্থানীয়, সরকার সম্পর্কের উপর আর্থিক-স্বয়ম্ভরতা ও পেশাগত আমলাতন্ত্র ও ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে সম্পর্কের উপর এবং ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন গত কৌশলের বিপ্লবের উপর। ফলে নির্বাচনের ও নেতাদের দাদাগিরির গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পাচ্ছে।

W.J.M. Mackenzie বলেন যে, স্থানীয় সরকার সম্পর্কে চিন্তাভাবনা মোটামুটি ভাবে তিনটি মৌল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত।

1. Local government in justified as a traditional institution which still commands loyalty অর্থাৎ স্থানীয় সরকার একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে এখনও মানুষের আনুগত্য আদায় করে থাকে।

2. It is an effective and convnient way to provide certain services অর্থাৎ কোন পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার হচ্ছে কার্যকরী ও সহজ ব্যবস্থাপনা।

3. It is of value because it is a means of political education. অর্থাৎ রাজনৈতিক শিক্ষার বাহন হিসাবে স্থানীয় সরকারের যথেষ্ট মূল্য রয়েছে।

W. J. Mackenzie বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, Strongest justification for local government is its claim as an efficient provider of services, not as a defender of liberty or democracy.[10]

(স্থানীয় সরকারের পক্ষে বড় যুক্তি হচ্ছে গণতন্ত্র বা স্বাধীনতার প্রতীক নয়, সেবামূলক কার্যের দক্ষতারসাথে সম্পাদন।)

নাগরিক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নানা সমালোচনা সত্ত্বেও স্থানীয় সরকারের তিনটি ইতিবাচক দিক আছে।

প্রথমত, স্থানীয় সরকার হচ্ছে স্থানীয় নির্বাচকমন্ডলীর কাছে একটি দয়িত্বশীল সংস্থা যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা নয়। সুতরাং স্থানীয় সরকার হচ্ছে গণতান্ত্রিক সংস্থা।

দ্বিতীয়ত, স্থানীয় সরকার হচ্ছে ভোক্তা বা উপভোক্তাদের পক্ষে চাপসৃষ্টিকারী একটি সংগঠন যা বৃদ্ধ, দরিদ্র বা প্রান্তবাসী বা অন্তেবাসী মানুষেরা ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন।

10. W.J.Mackenzi-Theories of Local government LSE, Greater London - Paper No 2(1961)P-7.

স্থানীয় সরকার না থাকলে অন্য কোন ক্ষমতাশালী সংগঠন তাঁরা হাতের কাছে পেতেন না।

তৃতীয়ত, বাজার ও দাম-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার বাইরে এবং সরকারি বোর্ড বা কর্পোরেশনের নিয়মকাঠিন্যতার বাইরে স্থানীয় সরকার কাজ করে অনেক বেশি মানবিক, সহজ ও সংবেদনশীল ভাবে। আমলাতন্ত্রের চাপ না রেখে শিক্ষা বা জনকল্যাণমূলক কাজকে গণমুখীন করতে হলে স্থানীয় সরকারের বিকল্প নেই।

তাই পরিশেষে বলা হয় যে Local government is the setting for the conflicting aims of representative and popular. The former in based on elections and on representatives and latter demands popular access & adequuate communication.

যাইহোক এখনকার যুগের মূল বিষয় হচ্ছে 'সুশাসন' (good governance)। এই good governance-এর ব্যাপারে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতটা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পরিষেবা প্রদানের গুণগত ও সময়ানুগ ব্যবস্থা পরিচালনা করা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে স্থানীয় স্তরে পরিকল্পনা রচনা ও পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। দক্ষতাকে বিনষ্ট না করে দক্ষ কর্মীকে বা আমলাকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে স্থানীয় সরকার বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

বৃটেনের The Royal commission on Local Government স্থানীয় সরকারের সাম্প্রতিক যেসব উদ্দেশ্য সমূহকে গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছে সেইগুলি হলো ঃ (1) efficient provision of services, (2) focussing of national attention on local problems, and (3) 'viable sysetm of local democracy' which retained people's interest. অর্থাৎ (ক) দক্ষতার সাথে পরিষেবা প্রদান, (খ) স্থানীয় সমস্যার প্রতি জাতীয় দৃষ্টি আকর্ষণ, (গ) স্থানীয় গণতন্ত্রের একটি কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে জনস্বার্থ রক্ষা করা।

১.৮ সারাংশ

এই এককে স্থানীয় সরকার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার পর স্থানীয় সরকারের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

তারপর স্থানীয় সরকার সম্পর্কে গণতন্ত্রের সম্পর্কের আলোচনার বিভিন্ন দিক ও বিভিন্ন ধারা বর্ণনা করা হয়েছে।

তারপর স্থানীয় সরকারের তত্ত্বের নানা বিবর্তন, পরিবর্তন, সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করা হয়েছে।

সবশেষে সাম্প্রতিক সময়ে স্থানীয় সরকারের তত্ত্বের নবীকরণ যেভাবে ঘটেছে সে সম্পর্কে আলোচনা করে দেখানো হয়েছে স্থানীয় সরকার এখন কি রূপে কাজ করছে।

১.৯ অনুশীলনী

১। স্থানীয় সরকার-এর সংজ্ঞা দিন। গণতন্ত্রে স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র ও 'অংশীদারী গণতন্ত্রে'র স্থানীয় সরকারের রূপগত পার্থক্য আলোচনা করুন।

৩। স্থানীয় সরকার সম্পর্কে জন স্টুয়ার্ট মিলের ধারণা সমালোচনা সহ লিখুন।

৪। 'স্থানীয় সরকারের' ধারণার বিরুদ্ধে সমালোচনাগুলি লিখুন।

৫। "সুশাসন অপেক্ষা স্বায়ত্ত শাসন অধিকতর গ্রহণযোগ্য"— ("A self-government is better than good government") বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করুন।

একক ২ □ স্থানীয় সরকারের আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য
২.১ প্রস্তাবনা
২.২ ভূমিকা
২.৩ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি
২.৪ সারাংশ
২.৫ অনুশীলনী

২.০ উদ্দেশ্য

যে কোন আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিষয়। কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি। এই জন্য এই এককে স্থানীয় সরকার সম্পর্কে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি সমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে।

২.১ প্রস্তাবনা

এই এককে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। কোন বিষয়ের আলোচনার ফল কী দাঁড়াবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হচ্ছে তার উপর। তাই দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা সর্বপ্রথম করা না হলে বিষয়ের আলোচনায় এগোনো যায় না। একটা উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে আকাশের দিকে তাকালে আকাশটা দেখায় অখন্ড অসীম নিঃসীম দিগন্ত। অন্যদিকে ঘরের জানলা দিয়ে আকাশ দেখলে আকাশকে দেখায় প্রায় হাতের কাছে একফালি মেঘ. তাই বলা হয় দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করছে বিষয়ের প্রকৃতি ও গভীরতা ও তার বিশ্লেষণ।

স্থানীয় সরকারের আলেচনায় আমরা প্রধানত তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে থাকি। উদারনীতিবাদী, নয়া-উদারনীতিবাদী ও মার্কসবাদী। এই তিনটি দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা এই এককে করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকারের আলোচনায় দৃষ্টিভঙ্গি সমূহ—উদারনীতিবাদী (নয়া-উদারনীতিবাদী সহ), মার্কসবাদী ও গান্ধীবাদী।

২.২ ভূমিকা

যত ধরনের সরকার আছে তাদের মধ্যে স্থানীয় সরকার হচ্ছে সবথেকে ক্ষুদ্র, কিন্তু বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। অনেক জায়গায় দেখা যায় যে, স্থানীয় সরকার হচ্ছে এক ধরনের স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক সরকার হিসাবে গড়ে উঠেছে, টিকে আছে এবং কাজ করে চলেছে। স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা থেকে স্থানীয় রাস্তাঘাট সব কিছু দেখাশোনা করে থাকে

স্থানীয় সরকার। কালের পরিক্রমায় প্রাকৃতিক প্রতিষ্ঠান থেকে স্থানীয় সরকার একটি আইন-প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। অনেক দেশে আইন করে স্থানীয় সরকার চালু করা হয় স্থানীয় সমস্যাকে স্থানীয়ভাবে সমাধান করার জন্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেভাবে স্থানীয় সরকার দেখা যায় তা থেকে স্থানীয় সরকারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

(১) a defined geographical space as its operational jurisdiction.

(২) a local council elected by the local citizenry.

(৩) an idependent source of tax-in come

(৪) a degree of 'autonomy' in local decision making.

(১) কাজের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভূ-এলাকা, (২) স্থানীয় নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত স্থানীয় পরিষদ, (৩) কর-লব্ধ আয়ের জন্য স্বয়ং-সম্পূর্ণ উৎস, (৪) স্থানীয় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতা থাকা।

স্থানীয় সরকার সম্পর্কে তত্ত্বগত আলোচনা খুবই কম দেখা যায়। বৃটিশ ও ফরাসী মডেল—এই দুই মডেল স্থানীয় সরকারের আলোচনায় দেখা যায়। এছাড়া বেশ কিছু লেখা নীতিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে উচ্চ-নৈতিক-মূল্য হিসাবে স্থানীয় সরকারের আলোচনায় লক্ষ্য করা যায়। যেমন— **Tocqueville-র** বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে—"Local institutions are to liberty what primary schools are to science; they put it within the people's reach; they teach people to appreciate its peaceful enjoyment and accustom them to make use of it. Without local institutions a nation may give it self a free government but it has not got the spirit of liberty.[11]" বিজ্ঞানের শিক্ষার সোপান যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়, তেমনই স্বাধীনতার প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র হচ্ছে স্থানীয় সরকার ; স্থানীয় সরকার হচ্ছে জনসাধারণেরই সরকার, স্থানীয় সরকার শিক্ষিত করে তোলে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন উপভোগ করার জন্য ও সেই উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকারকে ব্যবহার করার জন্য। স্থানীয় সরকার ছাড়া কোন দেশে স্বাধীন সরকার থাকতে পারে, কিন্তু যেটা থাকবে না তা হচ্ছে জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা।

জন স্টুয়ার্ট মিল অবশ্য বলেন যে, its (local government) transaction can be made most instrumental to the nourishment of public spirit and the development of intelligence.[12]

(স্থানীয় সরকারের কাজকর্ম হতে পারে জনগণের উদ্দীপনার ও চেতনার বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।)

উদারনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থানীয় সরকার সম্পর্কে এই ধ্যান-ধারণাই প্রচলিত হয়ে আসছে। স্বাধীনতা ও সমতার যে ধারণা উদারনীতিবাদ পোষণ করে থাকে তার সাথে স্থানীর সরকারের তত্ত্ব খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই উদারনীতিবাদ সমর্থন জানায় স্থানীয় সরকারকে। উদারনীতিবাদী দৃষ্টিতে আজও স্থানীয় সরকারকে দেখা হয় নাগরিক-প্রশিক্ষণ ও স্বাধীনতা স্পৃহার সামর্থ্য যোগানের সোপান হিসাবে।

এছাড়া স্থানীয় সমস্যার স্থানীয় সমাধান-এর হাতিয়ার হিসাবেও স্থানীয় সরকারকে ব্যাখ্যা করা হয় (instrumentul explanation)। নাগরিকদের অংশগ্রহণ এবং জাতীয় সরকারকে সামগ্রিকভাবে সমর্থন দানের প্রেক্ষাপটেও উদারনীতিবাদী ধারায় স্থানীয় সরকারের বিশ্লেষণ করা হয়। স্থানীয় সরকারের কার্যগত প্রয়োজনীয়তাও জন স্টুয়ার্ট

---

11. Insted in an article by Mohit Bhattacharya 'Approaches to the study & Local Govt., c.u. Journal of Pol. slud

12. Ibid

মিল বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলেছেন যে, "It is obvious to begin with, that all business purely local—all which concerns only a single locality—devolve upon the local authorities." (স্থানীয় বিষয় সমূহের দায়িত্ব স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে থাকা উচিত। কেন্দ্রীয় সরকারের অপর সঙ্গী হিসাবে স্থানীয় সরকার কাজ করতে পারে.....বিকেন্দ্রীকরণের হাতিয়ার হিসাবেও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও স্থানীয় সরকার কাজ করতে পারে।)

উদারনীতিবাদ আরও মনে করে যে, Local government is thus a junior partner in the task of country's governance. .....Federalism and local self-government are the two most generally employed methods of decentralisation.

উদারনীতিবাদী দৃষ্টিতে স্থানীয় সরকার-এর গুরুত্ব হচ্ছে প্রথমত, স্থানীয় সরকার সমাধান করে স্থানীয় পৌর সমস্যার। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে শাসনভার ভাগ করে নিয়ে, তৃতীয়ত, শাসন পরিচালনায় নাগরিকদেরকে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দান করে। চতুর্থত, আচরণবাদী দৃষ্টিতত্ত্বে স্থানীয় সরকারকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কারণ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ইউনিট মানুষের রাজনৈতিক আচরণ প্রকৃতরূপে প্রতিফলিত হয়।

■ উদারনীতিবাদের নয়া রূপ ঃ আচরণবাদ

সাবেকী প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করে আচরণবাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় সরকার প্রকৃত পরিস্থিতিতে কীভাবে কাজ করে তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করে।

Banfield and Wilson বলেন যে, "the day to day workings of city government in the United States are best understood by looking at the differences of opinion and interest that exist within the cities at the issues that arise out of these differences and at the ways institutions function to resolve (or fail to resolve) them.[13]" (বিভিন্ন স্বার্থের পার্থক্য ও মতের পার্থক্যের মধ্য দিয়ে নগর প্রশাসনের প্রাত্যহিক কাজকর্মের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায় এবং সেই পার্থক্য দূরীকরণে নগর-প্রশাসনের ভূমিকা থাকে গুরুত্বপূর্ণ।)

সরকারের কাজকর্মে তা সে বিশেষভাবে স্থানীয় সরকারের কাজকর্মের অনুসন্ধান এই বিকল্প তাত্ত্বিক মডেল—আচরণবাদী তত্ত্ব কাঠামো খুবই উপকারী। সমাজ পরিবেশ থেকে কী ধরনের চাপ স্থানীয় সরকারের উপরে আসে কিংবা পৌরপ্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে চেহারার প্রকৃতি কী ধরনের! পৌর প্রতিনিধিগণ কিভাবে স্থানীয় পরিবেশের চাহিদাসমূহকে মেটাবার চেষ্টা করেন? স্থানীয় সরকারের Input এবং Output-এর মধ্যে Linkage বা সম্পর্ক কি ধরনের থাকে! স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনুসন্ধানে এই ধরনের প্রশ্নসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত ঐসকল প্রশ্নগুলির সম্যক অনুধাবন অধিকতর কাম্যভাবে সম্ভব।

আচরণবাদী দৃষ্টিকোণ স্বভাবতই ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে স্বতন্ত্রভাবে গুরুত্ব দান করে স্থানীয় সরকারের কার্যাবলীর উপর আলোকপাত করে। তার ফলে স্থানীয় সরকারে কিভাবে কাজ করে তা অনেকটা পরনির্ভরশীল উপাদানে পরিণত হয় (dependent variable)। নগর বা গ্রাম রাজনীতিতে প্রকৃত অর্থে রাজনীতি একটা বাজার (Market)-এর চরিত্র গ্রহণ করে। যেখানে সর্বদা একটা প্রতিযোগিতা চলছে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির মূল দুর্বলতা হচ্ছে, অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্যের মতে "such an approach does not take into account the social fabric that sustains 'inequality' and tends to distribute the power to influence government unequally.[14]" (যে

13. Ibid
14. Ibid

সমাজ কাঠামো 'অসাম্য' তৈরি করে সেই সমাজ কাঠামো অনুধাবনে এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যর্থ শুধু তাই নয়, সরকারকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রেও সমতার অভাব এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এড়িয়ে গেছে।)

Castells বলেন যে, "the pluralist conception of political theory only defines empirically actors in conflict, without situating them within the structural framework of the class interest which underlie them."[15] (বহুত্ববাদ কেমল মাত্র বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতিকেই ব্যাখ্যা করে শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণীস্বার্থের সংঘাতের কাঠামোর প্রেক্ষাপট ব্যতিরেকেই)

আচরণবাদীরা যেভাবে রাজনীতির মূল বিষয়গুলিকে বিশেষ করে নগর রাজনীতির বিষয়গুলি ভাসা-ভাসা বা উপর-উপর বিশ্লেষণ করে তা ভীষণ সমলোচনার সম্মুখীন হয়েছে। বিশেষত মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদারনীতিবাদের আধুনিক রূপ আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে যথেষ্ট সমালোচনা করা হয়।

২.৩ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

ইংলন্ডে বিখ্যাত মার্কসবাদী লেখক যিনি স্থানীয় সরকার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক অবদান রেখেছেন, তিনি হলেন **Cynthia Cockburn**। অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্যের মতে "She looks at political change and local management from the viewpoint of the working class on 'those who are managed.'"[16] তিনি স্থানীয় সরকারের 'স্বাতন্ত্র্য' বা 'স্বাধীন স্থানীয় সরকার' বা 'স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকার'—এর অতিকথা বা Myth-কে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেন। তিনি বলেন যে, পুঁজিবাদী সমাজে স্থানীয় সরকারের কাঠামো হচ্ছে সেই জাতীয় সরকারের কাঠামো থেকে উদ্ভূত একটি অঙ্গ যে জাতীয় সরকার নিজেই রাষ্ট্র বা State। এর থেকে বোঝা যায় যে, রাষ্ট্র যে কাজ করে (স্থানীয় সরকারের মাধ্যমেও) তার সাথে সম্পর্ক রয়েছে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পদ-উৎপাদনের।

London Borough of Lambeth সম্পর্কে যে গবেষণা Cockburn করেছিলেন তা থেকে দেখা যায় যে, local government is an integral part of the capitalist state. বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রেক্ষিত ব্যতীত স্থানীয় সরকারকে অনুধাবন করা অসম্ভব। স্থানীয় সরকার সম্পর্কে তিনি যে শব্দ বা বচন বা অভিধা ব্যবহার করেছেন তা হল যে, স্থানীয় সরকার হচ্ছে তাঁর ভাষায় "Local state" বা "স্থানীয় রাষ্ট্র", যা উপাদান-পদ্ধতি থেকেই বা উৎপাদন ব্যবস্থা থেকেই গড়ে উঠেছে। সুতরাং পুঁজিবাদে স্থানীয় সরকারও হচ্ছে শ্রেণী-শোষণ ও শ্রেণী শাসনের হাতিয়ার। যার প্রধান কাজ হচ্ছে দমন-পীড়ন ও অত্যাচারের হাতিয়ার।

Cockburn অবশ্য স্থানীয় সরকারকে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য Local State-এর ক্ষমতা দখল (নির্বাচনের মাধ্যমেই)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, "The main role of the local state is to keep the working class in its place and to set things up, with forceful sanctions, in such a way that capital itself, business interest as a whole normally survive and prosper." (স্থানীয় রাষ্ট্রের প্রধান ভূমিকা হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করা এমনভাবে যাতে মূলধন ও পুঁজি স্বাভাবিকভাবে টিকে থাকে ও উন্নতির পথে এগোতে পারে।)

15. Ibid
16. Ibid
17. Ibid

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে Cockburn স্থানীয় সরকারের কার্যাবলী বিশেষত আবাসন নীতি, বস্তি-উচ্ছেদ ও পুনর্বাসন প্রভৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এমনকি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে থাকলেও স্থানীয় সরকারের empirical বা ব্যবহারিক গুরুত্ব Cockburn-এর কাছে অপরিসীম বলে মনে হয়েছে। এই গুরুত্ব আচরণবাদীরা স্থানীয় সরকারকে আচরণবাদী দৃষ্টিকোণ যে গুরুত্ব দান করেন তা থেকে শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন চরিত্রের। ফ্রান্সে স্থানীয় সরকারের প্রতি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার দেখিয়েছিলেন Manuel Castells। Cockburn-এর মতো তিনিও নগরায়ণ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনায় স্থানীয় সরকারকে বৃহৎ রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যেই বিচারবিশ্লেষণ করেছেন। Castells-এর ভাষায়, "Fundamentally the urban question refers to the organisation of the means of collective consumption at the basis of the daily life all social groups: housing, education, health, culture, commerce, transport etc.....that specified problems become globalised, the urban question increasingly relates the state to daily life, and provokes political crisis,"[১৮] (মূলত শহুরে সমস্যা হলো সমাজের সকল গোষ্ঠী যাতে সমানভাবে নাগরিক সুবিধা ভোগ করতে পারে। যেমন—গৃহ-আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি বাণিজ্য, পরিবহণ ইত্যাদি.....নির্দিষ্ট বিশেষ সমস্যা ও এমন বিশ্বজনীন সমস্যা নগরজীবনের প্রাত্যহিক সমস্যা ও এখন রাষ্ট্রের সমস্যার সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছে এবং নগর-সভ্যতার সংকট ডেকে আনছে সামগ্রিক ভাবে রাষ্ট্রের সংকট।)

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কাঠামোভুক্ত স্থানীয় সরকারের কাজকর্মকে রাষ্ট্রের সাথে এইভাবে Cockburn-এবং Castells সংযুক্ত করেছেন। ভারতের উন্নয়নশীল দেশেও স্থানীয় সরকারের আলোচনায় এই মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রণিধানযোগ্য।

স্থানীয় সরকারের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ইদানীংকালে বেশ গুরুত্বলাভ করেছে। যেভাবে স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করে, যেভাবে এদের আর্থিক দেউলিয়াপনা দেখা যায় এবং যেভাবে এই প্রতিষ্ঠানগুলি পরিষেবা প্রদান করে তা কখনই নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। স্থানীয় সরকার তখন কোন পূর্বঘোষিত নীতি বা মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয় না যা পূর্ব অনুমান দ্বারা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা যায়। স্থানীয় সরকারের প্রকৃত কাজের দ্বারা ও ফল দ্বারা স্থানীয় সরকার সম্পর্কে কোন নীতি বা মূল্য বিচার করা যায়—অর্থাৎ 'ফলেন পরিচীয়তে বৃক্ষ ঃ'। সাবেকী প্রথায় একটি দেশের সামগ্রিক সরকারি ব্যবস্থাপনার মধ্যে স্থানীয় সরকার-এর সম্পর্কে কোথাও এক ছেদ বা শূন্যতা দেখা যেতো। অর্থাৎ স্থানীয় সরকার যেন দেশের সমগ্র শাসন কাঠামো বা শাসনব্যবস্থা থেকে ছিল বিছিন্ন বা detached প্রতিষ্ঠান।

এর একটা কারণ হতে পারে যে, আধুনিক যুগেও স্থানীয় সরকারসমূহ তার প্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত কাঠামো নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোতে স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হতো। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যে স্থানীয় সরকার-এর আদর্শ রূপ কি হবে তার পরিবর্তে স্থানীয় সরকারের বর্তমান কাজকর্মের ধারা ব্যাখ্যা করার তত্ত্ব-গঠনের দিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এই ধরনের তত্ত্ব-গঠন Cockburn এবং Castell-এর মডেল অনুসরণ করেই সম্ভব বলে অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য মনে করেন। অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্যের ভাষায় বলা যায় যে, "One needs a wider conceptual framework than mere institutional approach to shed light on how local government actually functions and why the urban crisis is so universal. Positive theory of local government can be built only on the foundation of rigorous empiricism."[১৯] (কিভাবে স্থানীয় সরকার প্রকৃত অর্থে কাজ করে তা জানতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে এসে এক ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে দেখতে হবে যে, নাগরিক সমস্যাসমূহ আজ কেন বিশ্বজনীন? অভিজ্ঞতাবাদের ভিত্তিতেই একটি ইতিবাচক সুষ্ঠু তত্ত্ব স্থানীয় সরকার আলোচনায় গড়ে তোলা যায়।)

---

18. Ibid
19. Ibid

২.৪ সারাংশ

উদারনীতিবাদ-এ জন স্টুয়ার্ট মিল এবং নয়া উদারনীতিবাদ বলতে আচরণবাদ-এর তত্ত্বে আলোচনা করে মার্কসবাদের দৃষ্টিতে Cockburn-এর মতামত সমালোচনা সহ আলোচনা করা হয়েছে। কোন দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণরূপে পুরোপুরি গ্রহণ না করে rigourous empiricism-এর পথেই চলা উচিত বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

২.৫ অনুশীলনী

১। স্থানীয় সরকার সম্পর্কে আলোচনায় 'দৃষ্টিভঙ্গি'র গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

২। স্থানীয় সরকার সম্পর্কে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৩। স্থানীয় সরকার সম্পর্কে উদারনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিগুলি সমালোচনা সহ বর্ণনা করুন।

৪। স্থানীয় সরকার সম্পর্কে নয়া উদারনীতিবাদ দৃষ্টিভঙ্গি সমালোচনা সহ আলোচনা করুন।

৫। স্থানীয় সরকারের আলোচনায় মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সমালোচনা সহ বিশ্লেষণ করুন।

একক ৩ □ স্থানীয় রাজনীতি ও স্থানীয় সরকার, আধিপত্য এলাকা, সম্পর্ক, স্বাতন্ত্র্য

৩.০ উদ্দেশ্য
৩.১ প্রস্তাবনা
৩.২ স্থানীয় সরকারের ভূমিকা
৩.৩ সারাংশ
৩.৪ অনুশীলনী

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় সরকার যে কেবল একটি আইন-কাঠামো নয়, তা দেখানো। স্থানীয় সরকারের যে স্থানীয় রাজনীতির গভীর সম্পর্ক তা বিশ্লেষণ করা এই এককের উদ্দেশ্য। স্থানীয় রাজনীতিতে আধিপত্যের এলাকা স্থানীয় সরকার কতটুকু ভোগ করতে পারে তা আলোচনা করা এই এককের উদ্দেশ্য। সর্বোপরি স্থানীয় সরকার কি আদৌ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করতে পারে—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার একটা চেষ্টা করাও এই এককের উদ্দেশ্য।

৩.১ প্রস্তাবনা

এই এককে আজকের বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণের যুগে স্থানীয় সরকার কতখানি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করতো তা বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে। স্থানীয় সরকারের 'স্বতন্ত্র' কি একটি 'গল্পকথা' ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা চলেছে এই এককে।

আজকে একদিকে যেমন বিশ্বায়ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে তেমনই অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা—এর কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে এই এককে।

বর্তমানে চলছে একদিকে বিশ্বায়ন, অন্যদিকে চলছে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের শক্তিশালী আন্দোলন—একথা বলেছেন ড. রজনী কোঠারী। ড. রজনী কোঠারীর ভাষায় "Decentralisation should be viewed in the control of an emerging need to reconcile two contradictory tendencies: globalisation on the one hand and local self governance on the other." (বিশ্বায়ন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এই দুই বৈপরীত্যের সামঞ্জস্যের প্রেক্ষপটে বিকেন্দ্রীকরণের আলোচনা প্রয়োজন।)

স্থানীয় রাজনীতি ও স্থানীয় সরকারের পারস্পরিবতায় স্থানীয় রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে স্থানীয় সম্পত্তির কাঠামো পারস্পরিক সম্পর্কিত অবস্থায় থাকে।

স্থানীয় সরকারের রাজনীতিতে যেহেতু জনসাধারণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন

(empowerment) ঘটে, সেই হেতু নারীদের অধিকার, যুবকযুবতীদের অধিকার এবং দুর্বলতর মানুষের অধিকার এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে।

এই দিক থেকে বিচার করলে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় রাজনীতি যে খন্ড-খন্ড রাজনীতির জন্ম দেয় তা হচ্ছে বিশ্বায়ন-প্রক্রিয়ার বিপরীত এবং উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ারও বিপরীত। এই অবস্থায় আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত আজকের দিনের 'বিশ্ব' নামক 'গণ্ডগ্রাম' অথবা 'গণ্ডগ্রাম' নামক 'বিশ্ব'কে যার ইংরাজী পরিভাষা 'global village' কে কতখানি ও কিভাবে বিকেন্দ্রীকৃত বা decentralised করা যায়। কারণ উন্নয়নের প্রশ্নের সাথে নীতি ও কার্য রূপায়ণের ক্ষেত্রে স্থানীয় রাজনীতি ও স্থানীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। ড. রজনী কোঠারীর মতে "People's initiative is necessary for grass roots sturggle for justice and for self-determination by ethnic groups..... People should fight for justice and against domination."

প্রকৃত অর্থে স্থানীয় সরকারের দ্বারা উন্নয়নের জন্য চাই (ক) জনগণ দ্বারা সক্রিয় ও কার্যকরী অংশগ্রহণ, (খ) পৌরসমাজের স্বেচ্ছামূলক ভূমিকা।

রাষ্ট্রসংঘের জনপ্রশাসন সম্পর্কিত বিভাগ স্থানীয় সরকারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছে যে, "local government is a political subdivision of a nation which is constituted by law and has substantial control of local affairs, including the powers to impose taxes or to extract labour for prescribed purposes. The goverening body of such an entity is elected or otherwise locally selected."[22] (স্থানীয় সরকার হচ্ছে জাতীয় সরকারের একটি উপ-শাখা যা দেশের আইন দ্বারা গঠিত এবং স্থানীয় বিষয়ের উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ রাখে বিশেষত 'কর' আরোপ করার ক্ষমতা থাকে বা স্বেচ্ছাশ্রম আদায় করতে পারে। এই শাসনকর্তৃপক্ষ নির্বাচিত হতে পারে বা মনোনীত হতেও পারে।)

Hugh Wallen অবশ্য কয়েকটি আবশ্যিক উপাদানের কথা বলেছেন যার সাহায্যে স্থানীয় সরকার গঠিত হয় ও কাজ করে। যেমন—এক নির্দিষ্ট ভূখন্ড ও জনগোষ্ঠী, একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো একটি পৃথক বৈধ সত্তা, কেন্দ্র বা আঞ্চলিক সরকার কর্তৃক বৈধভাবে প্রত্যর্পিত ক্ষমতা ও কার্যাবলী এবং এই প্রত্যর্পিত ক্ষমতার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বা Autonomy।

স্থানীয় জনগণ স্থানীয় সরকারে অংশগ্রহণ করার ফলে ব্যাপার দাঁড়ায় যে প্রথমত, সাধারণ স্থানীয় নাগরিকেরা মনে করেন স্থায়ী সরকার হচ্ছে "তাঁর, তাঁর জন্য এবং তাঁর দ্বারা (of the people, for the people and by the people) পরিচালিত সরকার"। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় জনসাধারণ নিজেরাই ঠিক করেন যে তাঁদের শাসক কে হবেন। তৃতীয়ত, যে শাসকেরা স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায় আসেন তাঁরা সর্বদাই তটস্থ থাকেন এই ভয়ে যে, তাঁরা যদি স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন বা সমস্যার প্রতি উদাসীন থাকেন, তাহলে পরবর্তীকালে তাঁরা ক্ষমতাচ্যুত হতে পারেন। চতুর্থত, স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার করে স্থানীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা যায়। এই সকল সুবিধা কোন মনোনীত স্থানীয় সরকার বা দূরবর্তী আমলাতন্ত্র দ্বারা সম্ভব নয়।

অবশ্য স্থানীয় সরকার যতই জনপ্রিয় হোক না কেন তার সমস্যাও রয়েছে প্রচুর। যেমন—(১) নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের সদস্যরা হতে পারেন অজ্ঞ, অশিক্ষিত, মূর্খ এবং তার ফলস্বরূপ সংকীর্ণ ও স্বার্থপর, (২) উৎপাদনমুখিনতা ও উৎপাদনশীলতার এক গুরুত্বের দিকে না তাকিয়ে সমাজসেবামূলক কাজের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়িয়ে যাওয়া। (৩) স্থানীয় সরকারের আমলাতন্ত্র হয় অত্যন্ত নিম্নমানের, অদক্ষ ও দুর্নীতিপরায়ণ এবং সর্বোপরি দায়িত্বহীন। (৪) স্থানীয় সরকারের স্বাতন্ত্র্য আনতে পারে কেন্দ্র ও রাজ্য স্থানীয় সরকারের মধ্যে সংঘাত ও বৈরিতা।

৩.২ স্থানীয় সরকারের ভূমিকা

Linkage এবং Autonomy-র প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা কি কেবল গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ক্রিয়ার মধ্যেই সীমিত থাকে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, স্থানীয় সরকার হচ্ছে উপযুক্ত একটি ব্যবস্থা যার দ্বারা স্থানীয় সামাজিক অর্থনৈতিক চাপকে সহজে প্রতিহত করা যায়। তাই স্থানীয় সরকার একটি Safety valve হিসাবে কাজ করে। কেন্দ্রীয় সরকারের তুলনায় অধিকতর দক্ষতার সাথে সেবা-পরিষেবা প্রদান করতে পারে স্থানীয় মানুষকে। সুতরাং স্থানীয় সরকার একটি delivery agency বা delivery system হিসাবে কাজ করতে পারবে। স্থানীয় সমাজ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকায় স্থানীয় উন্নয়নের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের তুলনায় ভালো কাজ করতে পারে। সুতরাং স্থানীয় সরকার একটি উন্নয়ন সংস্থা বা development agency হিসাবে কাজ করতে পারে। এছাড়া স্থানীয় সরকার জনসাধারণের কাছে অধিকতর দায়বদ্ধ থাকে। ফলে ইহা দায়বদ্ধকারী সরকার বলে বিবেচিত হয়। সর্বোপরি কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সংযোগকারী সরকার হিসাবে স্থানীয় সরকার ভূমিকা পালন করতে পারে।

স্থানীয় সরকার থাকলে স্থানীয় স্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের বা শাসকশ্রেণীর বিকল্প সমান্তরাল সামাজিক শক্তির দ্বারা সরকার গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে না। এছাড়া, স্থানীয় সরকার থাকায় কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের কাজের ভার অনেক পরিমাণে লাঘব হয়ে যায়। অথচ স্থানীয় সরকার এতই ক্ষুদ্র যে, কখনই কেন্দ্রীয় সরকারের threat বা challenge হয়ে উঠে না।

স্থানীয় সরকারের মূল্য হচ্ছে এই স্থানীয় সরকার এমন একটি সুযোগ দান করে যার মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণ ও সরকারের আলাপ-আলোচনা হতে পারে।

তাই বলা যেতে পারে যে, "A healthy local government is perhaps one in which central and popular influence over decision making are properly balanced."

তবে অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে Domain Linkage Autonomy প্রসঙ্গে স্থানীয় রাজনীতিক ও স্থানীয় সরকারের আলোচনায় মন্তব্য করা হয় যে, "Even though each county favoured local governments' with minimum controls from the centre/state in theory, in actual fact, they persued a centralised development strategy." (তত্ত্বগত ভাবে স্থানীয় সরকারের উপর কেন্দ্র/রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ কম থাকার কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক দেশেই উন্নয়নের কেন্দ্রীভূত কৌশল লক্ষ্য করা যায়।)

স্থানীয় সরকারের Autonomy বা স্বাতন্ত্র্য প্রসঙ্গে অধ্যাপক এস. এম. মীনাক্ষীসুন্দরম যথার্থই বলেন যে, "Care must also be taken to ensure that the system does not generate into self centred Localism, with each locality demanding a share of each infrastructurer."[23] (লক্ষ্য রাখা উচিত যেন স্থানীয় শাসনব্যবস্থা যে স্বার্থমগ্ন কূপমণ্ডুকতায় পর্যবসিত না হয়।)

পঞ্চায়েতীরাজ বা স্থানীয় সরকার সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ নির্মল মুখার্জী স্থানীয় সরকারকে "Third stratum" বলে অভিহিত করে Domain Linkage Autonay তে এক নূতন অভিধা যুক্ত করেছেন যার অর্থ দাঁড়ায় যে, "the literal meaning of self-government is autonomy as government without outside interference."

প্রকৃতপক্ষে বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে "to visualize the possibilities concretely with each

region and sub-region in a systematic and practical manner, to help build up the infrastructural facilities required and assist in everyway the changes in technology and organistation that are needed broad based processes of economic and social transformation." (প্রত্যেক অঞ্চল ও উপ অঞ্চলের এলাকাকে সুষ্ঠু ভাবে ও বাস্তবোচিত দৃষ্টিতে নির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন সম্ভাবনাকে বিচার করতে হবে এবং পরিকাঠামোগত সুবিধা গড়ে তুলতে হবে এবং সাংগঠনিক ও কৃৎকৌশলগত পরিবর্তন-এর জন্য আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের ব্যাপক ভিত্তিতে একটি প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে।)

৩.৩ সারাংশ

এই অংশে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে যে আধিপত্য ও স্বাতন্ত্র্যের সম্পর্ক রয়েছে সেই বিষয়ে একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার কোনমতেই জাতীয় সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন সরকার নয়, তবে স্থানীয় সরকারের স্থানীয় বিষয়ের পরিচালনায় স্বাতন্ত্র্য থাকা প্রয়োজন। সেই স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই যেন সংকীর্ণতায় পর্যবসিত না হয়—সে দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

৩.৪ অনুশীলনী

১। স্থানীয় রাজনীতি ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করুন।

২। স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের মধ্যে আধিপত্যের এলাকা ও স্বাতন্ত্র্যের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।

৩। স্থানীয় সরকার কি কেবলই স্থানীয় রাজনীতির ধারক ও বাহক মাত্র ?—যুক্ত ও অভিজ্ঞতার উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

৪। স্থানীয় সরকারকে কী কেন্দ্রের delivery agent বলা যায় ?

একক ৪ □ স্থানীয় সরকার, গণতন্ত্র ও উন্নয়ন

৪.০ উদ্দেশ্য
৪.১ প্রস্তাবনা
৪.২ সারাংশ
৪.৩ অনুশীলনী
৪.৪ গ্রন্থপঞ্জি

৪.০ উদ্দেশ্য

স্থানীয় সরকার যে গণতন্ত্রের একটি অঙ্গ তা তুলে ধরা এবং উন্নয়নের কাজে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা আজ যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করা এই এককের উদ্দেশ্য।

৪.১ প্রস্তাবনা

এই এককে স্থানীয় সরকারকে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের সাথে যুক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। তাই এই আলোচনায় যেমন স্থান পেয়েছে গণতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা, তেমনই স্থান পেয়েছে উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা। সর্বোপরি গণতন্ত্রের কাঠামো এবং উন্নয়নের কর্মসূচীর মেলবন্ধন কিভাবে স্থানীয় সরকার দ্বারা সম্ভব তা গভীরভাবে এই এককে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রায় প্রতিটি শিল্পোন্নত দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা স্থানীয় ও জনসাধারণের প্রশাসনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে নূতন করে চিন্তা শুরু হয়েছে বেশ কয়েকবছর আগে থেকেই, ১৯৯০-এর সময় থেকেই এই নূতন চিন্তার যাত্রা শুরু বলা যায়। গণতন্ত্রকে আরো অনেক কার্যকর ভাবে পাওয়ার জন্য এই নূতন চিন্তার প্রেক্ষাপট রচনা হয়েছিল।

এই নূতন চিন্তার ধারাকে জাতীয় স্তরে জনসেবামূলক কার্য্যাদি স্থানীয় সংগঠন বা স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেবার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় এবং স্থানীয় এলাকার উন্নয়ন ভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য স্থানীয় এলাকার উন্নয়ন ভিত্তিক পরিকল্পনা রচনা হতে থাকে।

ফলে সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার হতে শুরু করে। এই সংস্কার কর্মসূচীকে নাম দেওয়া হয় Structual Adjustment Programme (SAP)। এই সংস্কার কর্মসূচীর লক্ষ্য হল "to visualise a damocracy in which policy plays a new role : to empower, enlighten and engage citizen in the process of self government."

নাগরিকেরা যাতে ব্যাপকমাত্রায় সরকারের কর্মসূচী রূপায়ণ ও পরিচালনায় সুযোগ লাভ করে সেজন্য স্থানীয় সরকার, স্থানীয় জনসাধারণ ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমূহের অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হতে থাকে। অবশ্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের মাতব্বরিতে স্থানীয় উন্নয়নের কাজে স্থানীয় সরকারে মাধ্যমে স্থানীয় নাগরিকদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি হতে থাকে।

তা সত্বেও সাম্প্রতিককালে civil Society ধারণার উপর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। Civil society-র নানা অর্থ থাকলেও 'স্থানীয় সরকার, গণতন্ত্র ও উন্নয়ন' প্রসঙ্গে Civil Society বলতে বোঝায় "the values and interests of social autonomy in face of both the modern state and the capitalist economy." স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, বিশেষত স্থানীয় সরকারকে এখন State-এর বিকল্প হিসাবে ভাবা হচ্ছে যার মাধ্যমে Self-help Group এবং অন্যান্য Social Movements স্থানীয় উন্নয়নে ভূমিকা পালন করতে পারে।

Helen Ingrsam এবং Steven Rathgels Smith সম্পাদিত Public Opinion for Democracy গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, "the recent interest of many scholars in communitarianism also fits with this appeal to community and voluntary organizations as alternatives to rampant individualism and the power of the state."[20] (ইদানিং অনেক গবেষক যেভাবে সমাজবাদের প্রতি নজর দেয় কারণ সমাজ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হচ্ছে একমাত্র বিকল্প যা রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের বিকল্প হতে পারে।)

বস্তুত Communitarianism কে অধিকতর গণতন্ত্র বলা হচ্ছে। কারণ Community based organization বা community based government দ্বারা democratic state machinary- তে জনগণের অংশগ্রহণ বিশেষত Voting percentage বৃদ্ধি পেতে পারে এবং personal behaviour ও community problem-এর ক্ষেত্রে অধিকতর নাগরিক দায়িত্ব (Greater individual responsibility) দেখা যায়।

ইদানীং অবশ্য বেসরকারিকরণ কর্মসূচীর (Privatisation) দ্বারা সরকারি লালফিতার বাঁধন থেকে গণতন্ত্রকে মুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে। Privatisation বলতে বোঝানো হচ্ছে delegating the responsibility for the funding and delivery of public services to private organizatons.

এই বেসরকারিকরণ পর্যায়ে গণতন্ত্র অধিকতর প্রসারিত হয় বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ Privatisation encompasses many policies, including reduced public funding of services, government contracting with non profit and for-profit organizations, fees for services vouchers for public education, and a greater role for community organization in addressing the public problems. (বেসরকারিকরণের বহুমুখী প্রভাব দেখা যায় যেমন সরকারি ভরতুকি বা ব্যয় হ্রাস, মুনাফা বা মুনাফার উদ্দেশ্যগুলি সংগঠন থেকে রাষ্ট্রের সরে আসা যে কোন সেবার জন্য ফী গ্রহণ রাষ্ট্রের কাছ থেকে টাকা দিয়ে শিক্ষা লাভ ও অন্যান্য সমস্যায় বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ।)

বেসরকারিকরণের মূল ভিত্তি হচ্ছে এমন একটি ধারণা যার দ্বারা মনে করা হয় democracies produce rigid and inefficient bureaucracies। তাই বেসরকারিকরণের পথে এখন চলেছে গণতন্ত্রের যাত্রা। কারণ Privatization offers the hope that organization and market competition will empower citizens increase the efficiency of public services, and reduce the influence of special interest in policy making." (বেসরকারিকরণ ব্যক্তিগত সংগঠন উদ্যোগ ও বাজার প্রতিযোগিতাকে উৎসাহ দান করে নাগরিককে ক্ষমতাপ্রাপ্ত করে, জন-সুবিধা পরিষেবাকে দক্ষতার সঙ্গে বাড়িয়ে চলে এবং নীতি প্রনয়নে কায়েমী স্বার্থের প্রভাবকে খর্ব করে।)

অবশ্য বেসরকারিকরণ কিংবা স্থানীয় সংগঠন বা স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে গণ-অংশগ্রহণ দ্বারা গণতন্ত্রের প্রসারের যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তার বিরুদ্ধেও অনেক নানা যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে, (যেমন Michael crozier, Samuel Huntington, Joji Watanuki) "American government allows too many access-points for interest groups, and is thus unable to formulate policy adequately." (স্বার্থগোষ্ঠীদের জন্য মার্কিন সরকার অসংখ্য কেন্দ্র স্থাপন করে দেয় ও তার ফলে নীতিপ্রণয়ন সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয়।)

দ্বিতীয়ত, আর যে কারণে স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় সংগঠনের মাধ্যমে গণ-অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে বলা হয়, তা হলো—'community organizations are ill suited to carry the torch of more enhanced political participation! Karen Paget বলেন যে, "community organizations are inherently incapable of sustaining political participation." (ব্যাপক রাজনৈতিক অংশগ্রহণের জন্য বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হচ্ছে অনুপযুক্ত।)

তৃতীয়ত, অনেকে বলেন যে, "efforts to restructure government, such as decentralisation and community coalitions, may empower the wrong people and lead to regsssessive or ineffective policies. (বিকেন্দ্রিকরণ ও সমাজসেবীসংগঠনের উদ্ভবের ফলে ভুল লোকেরা ক্ষমতায় চলে আসতে পারে এবং ভুল ও পশ্চাৎপদ নীতি চালু করতে পারে।)

স্থানীয় সরকার গণতন্ত্র ও উন্নয়ন সম্পর্কে এই পরস্পর বিরোধী মতের মধ্যে একটা সমন্বয় করে আজকাল অনেকে বলেন যে, "One predominant solution to these problems of citizenship is mixed public-private collaborations. in which the State retains managerial authority and the private organizations is responsible for Programme implementation." (নাগরিকতার এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে সরকারি ও বে-সরকারি উদ্যোগের সংমিশ্রণ যার দ্বারা রাষ্ট্র তার কর্তৃত্ব বজায় রাখে ও কর্মসূচী রূপায়ণে থাকে বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব।)

বস্তুত স্থানীয় সরকার এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এবং বেসরকারি নাগরিকদের গণ অংশগ্রহণের মধ্যে একটি সেতু বন্ধন করতে পারে। স্থানীয় সরকার একটি Political institution হিসাবে উন্নয়ন ও নাগরিকদের অংশগ্রহণের বিষয়কে একটি সমন্বয় প্রচেষ্টা হিসাবে পরিচালনা করতে পারে যেখানে Development এর সাথে political participation এবং Political interaction ঘটাতে পারে।

একথা ঠিক যে "Political Scientists have for many years been puzzled by the decrease in voting and interest in politics despite the widespread attention to democracy world-wide !" (গণতন্ত্রের বিস্তার সত্বেও ভোটদানের সময় উপস্থিতির হারে হ্রাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগনকে উদ্বিগ্ন করেছে।)

কিন্তু তা সত্বেও Modern administration pushes ahead with plans to invigorate community organizations, support public-private partnerships and spur new levels of volunteerism in civic life, it would do well to be cognizant of the effect of policy design on political participation and the ways government can work with private organization and individuals to involve the citizenry in their own governance and public services without diminishing the efficiency or effectiveness of public policies." (আধুনিক প্রশাসন সমাজবদ্ধ সংগঠন ও সরকারি বেসরকারি উদ্যোগের মধ্যে সহযোগিতা নাগরিক জীবনে স্বতঃস্ফূর্ততা দ্বারা রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা ও দক্ষতার হ্রাস না ঘটিয়ে ও কার্যকারিতা নষ্ট না করে জননীতিকে নাগরিক প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস চালাচ্ছে।)

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এখন চলছে "উন্নয়নের রাজনীতি" (Politics of Development)। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে কৌশল অবলম্বনে পার্থক্য থাকলেও এই দেশগুলির "উন্নয়নের রাজনীতিতে" কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে—

(ক) উন্নয়নের লক্ষ্য সম্পর্কে ব্যাপক ঐক্যমত।

(খ) উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে সরকারের উপর অত্যাধিক নির্ভরতা।

(গ) আদিম-পরিচয়গত (Primodial identities) উপাদান জাতিগঠনের (national identities) উপাদান থেকে অনেক শক্তিশালী।

(ঘ) অবিরাম রাজনৈতিক অশান্তি ও অস্থিতিশীলতা।

(ঙ) আধুনিক শিক্ষিত রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপস্থিতি।

(চ) রাজনৈতিক কাঠামোসমূহের অসম বিকাশ।

উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই দেশগুলিতে দ্রুত সমাজ অর্থনীতির রূপান্তর প্রয়োজন। পশ্চিমী ধাঁচে বে-সরকারি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে উন্নয়ন করার জন্য দীর্ঘ সময় বা মূলধনী উপাদান এই দেশগুলির নাই। তাই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে নিজস্ব ক্ষমতা ও সম্পদের জোরে স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রণী চালিকা-শক্তির স্থান দখল করেছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় প্রশাসন হচ্ছে সমাজপরিবর্তনের ধারক ও বাহক। তাই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্তৃত্বের পরিকল্পনা ও প্রয়োজনমতো সমাজ পরিবর্তন প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দানের ক্ষমতার অধিকারী হতে হয় স্থানীয় সরকারকে। এছাড়া, সমাজ পরিবর্তন প্রক্রিয়ার গতি সঞ্চার করার দায়িত্ব ও গ্রহণ করতে হয় স্থানীয় সরকারকে। একদিকে সমাজ পরিবর্তনের সাথে স্থানীয় প্রশাসন বা সরকার নিজের সাযুজ্য বিধান করে চলে এবং অন্যদিকে সমাজ-পরিবর্তনের জন্যও স্থানীয় সরকারকে নিজেকে উদ্যোগ করতে হয়।

অন্যভাবে বলা যায় যে, উন্নয়নশীল দেশে আজ স্থানীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঠামোগত প্রকৃতির এক ব্যাপক পরিবর্তন তাই দেখা যাচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এখন স্থানীয় সরকার "উন্নয়নের" লক্ষ্য অর্জনের জন্য সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনমুখিন দৃষ্টিভঙ্গি এবং পেশাগত দক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে চলেছে।

স্থানীয় সরকার দ্বারা উন্নয়ন কর্মসূচীর পরিকল্পনা ও রূপায়ণ গ্রহণ করার ফলে প্রশাসনও রাজনীতির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে।

লুসিয়ান পাই (Lucian Pye)-এর মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, "তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বা কার্যকর প্রশাসন কোনটাই দেখা যায় না।" লুসিয়ান পাই-এর ঐ মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকারের ভূমিকা হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার জন্য চাই যে উন্নত রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন স্থানীয় মানুষের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার বা গণ অংশগ্রহণকারী প্রশাসন তা দিতে পারে একমাত্র স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় প্রশাসন।

তাই দেখা যায় যে, স্থিতিশীল ও সুসংহত রাজনৈতিক কাঠামোর প্রতিষ্ঠার ও সরকারের কর্তৃত্বমূলক গণতান্ত্রিক কাঠামোকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার দ্বারা উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উন্নয়নের মূল কথা হচ্ছে দুটি-(১) জাতীয় রাষ্ট্র গঠন (Nation-building) এবং (২) সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Socio-economic transfromation)। অন্যদিকে আধুনিক গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য—রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈধতা বজায় রাখা এবং (৩) রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। এই দুটি ধরনের লক্ষ্য পূরণ করার একমাত্র উপযুক্ত গণতান্ত্রিক হাতিয়ার ও কৌশল হচ্ছে—স্থানীয় সরকার।

উন্নয়নের উদ্দেশ্য শুধু স্থিতাবস্থা বজায় রাখা নয়। উন্নয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবর্তন, প্রগতি ও নূতনত্বের

উদ্ভাবন। উন্নয়ন-এর রাজনীতি হচ্ছে গণতান্ত্রিক রাজনীতি যা জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতি ও দাবির প্রতি দায়িত্বশীল ও সহানুভূতিশীল থাকে। উন্নয়নের গণতান্ত্রিক রাজনীতি তাই নমনীয়, পরিবর্তনশীল এবং লক্ষ্য অর্জনমুখীন।

উন্নয়নের সকল দিকে জনসাধারণের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের উপর স্থানীয় সরকার আজকের দিকে গুরুত্ব আরোপ করছে।

ভারতবর্ষে ৭৩তম সংবিধান সংশোধন দ্বারা পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা এবং ৭৪ তম সংবিধান সংশোধন দ্বারা পৌর শাসনব্যবস্থার গণতান্ত্রিকীকরণ ও উন্নয়নমুখীর ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটানো হয়েছে। তৃণমূলস্তর পর্য্যন্ত গণতন্ত্র ও উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা হয়েছে ভারতে ৭৩ তম ও ৭৪ তম সংবিধান সংশোধন অধীনের মাধ্যমে।

ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার সাফল্য ও ধারাবাহিকতা একথাই প্রমাণ করেছে, যে রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ব্যতীত গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব নয় এবং গণতন্ত্রের বিকাশের সাথে দেশের উন্নয়নের ধারা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণ ও জাতীয় উন্নয়নকে এক সূত্রে গেঁথে চলে স্থানীয় সরকার। অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক প্রভাত দত্ত ঠিকই বলেন যে "Poverty question is a question of power" তাই স্থানীয় সরকার হচ্ছে প্রকৃত অর্থে স্থানীয় সমাজের 'Power-structure'। এই ক্ষমতা কাঠামোর গণতান্ত্রিকীকরণই হচ্ছে সমাজের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য উন্নয়নের সোপান। সমাজে শ্রেণী সম্পর্কের পরিবর্তন ছাড়া ক্ষমতার কাঠামোর সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটানো যায় না। উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় সমগ্র জনসাধারণকে যুক্ত করতে পারলেই এই পরিবর্তন কাম্যভাবে ঘটানো সম্ভব। রাস্তা, বাঁধ, গৃহ-নির্মাণ, প্রাতিষ্ঠানিক এলাকা বা সরকারি অফিস এলাকা নির্মাণ প্রভৃতি কাজ শ্রেণী স্বার্থের সাথে যুক্ত। তাই উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও স্থানীয় সরকারের পারস্পরিক অন্বয়-এর মূল চাবিকাঠি হচ্ছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা বা Political Will। রাজনৈতিক সদিচ্ছা দ্বারা উন্নয়ন ও গণতন্ত্র নিজেদের বিকাশের ধারা ঠিক করে নেয়। সুতরাং বলা যায় যে, "Development approches could not be delinked from the political awareness building components." (রাজনৈতিক সচেতনতা ব্যতিরেকে উন্নয়ন-এর কোন দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করতে পারে না।)

স্থানীয় সরকারের কার্যপ্রক্রিয়ারও এই উন্নয়ন ও রাজনীতির পটভূমিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষজ্ঞ G. Palanithurai বলেছেন যে, "grassroot institutions which had once aimed at providing basic services have now come to entrust to the people themselves the responsibility of utilising of the facilities provided by the government for economic growth." (তৃণমূল প্রতিষ্ঠান যা এতদিন মূল-পরিষেবাসমূহ প্রদান করতো, সম্প্রতি পরিষেবার দায়িত্ব জনগণের উপর ন্যস্ত করে সরকারি অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণ কাজের সাথে নিযুক্ত করছে।)

৪.২ সারাংশ

এই এককে একটি কঠিন ও জটিল বিষয়ের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টি হলো—স্থানীয় সরকার ও গণতন্ত্র ও উন্নয়নের মধ্যেকার সম্পর্ক। এই বিষয়ের তাত্ত্বিক দিক সমূহ আলোচনা করে বলা হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার হচ্ছে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক। কিন্তু তার বিরুদ্ধেও কিছু যুক্তি রয়েছে। সেগুলিও উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর 'উন্নয়ন'-এর ধারণা আলোচনা করে স্থানীয় সরকার, যে ভাবে জনগণ-এর অংশগ্রহণকে উন্নয়নের কাজে যুক্ত তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সবশেষে ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টির উপসংহার

অবতারণা করা হয়েছে।

৪.৩ অনুশীলনী

১। উন্নয়নের সংজ্ঞা দিন। স্থানীয় এলাকার উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের ভূমিকার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২। স্থানীয় সরকার ও গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৩। স্থানীয় সরকার-এর প্রকৃতির পরিবর্তন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে উন্নয়নের রাজনীতি প্রসঙ্গে যেভাবে ঘটেছে তা আলোচনা করুন।

৪। স্থানীয় সরকার কিভাবে গণতন্ত্রের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে তা লিখুন।

৫। স্থানীয় সরকার দ্বারা জাতীয় উন্নয়ন কখনই সম্ভব নয়—এই ধারণার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দিন।

৪.৪ গ্রন্থপঞ্জি

1. Dilys M. Hill - Democratic Theory and Local Government, George Allend Union Ltd. 1974.
2. SN Jha & P.C. Mathur (ed) - Decentralisation & Local Politics. Sage. Delhi, 1999.
3. Konard A. Foundalion - Local Government Finances in India, Manohar, 1998.
4. Rakharhi Chatterjee (ee) - Politics India-South Asia, Delhi, 2001.
5. Mohit Bhattacharya - State Municipal Relation, IIPA, Delhi 1972
6. Abhijit Datta - Municipal Finances in India, IIPA, 1984
7. Asoke Kumar Mukhophadhyay - Panchayat Administration in West Bengal, World Press, Calcutta, 1984.
8. Mohit Bhattacharya - Approaches to the Local Self Government- - Calcutta University Journal of Political Studies, University of Calcutta.

একক ৫ □ গ্রাম শাসনের বিবর্তন

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য
৫.২ প্রস্তাবনা
১.৩ গ্রাম সমাজের তাৎপর্য
৫.৪ গ্রাম শাসনের গুরুত্ব
৫.৫ গ্রাম শাসনের বিবর্তন
৫.৫.১ গ্রাম শাসনের অতীত ঐতিহ্য
৫.৫.২ মধ্যযুগে গ্রাম শাসনের চিত্র
৫.৫.৩ ব্রিটিশ ভারতে গ্রাম শাসনের রূপ
৫.৬ গ্রামীণ শাসন বিষয়ে গান্ধীজির প্রকল্প
৫.৭ গ্রামীণ শাসন বিষয়ে গণপরিষদের বিতর্ক
৫.৮ স্বাধীন ভারতে গ্রামীণ শাসনের রূপ
৫.৮.১ প্রথম পর্যায় : ১৯৪৮-১৯৫৬
৫.৮.২ দ্বিতীয় পর্যায় : ১৯৫৭-১৯৭৬
৫.৮.৩ তৃতীয় পর্যায় : ১৯৭৭-১৯৮৫
৫.৮.৪ চতুর্থ পর্যায় : গ্রাম শাসনের সাংবিধানিক মর্যাদা
৫.৯ রাজ্যে গ্রাম শাসনের রূপ : সাম্প্রতিক ব্যবস্থা
৫.১০ সারাংশ
৫.১১ অনুশীলনী
৫.১২ গ্রন্থপঞ্জি

৫.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে—

- গ্রাম শাসনের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থী কিছু সাধারণ ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- ভারতে গ্রাম শাসনের বিবর্তন বিষয়ে একটি সাধারণ চিত্র পাবেন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রাম শাসনের রূপ ও মর্যাদা কিভাবে বদলে গেছে সে বিষয়ে জানতে পারবেন।
- রাজ্যে রাজ্যে গ্রাম শাসনের ধারাটিকে চিহ্নিত করতে পারবেন।

৫.২ প্রস্তাবনা

আদর্শ সমাজব্যবস্থা ও সামাজ সংগঠনের ভিত্তি হল গ্রাম। ভারতের মত, উন্নয়নশীল সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায়

সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক উন্নয়নের মূল কেন্দ্র হল গ্রাম। গ্রাম সমাজের সামাজিক-সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য নিয়ে যেমন উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ করেছেন সমাজবিজ্ঞানী ও নৃতাত্ত্বিকেরা তেমনি গ্রাম শাসনের রূপ, কাঠামো ও রাজনৈতিক সাংবিধানিক প্রক্রিয়া লিখে পর্যালোচনা করেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং প্রশাসন ও পরিচালন বিশেষজ্ঞগণ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিহার্য শর্ত হিসাবেই গুরুত্ব ও স্বীকৃতি পেয়েছে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের (Democratic Decentralization) ভাবনা। ভারত সহ অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশেই বিকেন্দ্রিকরণের ধারণাকে সফল করতে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণ বলতে বোঝায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সংগঠনকে কেন্দ্র থেকে ক্রমশ আঞ্চলিক ও স্থানীয় ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থানীয় ও সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় পথ প্রশস্ত করাই গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের লক্ষ্য। স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই এই ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হতে পারে। গ্রামের স্বায়ত্বশাসন (Rural Self-government) এই স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের আগে থেকেই গ্রাম, সমাজ, গ্রামীণ স্বশাসন ও পঞ্চায়েতের ধারণা কার্যকর ছিল। প্রাচীন ভারতে এবং মধ্যযুগে গ্রাম শাসনের দেশ ও রচিত রীতি অবশ্যই বিশিষ্টরাই দাবি করতে পারে। ব্রিটিশ শাসনকালে এই ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ হয়েছে প্রশাসনিক ও আইনগতভাবে। ব্রিটিশ শাসনকালেই আধুনিক অর্থে স্বায়ত্তশাসন বলতে আমরা যা বুঝি তার গোড়াপত্তন হয়েছে ও বিকাশ ঘটেছে। স্বাধীন ভারতবর্ষে গ্রাম শাসনের উদ্ভব ও বিকাশে প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশ প্রশাসনিক ও আইনগত অভিজ্ঞতাকেই গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে অবশ্য দেশের বাস্তব পরিস্থিতি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন ও সংগঠনের ব্যবহারিক কার্যকারিতার বিষয়টি উপলব্ধি করে এ ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক দৃষ্টি দেওয়া হয়।

স্বাধীন ভারতে প্রাথমিকভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসাবেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে গ্রাম শাসনের বিশেষ ধ্যান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ইতিপূর্বে গান্ধীজি নির্দেশিত গ্রাম স্বরাজ ও পঞ্চায়েত নিয়ে একটি মহলে গভীরভাবে ভাবনা চিন্তা হয়েছে। ১৯৫৭ সালের আগে অবশ্য গ্রাম শাসনের কোন সুসংগঠিত প্রশাসনিক উদ্যোগ ছিল না। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম একটি বলিষ্ঠ প্রকল্প পেশ করে বলবন্ত রাই মেহতা কমিটি। গ্রাম শাসনের রূপ হিসাবে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রকল্পটি এদেশে প্রথম পেশ করে ওই কমিটি। তবে এই প্রকল্পটির কার্যকারিতা মাত্র দশ বছরের মধ্যেই লোপ পায়। এ বিষয়ে পরবর্তী সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯৭৭সালে। জনতা সরকারের উদ্যোগে গঠিত অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশ অনুসারে এদেশে আবার শুরু হল গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের এক নতুন অধ্যায়। পরবর্তীকালের গ্রাম শাসনের ইতিহাস অবশ্যই রাজনৈতিক তৎপরতার ইতিহাস। জনতা সরকারের পতনের ফলে কেন্দ্রীয়ভাবে এক্ষেত্রে কোন উদ্যোগ না দেখা দিলেও পশ্চিমবঙ্গ সহ বেশ কিছু রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এক নতুন গতি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত সম্পর্কে একটি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। নব্বইয়ের দশকে কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে তার রাজনৈতিক সদিচ্ছার পরিচয় দেয় পঞ্চায়েতকে সাংবিধানিক মর্যাদা দিয়ে (৭৩তম সংবিধান সংশোধন আইন, ১৯৯২)। পশ্চিমবঙ্গেও কেন্দ্রীয় আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রচিত ও প্রযুক্ত হয় পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত সংশোধন আইন, ১৯৯৪। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য রাজনৈতিক পঞ্চায়েতের (Political Panchayat) ভাবনাকে রূপ দেবার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকেই।

বর্তমান একঁকের প্রথম অংশে গ্রাম সমাজের তাৎপর্য এবং গ্রাম শাসনের গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী অংশে গ্রাম শাসনের অতীত ও মধ্যযুগের ভারতীয় ঐতিহ্য, ব্রিটিশ শাসনকালে গ্রাম শাসনের রূপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতে গ্রাম শাসনের প্রেক্ষাপট হিসাবে যুক্ত হয়েছে দুটি আলোচনা—গ্রাম শাসন বিষয়ে গান্ধীজির প্রকল্প এবং গ্রাম শাসনের তাৎপর্য নিয়ে গণপরিষদের বিতর্ক। এরপর একে একে স্বাধীন ভারতে গ্রাম

শাসনের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককের সর্বশেষ আলোচনায় এসেছে পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যে গ্রাম শাসনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি।

৫.৩ গ্রাম সমাজের তাৎপর্য

গ্রাম হল সমাজের অন্যতম প্রধান প্রাথমিক সংগঠন। জনসংখ্যা, এলাকা, পরিবেশ, সামাজিক সম্পর্কের গভীরতা, সামাজিক কাঠামো, জীবিকা, গোষ্ঠী চেতনা ও সংহতির আদর্শ—সব দিক থেকে বিচার করেই বলা যায় গ্রাম সমাজ সমাজের এক অনন্য সাংগঠনিক রূপ। বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক রেডফিল্ড, (R.Redfield) গ্রামকে বলেছেন ' The Little Community' এবং গ্রাম হল 'the very predominant form of human living throughout, the history of mankind' সমগ্র মানবজাতির তিন-চতুর্থাংশই বসবাস করে গ্রামে। স্বাতন্ত্রে, ক্ষুদ্রত্বে, নৈকট্যে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতায় গ্রাম বিশিষ্ট।

ভারতবর্ষ গ্রামভিত্তিক সমাজের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। ভারতীয় সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীরূপ হল গ্রাম সমাজ। হেনরী মেইন (H.S.Maine), কার্ল মার্কস (K. Marx), রেডফিল্ড, বেইলি (F. G. Baily), ক্যাথলিন গার্ড (K. Gaugh), ডেভিড ম্যানিডেলবর্ম (D. G. Mandelbaum), আঁদ্রে বেতাই (A. Beteille) প্রমুখ পাশ্চাত্ত সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদ্ ছাড়াও ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক এম. এন. শ্রীনিবাস (M. N. Srinivas), এস. সি. দুবে (S. C. Dube), এম. এস, গোরে (M. S. Gore), রামকৃষ্ণ মুখার্জী (R. N. Mukherjee) প্রমুখের গবেষণাধর্মী লেখা থেকে ভারতের গ্রাম সমাজের সামাজিক-সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্বের কথা আমরা জানতে পারি। মেইন ভারতের গ্রামীণ সংগঠনকে অভঙ্গুর (Indestructible) এবং সুবিধাজনক শাসনরূপ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কার্ল মার্কস প্রশংসা করেছেন গ্রামের আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার। গ্রাম সমাজ ও পল্লীসমাজের বিকাশই যে দেশের উন্নয়নের প্রধান মাপকাঠি একথা উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করেছেন গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথ। গ্রামীণ ঐক্য ও সংহতির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সমাজ বিজ্ঞানীরা যদিও সামাজিক অচলতা, বর্ণপ্রধান্য, গ্রামীণ কুসংস্কার আর্থিক বৈষম্য ও দারিদ্র—গ্রামীণ ভারতের এইসব নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের কথাও অনেক গবেষকই বলেছেন। এসব সত্ত্বেও ভারতের গ্রাম সমাজ ও জনজীবনে সংগঠিত ও পরিকল্পিত পরিবর্তনের প্রভাব যে গড়েছে, সংগঠনে, নেতৃত্বে, রাজনৈতিক আচরণে, আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যে গ্রাম সমাজ যে নতুন গতি লাভ করেছে সে বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত পোষণ করেন। স্বাধীন ভারতে গ্রাম যে ক্রমশ তার সাবেকি বৈশিষ্ট্য (জাতপাত, কু-সংস্কার, ধর্মীয় বিশ্বাস) ছেড়ে পরিবর্তনের সহায়ক সংগঠন বিদ্যালয়, রাজনৈতিক দল, সংবাদমাধ্যম, সমষ্টি পরিকল্পনা, এসবের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞানীরা এ বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এস. সি. দুবে গ্রাম সমাজের এইসব পরিবর্তনের দিকে তাকিয়েই বলেছেন, গ্রাম হল দূর ভবিষ্যতের আদর্শ (Village as an ideal for the distant future)। নতুন আইনী ব্যবস্থা, পঞ্চায়েত সংগঠন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার গ্রামীণ ভারতের চেহারায় আমুল পরিবর্তন এনেছে। গ্রামে জনসংস্কৃতি (Folk-Culture), গ্রামের আর্থিক সাংগঠনিক সম্পদ ও কর্মতৎপর মানবসম্পদ ভারতের জাতীয় জীবনকে সমানভাবে প্রভাবিত ও বিকশিত করছে সন্দেহ নেই। গ্রাম সমাজের এই রূপান্তর ও অবদানের মধ্যেই আছে এর প্রকৃত তাৎপর্য।

৫.৪ গ্রাম শাসনের গুরুত্ব

গ্রাম সমাজের তাৎপর্যের মূল্যেই গ্রাম শাসনের গুরুত্ব বিচার করা যায়। ভারতের গ্রাম সমাজের বিশাল ঐতিহ্য, ব্যাপ্তি, সমাজ কাঠামো, জনজীবন, গোষ্ঠী চেতনা ও সংহতি, পরিবেশ সব কিছুই গ্রামে একটি সংগঠিত ও সংহত শাসনের দাবি করে। গ্রামের শাসন বলতে আমরা বুঝি সংগঠিত ও পরিকল্পিতভাবে গ্রামের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ। সন্দেহ নেই গণতান্ত্রিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রনই হল গ্রাম শাসনের একটি প্রত্যাশিত রূপ। ভারতের মত গ্রাম সমাজে গণতান্ত্রিক শাসন ও নিয়ন্ত্রণের এই প্রত্যাশিত রূপটিকে সফল করার জন্যই গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের (Democratic Decentralization) আদর্শকে প্রচার করেছেন এদেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও জনপ্রশাসনবিদগণ। গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার (Rural Self-government) মধ্যেই আছে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের আদর্শ ও কার্যকর রূপ। ভারতের মত গ্রাম প্রধান দেশের উন্নয়নের প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ হল গ্রামের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় রূপান্তর। এই রূপান্তর কার্যে দেশের সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা একান্ত প্রয়োজন। গ্রামের মানুষের জন্য স্ব-শাসনের সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেই তা সম্ভব। গ্রামের এরকমই একটি স্ব-শাসিত সংস্থা হল পঞ্চায়েত। বহু পূর্ব থেকেই এই ধরণের পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব ছিল। তবে বর্তমানে আজকের এই গণতান্ত্রিক যুগে পঞ্চায়েত আর পূর্ব পরিচিত রূপ নিয়ে অর্থাৎ নিছক একটি গ্রামীণ তদারকী বা পরামর্শদান সংস্থা, হিসাবে হাজির নয়। আজকের যুগে এটি আর কোন ক্ষুদ্র সংস্থা নয়, গ্রামাঞ্চলে সরকারি উন্নয়ন ও প্রশাসনের, গ্রামের নাগরিকের সরকারি কার্যকলাপে প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণের এক অতি আবশ্যিক সংগঠন। সংবিধানে এর স্বীকৃতি আছে। রাজ্যে রাজ্যে এর স্বীকৃত আইন ও বিধিবিধান আছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতী রাজ আজ গ্রামসংগঠন ও পরিচালনার এক জনপ্রিয় মাধ্যম।

প্রান্তলিপি : পঞ্চায়েত বলতে সাধারণভাবে বোঝায় পাঁচজন অভিজ্ঞ ও বয়োবৃদ্ধ মানুষের শাসন। গ্রামের মানুষ প্রথাগত ভাবেই এই পাঁচজন প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করতো। গ্রামের বিভিন্ন কাজে ও উন্নয়নে পরামর্শ ও তদারকী সংস্থা হিসাবে কাজে করতো এই পঞ্চায়েত। শান্তিরক্ষা, বিবাদ-নিষ্পত্তি থেকে শুরু করে গ্রামের প্রায় সব কাজেই পঞ্চায়েত ছিল এক প্রয়োজনীয় সংগঠন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও জনপ্রশাসনের তাত্ত্বিকদের অনুসরণ করে বলা যায়, স্থানীয় তথা গ্রাম শাসনের তাৎপর্য বহুবিধ। স্থানীয় শাসনের গুরুত্ব বোঝাতে অ্যালেক্স একভিল (Alexis De Toc Queville) বলেছেন এর মধ্যে আছে মুক্ত জাতির শক্তি। রুশো (J. J. Rousseau) জনগণের সহযোগিতা আর স্বশাসনের মধ্যেই পেয়েছেন সামাজিক চুক্তির স্বার্থকতা। সক্রিয় এবং গভীরভাবে যুক্ত নাগরিকের (an active, involved Citizenry) ধারণাকে প্রচার করে তিনি বলেছেন, শাসিতেরও শাসক হবার অধিকার আছে। শুধুমাত্র রাষ্ট্রই জন অংশগ্রহণের ক্ষেত্র নয়, এর জন্য গড়ে তুলতে হবে স্বশাসনের এক সমাজ-রূপ (a type of society) এই সমাজ রূপের মধ্যেই রাষ্ট্রের কাজ আর নাগরিকের কাজ মিলেমিশে যাবে (A society in which affairs of the state are integrated into the affairs of ordinary citizens-Rousseau) জন স্টুয়ার্ট মিল (J. S. Mill), হ্যাবল্ড ল্যাস্কি (H. J. Laski) স্থানীয় শাসনের পক্ষে বলেছেন। গণ অংশগ্রহণের ধারণাকে সফল করতে প্রত্যেক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়ার সুপারিশ করেছেন অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রের অন্যতম প্রবক্তা পৌলানেজও ম্যাক ফারসন (N. Poulantzas; C.B. Macpherson)। পৌলানেজ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতাও স্থানীয় ক্ষেত্রে গণঅংশগ্রহণের পক্ষে বলেছেন। গণতন্ত্রকে প্রসারিত করা এবং সফল নাগরিককে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রিক প্রশ্নে মুখোমুখি বসানো সম্ভব বলেই ম্যাকফারসন মনে করেন। অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রের সমর্থক অন্য এক লেখক পেটেম্যান (C. Peteman) বলেছেন নাগরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে শুধুমাত্র নাগরিকের মানবিক বিকাশ ও রাজনৈতিক উৎকর্ষই বৃদ্ধি পায় না, এর ফলে নাগরিকের মধ্যে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার প্রবণতা কমে, নাগরিকের মধ্যে রাষ্ট্রকার্য বিষয়ে সচেতনতা ও সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

জনপ্রশাসনের সাংগঠনিক তত্ত্বে, বিশেষত বৈজ্ঞানিক পরিচালনা (Scientific Management), সাইমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ মডেল (Decision-Making Model), প্রশাসনিক আচরণবাদের তত্ত্বে (Administrative Behaviour) বা ওয়েবারের আমলাতন্ত্রের মডেলে (Bureaucratic Model) গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের ভাবনা গুরুত্ব পায়নি। তবে অষ্ট্রমের (V. Ostrom) জন পছন্দের তত্ত্বে (Public Choice Theory) রাষ্ট্র ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের ভাবনা গুরুত্ব পেয়েছে সরকারি ক্ষমতার আধিক্য ও অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের প্রতিষেধক হিসাবে। গণপছন্দের তত্ত্বে রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক ও নাগরিক-বান্ধব হিসাবে উপস্থিত করার কথা বলা হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশ ও তৃতীয় বিশ্বের জন্য উন্নয়ন প্রশাসনের যে মডেল ফ্রেড রিগস (F. Riggs) প্রমুখের চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে এই দেশগুলির সামাজিক-আর্থিক বিন্যাস অনুসারে উন্নয়নের এক সহজাত এবং গণতান্ত্রিক ধারণা প্রচার পেয়েছে। ভারতবর্ষে প্রাথমিকভাবে উন্নয়নের নির্ভরশীল, ভাবনা (পাশ্চাত্যের উন্নত রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীলতা), প্রশাসনিক কেন্দ্রিকতায় ধারণা প্রাধান্য পেলেও শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক ও সুশাসনের (Good Governance) স্বার্থে বিকেন্দ্রিকৃত ও অংশগ্রহণকারী প্রশাসনের ধারণা গুরুত্ব পায়। অবশ্য এক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালের (নব্বইয়ের দশক থেকে) ভাবনা হল প্রশাসনকে উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের (Liberalization and Globalization) ধারায় প্রয়োগ করা। স্থানীয় শাসন বা গ্রাম শাসনের ক্ষেত্রেও আজ সুশাসনের মান হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে গণতান্ত্রিক ও দায়বদ্ধ প্রশাসন বা জনস্বার্থমুখী প্রশাসনের সাথে সাথে ধারাবাহিক উন্নয়ন, স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং বহিরাগত প্রযুক্তি, জ্ঞান, সংগঠন ও সহায়তাকে আহ্বান করার ভাবনা।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও জনপ্রশাসনের এইসব ভাবনা থেকে একটা কথা স্পষ্ট—গণতান্ত্রিক শাসনই আদর্শ, ন্যায়নির্ভর জনমুখী শাসন এবং গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ভাবনাকে কাজে লাগিয়েই এই শাসনকে বাস্তব ও সফল করে তোলা সম্ভব। বিকেন্দ্রিকরণ গ্রামের মানুষের কাজে 'নাগরিকতার শিক্ষাকেন্দ্র' হিসাবে পরিচিত। গ্রাম শাসনের মাধ্যমেই গ্রামের মানুষ নাগরিক জ্ঞানে, শাসন সংগঠনে শিক্ষিত ও সংগঠিত হতে পারে এবং স্বাধীনভাবে শাসন, প্রশাসন ও উন্নয়নের কাজে অংশ নিতে পারে। শুধু শাসন বা নিয়ন্ত্রণ নয়, এই শাসনের মাধ্যমে দায়বদ্ধতায় একটি শৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। বৃহদায়তন রাষ্ট্রের পরিবর্তনশীল ও জটিল সমস্যার সমাধানে, কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণ আদর্শ ও অপরিহার্য ব্যবস্থা। ভারতের মত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়, গণতান্ত্রিক, দায়িত্বশীল ও কল্যাণকর রাষ্ট্রে, উন্নয়নমুখী প্রশাসনে, গ্রাম প্রধান ও কৃষি অর্থনীতিতে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা অপরিহার্য।

৫.৫ গ্রাম শাসনের বিবর্তন

বর্তমান এককের পরবর্তী অংশের আলোচনা থেকে ভারতের গ্রাম শাসনের বিবর্তনের ইতিহাস আপনারা জানতে পারবেন। এক্ষেত্রে গ্রাম শাসনের অতীত ঐতিহ্য কী ছিল অর্থাৎ প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতবর্ষে গ্রাম শাসনের রূপ কেমন ছিল এবং ব্রিটিশ ভারতে বিবর্তিত হয়ে স্বাধীন ভারতে এই ব্যবস্থা কী রূপ পেয়েছে সেই ইতিহাসটি বর্ণনা করা হয়েছে।

৫.৫.১ গ্রাম শাসনের অতীত ঐতিহ্য

ভারতের মাটিতে গ্রাম শাসনের শিকড় গভীরেই ছিল। প্রাচীনকালে ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, রামায়ন, মহাভারত বা নীতিশাস্ত্রের যুগে গ্রামই ছিল ভারতীয় সমাজের কেন্দ্র (Nucleus), ভারতের আর্থব্যবস্থার মৌল শক্তি। ভারতে

প্রাচীন যুগে হিন্দু সমাজ ও সমষ্টি জীবন ইউরোপের মত রাষ্ট্রনির্ভর ছিল না। এই অর্থে ওই যুগে যুগোপযোগী কোন রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি বা স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা ছিল না। গণতান্ত্রিক সমাজ জীবনকে মানব সমষ্টির শ্রেষ্ঠ পরিণতি হিসাবেও সে যুগে ভাবা হত না। সমস্বার্থ, পারস্পরিক সহায়তা, চিন্তা ও চরিত্রের আদর্শে সমতা, আচার নিয়মে সমতা ওসব কারণেই মানুষ একটি সমষ্টিতে মিলিত হয় এবং শাসনের আশ্রয়ে আসে। সন্দেহ নেই জনসমষ্টির নিবিড় সংযোগের ফলেই ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে সমষ্টি, নেশন, রাষ্ট্র ও শাসন। শাসন খাতে স্বধর্মে পরিচালিত হতে পারে এবং জনমানুষকে অন্যায় প্রভুত্ব থেকে রক্ষা করতে পারে ভারতীয় সমাজের সেটিই ছিল মূল লক্ষ্য। শাসন খাতে গণশাসন পদ্ধতি হতে পারে, প্রভুত্বে রূপায়িত না হয় এই উদ্দেশ্যেই ধর্মরাজ্য ও দন্ডনীতির ভাবনা এ দেশে প্রচলিত হয়। হিন্দু সমাজে রাষ্ট্রধর্ম বা রাজশাসনই শেষ কথা ছিল না, নিরপেক্ষ ও স্বায়ত্ত অধিকার সম্পন্ন মানবধর্মই ছিল বড় কথা। দৃঢ় সংবদ্ধতা, সমবায়ই ছিল এর শক্তি। এই সংঘবদ্ধতা ও সমবায়কে ভিত্তি করেই প্রাচীন ভারতবর্ষে সামাজিক ব্যবস্থাপনার অঙ্গ হিসাবে স্বশাসনের ব্যবস্থা ছিল। ধর্মশাস্ত্রে স্থানীয় ভিত্তিতে ধর্মস্থাপনে, শাসনরক্ষণে, ধনোৎপাদনে, সমাজ সেবার কাজে বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণগোষ্ঠীর ভূমিকা ছিল। বর্ণ কাঠামো শাসনের ভিত্তি হলেও কৃষি উৎপাদন., রাজস্ব ও কর ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, সমষ্টি শ্রমকে ব্যবহার করাই স্থানীয় প্রশাসনের কাজ। সভা, সমিতির মাধ্যমে স্থানীয় শাসন পরিচালিত হত।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গ্রাম, বিশ জনপদ বা ভূমি পরিচালনা ও তদারকের উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে কোন নতুন ভূমিখন্ড বা ধ্বংসপ্রাপ্ত অঞ্চলে গ্রাম গঠন করা যাবে। একশো থেকে পাঁচশোর মত পরিবার এবং ২,২৫০ গজ এলাকা নিয়ে নদী, পাহাড়, অরণ্য ও পরিখার বেষ্টনে এক একটি গ্রাম গঠিত হবে। ৮০০ গ্রাম নিয়ে গঠিত স্থানীয় (Sthaniya), ৪০০ গ্রাম নিয়ে গঠিত দ্রোণমুখ (dronamukha) ২০০ গ্রাম নিয়ে গঠিত খার্বটিক (Kharvatika) এবং ১০টি গ্রাম নিয়ে গঠিত সংগ্রহণ (Sangrahana) গড়ার যে সুপারিশ কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে করেছেন তা আধুনিক কালের ত্রিস্তর বা চারস্তরের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ছবিটিই যেন তুলে ধরে। তবে কৌটিল্যের এই গ্রামব্যবস্থা রাজার কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণেই পরিচালিত হত। ডাণ্ডরিকা, শবর, তীরন্দাজ, শীকারী, চন্ডালদের হাতে ছিল রাজ্যের এইসব এলাকা সুরক্ষার দায়িত্ব। ঋত্বিক, পুরোহিত, বেদজ্ঞ ব্যক্তিদের গ্রাম দান প্রথা চালু ছিল, এঁদের কর থেকে অব্যাহতির ব্যবস্থা ছিল। গোপ, স্থানীকা ইত্যাদিদেরও ভূমি অর্পণ যোগ রীতি ছিল তবে অর্পিত ভূমি হস্তান্তর, বিক্রয় বা বন্ধক দেবার কোন অধিকার এদের ছিল না। প্রধানতঃ উৎপাদনের জন্যই ভূমি ব্যবহৃত হত, যারা জমিতে উৎপাদন করতো না তাদের ভূমি বাজেয়াপ্ত করা হত। ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, কর বিলোপ বা লাঘবের ব্যবস্থা, সমবায়িক নির্মাণ ব্যবস্থা, বৃদ্ধি, অনাথ, অসহায় ব্যক্তিদের দায়দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রের। রাজস্ব আদায়, ভূমি ও অরণ্যের উপর তদারকের ব্যবস্থা, বিবাদ নিষ্পত্তি ও বিচার ইত্যাদি বিষয়ের উপর কৌটিল্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মৌর্য যুগে, রাজ্য শাসন পদ্ধতির যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে গ্রাম শাসনের ও উন্নত ভূমি প্রশাসনের উল্লেখ আছে। কেন্দ্রীভূত শাসন হলেও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বা অশোকের শাসনকালে রাষ্ট্রের কাজ যে প্রসারিত হয়েছে, পরিষেবার কাজ যে নগর ও গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে ইতিহাসে তার বিবরণ পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ জাতকে 'ভোজক' (গ্রামের পরিচালক), 'বাজাবলী' (গ্রাম থেকে আদায় করা রাজস্ব) ইত্যাদির কথা আছে। বৈদিক পরবর্তী যুগে সাতবাহন রাজ্যে গ্রাম শাসনের ধারণা ছিল। পুরোহিত, গ্রামনী, গ্রামিকা ইত্যাদিদের হাতে ছিল গ্রামের নিয়ন্ত্রণভার। জমিদান,

প্রান্তলিপি : গুপ্ত শাসনে ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল, বীথি ও গ্রাম ওইভাবে প্রশাসনিক, বিভাগ ছিল। প্রতি বিভাগেরই একটি কেন্দ্র এবং তার একটি অফিস (অধিকরণ) ছিল। এখান থেকেই পরিচালনা ও তদারকীয় কাজ হত। সেকালে স্বায়ত্তশাসন প্রথা যে কতটা দৃঢ় ছিল তার পরিচয় মেলে ধনী, মহাজন, বণিক ইত্যাদিদের প্রতিনিধিত্বে গঠিত বিধিবদ্ধ সংঘ-প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মে। জমি ক্রয় বিক্রয় ও পরিচালনার কাজে এই সংঘের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

জমির মালিকানা, গ্রামাঞ্চলে বিশেষ শ্রেণীকে পৃষ্ঠপোষকতা দান ইত্যাদি ব্যবস্থা ছিল। গুপ্তযুগে ভূমি প্রশাসন, নগর শাসনের ব্যবস্থা ছিল অভূতপূর্ব। গ্রামের শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব ছিল 'গ্রামীক' নামক রাজকর্মচারীর হাতে। পরবর্তীকালে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণের অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন হর্ষবর্ধন। নাগরিক পরিসেবাকে প্রসারিত করতে তাঁর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। বাংলা দেশে পালরাজাদের আমলে গ্রামে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে থাকতেন 'গ্রামপতি', বিষয়পতি' নামক কর্মচারী। জমির জরিপ করতেন 'ক্ষেত্রপ' 'প্রমাতৃ' নাম কর্মচারী। শান্তি শৃঙ্খলার দায়িত্বে ছিলেন 'দান্ডিক', 'দণ্ডশক্তি' প্রমুখ কর্মচারী। সেন রাজাদের আমলেও ভুক্তি, মণ্ডল, শাটক, চতুরক, আবৃত্তি ইত্যাদি প্রশাসনিক বিভাগও কেন্দ্র ছিল।

৫.৫.২ মধ্যযুগে গ্রাম শাসনের চিত্র

মধ্যযুগে গ্রাম শাসনের একটি সুস্পষ্ট ধারা চোখে পড়ে। সুলতানী আমলে ও মুঘল যুগে স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অভিনবত্ব চোখে পড়ে। সুলতানী যুগে রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতা থাকলেও পরিষদীয় শাসন ছিল অর্থাৎ মন্ত্রীদের পরামর্শ তিনি নিতেন। সে যুগে স্থানীয় কাজকর্ম পরিচালনার জন্য ছিলেন দেওয়ান-ই ইন্সা। স্থানীয় ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের বিষয়টিও এ যুগে ছিল। তবে মুঘল যুগেই স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে সংস্কারের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্যণীয়। ইতিপূর্বে শেরশাহের আমলে পরগণা ও গ্রাম শাসনের একটি টাকা প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামের শাসনভার ছিল পঞ্চায়েতের হাতে। গ্রামের বয়োবৃদ্ধ ও দায়িত্বশীল মানুষের হাতে শান্তিরক্ষা, বিচার এবং আর্থিক তদারকীর দায়িত্ব ছিল। ভূমি ও রাজস্ব প্রশাসনে সুশাসন ও সুবিচার দেবার উদ্দেশ্যে দায়িত্বশীল কর্মচারী (আমিন, কানুনগো, পাটোয়ারী) নিয়োগ করা হয়েছে। আকবরের আমলে সাম্রাজ্য শাসনের প্রয়োজনেই সুবা, পরগণা, গ্রাম এইসব প্রশাসনিক বিভাগ সৃষ্টি করে স্থানীয় শাসনে এক গতি আনার চেষ্টা হয়। সুলতানী যুগে বাংলাদেশে (বঙ্গালহ) রাজস্বের ভিত্তিতে আঞ্চলিক ও স্থানীয় বিভাগ (মহল, শিক) প্রভৃতি সৃষ্টি হয়েছিল। শিকদার নামক রাজকর্মচারী স্থানীয় ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিলেন। খাজনা ব্যবস্থা (খরজ) চালু ছিল। হাটকর, ঘাটকর, পথকর ইত্যাদি আদায় হত। শেরশাহের আমলে বাংলাদেশে শাসন পদ্ধতির সংস্কার হয়েছিল। সমগ্র রাজ্যকে ১১৬০০ পরগণায় ভাগ করা হয়েছিল এবং প্রতিটি পরগণায় দায়িত্বে ছিলেন পাঁচজন কর্মচারী। মুঘল আমলের প্রথম দিকে যখন এদেশে রাজা শাসন দৃঢ় রূপ পায় নি, তখনই সৃষ্টি হয়েছিল জমিদারী ব্যবস্থা। আকবরের আমলে এই জমিদারী যথেচ্ছ শাসন বন্ধ হয় এবং বাংলাদেশে নতুন ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা চালু হয়। স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে নতুন শাসনতান্ত্রিক বিভাগের ব্যবস্থা কার্যকর হল এবং স্থানীয় শাসনে সুবাদার, দেওয়ান, ফৌজদার, কোতোয়াল ইত্যাদি কর্মচারীরা গুরুত্ব পেলেন। এই পর্বেই ঢাকা ছিল সুবে বাংলার রাজধানী। মারাঠা যুগে পঞ্চায়েত তার আদিম চরিত্র নিয়েও জনপ্রিয় ছিল। শায়েস্তা খানের সুবাদারী আমলে বাংলাদেশে প্রজা শোষণের এবং অর্থ আদায়ের যে ঘৃণ্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রভাব পড়েছিল বিশেষভাবে গ্রাম বাংলায়। মুঘল যুগের শেষ পর্বে শাসন প্রণালীর যে অবনতি হয়েছিল তার প্রভাব পড়েছিল বাংলার গ্রামেগঞ্জে। কলকাতা, চন্দননগর, চুঁচুড়ায় ইংরেজ বাণিজ্য কুটীর পত্তন হল। বাংলার ইতিহাসে বিশেষতঃ স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। সুবাদারী, জমিদারী আর কোম্পানীর দিওয়ানী এই তিন ব্যবস্থার জালে পরে গ্রাম বাংলার স্থানীয় শাসনে এল নবরূপ।

ব্রিটিশপূর্ব ভারতবর্ষে গ্রাম শাসনের ধারাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন চার্লস মেটক্যাফ (Charles Metcalfe)। মেটক্যাফ লিখেছেন, ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রের মত গ্রামগুলি বিরাজ করত। জীবনধারনের জন্য যা প্রয়োজন তার সব কিছুই প্রায় তারা নিজেরাই সংগ্রহ করত। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের তেমন কোন প্রয়োজন তাদের ছিল না। যেখানে কোন কিছুই টিকে থাকে না। সেখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম একরকম নিজের জোরেই টিকে ছিল। একের

পর এক রাজবংশ এসেছে এবং গেছে, এক বিপ্লবের পর এসেছে আর এক বিপ্লব, হিন্দু, পাঠান, মোঘল, মারাঠা, শিখ, ইংরেজ সবাই একের পর এক প্রভুত্ব করেছে, কিন্তু গ্রামীণ সমাজ মূলত একই রকম থেকে গেছে। এই গ্রামের সমষ্টি, প্রত্যেকেই যাঁরা নিজেরাই একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মত, বিপ্লবে ও পরিবর্তনের যারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তারাই ভারতবাসীর সংরক্ষণে, তাদের সুখ স্বাধীনতায় বিশেষ অবদান রেখেছে (মেটক্যাফের বিবরণের জন্য A. R. Desai, Social Background of Indian Nationalism (1980) ৭—৮ পৃষ্ঠা দেখুন।) এই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামে কৃষিই ছিল প্রধান জীবিকা আর কৃষকই ছিল জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ। জমির উপর কোন ব্যক্তি মালিকানা ছিল না, ছিল গ্রাম সমাজের প্রথাগত অধিকার। গ্রামের অত্যাবশ্যকীয় কাজ (উৎপাদন, পৌরকাজ ও প্রতিরক্ষা) কৃষকরাই সম্পন্ন করত সহযোগিতার ভিত্তিতে। উৎপন্ন দ্রব্যের একটি অংশ ছাড়া (যা ছিল রাষ্ট্র বা শাসকের প্রাপ্য) সবই ভোগ করত কৃষক ও অকৃষক জনসাধারণ। জমির উপর বা গ্রামের উপর অধিকার অর্জনের কোন লড়াই ছিল না। গ্রাম পঞ্চায়েতই ছিল গ্রামের প্রতিনিধিমূলক সংগঠন। গ্রামের যাবতীয় কাজের তদারকী করা, বিধিব্যবস্থা আরোপ করা, জমির বিলিবন্টন ছিল ওর কাজ। গ্রামের মানুষের সাধারণ স্বার্থ সংক্রান্ত সব কাজেই এগিয়ে আসত পঞ্চায়েত।

তবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এই গ্রাম সমাজের আর্থ-সমাজিক, সাংস্কৃতিক সব অর্থেই সীমাবদ্ধ ও পশ্চাৎপদ ছিল। উৎপাদন ও উপভোগ বৈচিত্র ছিল না উৎপাদন কাঠামো ছিল আদিম ও অপরিণত। গ্রাম সমাজের সামাজিক মর্যাদাও তেমন ছিল না। বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, জাতপাত, সংকীর্ণ পারিবারিক আয় গ্রাম সম্প্রদায়ের মতাদর্শে আবদ্ধ এই সমাজ ছিল গতিহীন। কার্ল মার্কস এই অনড, অপরিবর্তনীয় গ্রাম সমাজের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন (Karl Marx : On India)।

ব্রিটিশ শাসক স্বয়ংসম্পূর্ণ অথচ বিচ্ছিন্ন, আদিম, অপরিণত গ্রাম সমাজকেই নিজেদের দেশের অভিজ্ঞতায় স্বায়ত্তশাসনের একটি প্রকৃত, আধুনিক দায়িত্বশীল ব্যবস্থায় রূপ দিতে চেয়েছে। তবে, নিজেদের কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুবিধা ও স্বার্থেই আইনগত ও শাসনতান্ত্রিক অখণ্ডতাকে বজায় রেখেই, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রশাসন ও শোষণের বৃহত্তর লক্ষ্যেই প্রচলিত গ্রামীণ বাবস্থা ও সংগঠনকে আইনগত ও প্রশাসনিক রূপদানের ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছে ব্রিটিশ সরকার। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না হলেও, কোম্পানী আমলের শেষের দিকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই ভারতে গ্রামীণ শাসনে আইনী সংস্কার ও মর্যাদা স্থাপনের চেষ্টা শুরু হয়।

৫.৫.৩ ব্রিটিশ ভারতে গ্রাম শাসনের রূপ

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজে গভর্নর কাউন্সিলের (Governor's Council) মাধ্যমে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের অধিকার পেলেও বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেলেও স্থানীয় শাসন বা গ্রাম শাসনের ব্যাপারে তেমন কোন দৃষ্টি দেয় নি। স্থানীয় শাসক বা জমিদারদের সঞ্চিত সম্পদ বা স্থানীয় রাজস্ব, আত্মসাৎ করা বা সম্পদ ও পুঁজি নিজ দেশে চালান দেওয়াই ছিল এর একমাত্র লক্ষ্য। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজের ধ্বংসের কাজও শুরু হয়ে গেল কোম্পানীর শাসনকালেই। গ্রামসমাজের ঐতিহ্যগত সংগঠন পঞ্চায়েত লুপ্ত না হলেও পঞ্চায়েতকে পরিণত করা হল কোম্পানীর তাবেদারী আর খবরদাবির কাজে। নতুন শাসক গোষ্ঠীর ক্ষমতার চাপে রায়তদের এতকালের গোষ্ঠীগত অধিকার নষ্ট হল, গ্রামের কৃষিজমি আর বনভূমি পরিণত হল ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে। পুরোনো সহযোগিতামূলক সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কের স্থান নিল ব্যক্তিগত একচেটিয়া সম্পত্তি আর ব্যবসায়িক স্বার্থ উদ্ভব প্রতিযোগিতামূলক

আর্থিক সম্পর্ক ও কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। ১৬০০ থেকে ১৭৭৩ এই দীর্ঘ সময়কাল ভারতে কোম্পানীর একচ্ছত্র বৃদ্ধির ইতিহাস। ভারতে কোম্পানীর শাসন ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিকে শিথিল করছে এই আশংকায় ১৭৭৩ সালের পর থেকে একের পর এক নিয়ন্ত্রণ আইন (Regulating Act) এবং সনদ আইন (Charters, 1784, 1793-1853) এনে কোম্পানীর ক্ষমতার উপর সীমা টানা হয়েছে। এই পর্বে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নিছক একটি প্রশাসনিক শক্তির বেশি কিছু ছিল না। এই সময় থেকেই ব্রিটিশ রাজশক্তির সৌজন্যে ভারতে লিখিত ও নিয়মতান্ত্রিক শাসনের সূচনা হল। এবং পার্লামেন্টীয় শাসনের আবরণে শাসন সংস্কারের যে উদার ধারার সৃষ্টি হল স্থানীয় শাসনের বিকাশে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

ভারত শাসন ও স্থানীয় শাসন সম্পর্কে ব্রিটিশ মনোভাব যে বদলে যেতে শুরু করেছে উনিশ শতকের গোড়া থেকেই তা অনুভব করা গেল। বোম্বের গভর্ণর ওলফিল স্টোন (Mountstuart Eladhinstone) পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে এতকালের ভারতের গ্রাম শাসনের উদ্যোগ, একনিষ্ঠতা ও দায়বদ্ধতার প্রশংসা করলেন। ১৮১৯ সালে গভর্নর জেনারেলকে প্রদত্ত এক রিপোর্টে এনফিনষ্টোন সেই সময়ের ভারতবর্ষের গ্রাম শাসনও গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। শান্তিরক্ষা, খাজনা আদায়, ন্যায়বিচার, ভূমি বন্টন—এইসব কাজে গ্রামীণ ব্যবস্থাপনার উন্নত নজির ছিল বলে তিনি জানিয়েছেন। মাদ্রাজের গভর্নর টমাস মানরো (Thomas Munro) গ্রামের উপর পুলিশী নজরদারীর বিরোধিতা করলেন। গ্রাম সমাজের স্থায়ীত্ব ও স্বশাসনের প্রশংসা করেছেন চার্লস মেটক্যাফ। গ্রাম সমাজের পূর্ববর্তীকালের বিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করে গ্রাম শাসনে রাজস্ব, ভূমি প্রশাসন ও আদালত ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া হল ও প্রশাসনিক কর্মচারীর মাধ্যমে তদারকীয় ব্যবস্থা হল। স্থানীয় প্রশাসনকে এই পর্বে আরো উদার ও সক্রিয় করতে আনা হল নানা আইন। সংকলন (conservancy), স্থানীয় কমিটি গঠন, তহবিল সংগ্রহ, ভূমি রাজস্ব হিসাব পত্র, ভূমি সমীক্ষা—নানা কাজে গ্রামে নতুন গতি এল। একে একে লর্ড বেন্টিংক (Lord Bentinck), লর্ড লরেন্স (Lord Lawrence), লর্ড মেয়ো (Lord Mayo), লর্ড রিপন (Lord Ripon) স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংস্কার ও প্রস্তাব এনেছেন। আইনশৃঙ্খলা, পরিষেবা, কৃষি, সেচ, খাল সংস্কার গ্রামের উন্নয়নের নানা ক্ষেত্রে ও কাজে নতুন উৎসাহ এসেছে। চার্লস নেপিয়ার (Charles Napier), অ্যালেনরবো (Ellenbarough) প্রমুখেরা ইতিপূর্বেই জেলা প্রশাসনে বিভাজন, পুনর্গঠন এনেছেন। চৌকিদার, করদায়, কালেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি প্রশাসনিক কর্মচারীর মাধ্যমে গ্রাম পরিচালনায় নতুন ধারা সৃষ্টি হয়েছে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ, ১৮৫৮ সালে কোম্পানীর হাত থেকে ব্রিটিশ রাজশক্তির হাতে ক্ষমতা অর্পনের জন্য রানীর সুপারিশ (Queen's Proclamation) স্বাধীনতা ও স্বরাজের দাবিতে ভারতের জাতীয়তাবাদী প্রবক্তাদের আন্দোলন সব কিছুই কম-বেশি এই পর্বে ভারতে স্থানীয় শাসনের বিকাশে সহায়ক ঘটনা বা শক্তি হিসাবেও বিবেচিত হতে পারে এই পর্বে ১৮৬১ ও ১৮৯২ সালের পরিষদীয় আইন (Indian Council's Act, 1861, 1892) অবশ্য ভারতে স্থানীয় শাসনের বিকাশের ধারাকে বিশেষভাবে রুদ্ধ করেছে। ব্রিটিশ রাজের প্রশাসনিক কেন্দ্রিকতা ও ঔপনিবেশিক নীতির জালে জড়িয়ে পড়েছে এতকালের গ্রামীণ শাসন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি যতই দৃঢ় হয়েছে ততই গৌণ হয়ে পড়েছে প্রাচীন গ্রামীণ প্রজাতন্ত্রগুলি। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের অর্থনীতি, গ্রামীণ শিল্প, গ্রামের লোক সমাজ তাঁর আপন মূল্য হারিয়েছে।

> প্রান্তলিপি : ১৮৬৪ সালে চার্লস মেয়োর প্রস্তাব ও ১৮৭২ সালে লর্ড রিপনের প্রস্তাব ভারতে স্থানীয় শাসন ও গ্রাম শাসনের ভিত্তি বলে চিহ্নিত হয়। ১৮৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত চৌকিদারী পঞ্চায়েত ভারতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সর্বপ্রথম আইনী রূপ। ১৮৬৩ সালে শিক্ষা আইন ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইনও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আইনী অগ্রগতি বলে চিহ্নিত।

ঊনবিংশ শতকের আইনগুলি বা মেঘো ও বিপনের প্রস্তাব স্থানীয় সামন্তশাসন বা গ্রাম শাসনের বিকাশে উল্লেখযোগ্য নির্ধারক হলেও ব্রিটিশ শাসনকালে জাতীয় আন্দোলনের প্রসার, আন্দোলনের মঞ্চ হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসের আবির্ভাব স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অনুকূল প্রভাব ফেলে। সন্দেহ নেই জাতীয় আন্দোলনের প্রসার, ও স্বরাজের দাবির পটভূমিতেই ব্রিটিশ সরকার বিংশ শতকের প্রথম তিন দশকে পঞ্চায়েত বোর্ড (Panchayat Board), তালুক বোর্ড (Taluka Board), জেলা বোর্ড (Zilla Board) ইত্যাদি গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সৃষ্টি করে গ্রামের ত্রাণ, রাস্তাঘাট, পানীয় জল, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, কর আদায়, প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদির দায়িত্ব অর্পণ করে এইসব সংস্থার হাতে। ১৯০৯ সালে বিকেন্দ্রিকরণ কমিশনের (যা Royal Commission নামে পরিচিত) রিপোর্ট ১৯১৯ ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বিশেষ গুরুত্ব পায় এবং আইনী স্বীকৃতি লাভ করে। বিকেন্দ্রিকরন কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতেই ১৯১৯ সালে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে স্বায়ত্তশাসনকে রাজ্য তালিকায় এনে হস্তান্তরিত বিষয় (Transferred item) হিসাবে গণ্য করা হয়। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে দায়িত্বশীল সরকার ও প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের নীতি গ্রহণ করার সাথে সাথে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে এদেশের অনন্য এক্তিয়ার (Absolute purisadiction) বলে গণ্য করা হয়।

স্থানীয় শাসন ও গ্রাম শাসনের প্রশ্নে এই সময় বিশেষ কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেন মহাত্মা গান্ধী ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।

৫.৬ গ্রামীণ শাসন বিষয়ে গান্ধীজির প্রকল্প

ব্রিটিশ শাসনকালেই গ্রাম স্বরাজ ও গ্রাম শাসন বিষয়ে অত্যন্ত কৌতুহলপ্রদ ধারণা পেশ করেন গান্ধীজি। রাষ্ট্রশাসন নয়, গান্ধীজির চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছে স্বরাজ ও সমাজ সংগঠনের এক বলিষ্ঠ ভাবনা। কোন রাষ্ট্রতত্ত্ব নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে গান্ধীজি বুঝেছেন গ্রামের সহজ, সরল মানুষগুলিকে সংগঠিত করা, কর্ম ও সেবার কর্মযজ্ঞ তাদের উৎসাহিত করা, সমষ্টি উন্নয়ন ও সমবায়ের আদর্শে তাদের শক্তিকে নিয়োজিত করাই হল স্বরাজের আসল কথা। স্বরাজের অর্থ শাসন বা নিয়ন্ত্রণ নয়, আত্মশাসন ও স্বনিয়ন্ত্রণ। হেনরী থবোর (Henry Thorough) আদর্শে রাজা বা রাজ্যের ধারণা বা রাজনৈতিক ধারণাকে বর্জন করে তিনি গ্রহণ করেছেন সেই আলোকিত নৈরাজ্য (Enlightened anarchy) যেখানে থাকবে আত্মশক্তি, বিশ্বাস দায়িত্ববোধ আর পারস্পরিক নির্ভরশীলতার এক স্ব-আরোপিত ব্যবস্থা। টলস্টয়ের (Tolastoy) গ্রাম সংগঠনের, স্বশাসিত সংঘজীবনের ধারণাকে ভারতবর্ষের গ্রাম সংগঠনের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন তিনি। একই সঙ্গে গ্রহণ করেছেন জন রাস্কিনের (John Ruskin) সর্বোদয়ের ভাবনা যার অর্থ হল সমাজ গঠনের গঠনমূলক কার্যক্রম (Constructive Programme)। গান্ধীজি যে গ্রাম স্বরাজের আদর্শকে উপস্থিত করেছেন তার বিভিন্ন দিকগুলি হল (১) রাষ্ট্রকর্তৃত্বে অর্থনৈতিক কাঠামো পরিচালিত হবে না, জনসাধারণের স্বেচ্ছা-অংশগ্রহণ আর সংগঠনেই চলবে ওই গ্রাম গঠনের কাজ। (২) স্বায়ত্তশাসনের সাংবিধানিক নীতি বা কোন রাজনীতি ও শাসননীতি নয় গ্রাম সমাজ হবে কর্মযোগ, সমাজ চেতনা, স্বাবলম্বন আর জনশক্তির উপর নির্ভরশীল, এক সমাজ রূপ। (৩) এখানে কোন বিভেদ নেই, দারিদ্র নেই আলস্য নেই, আছে সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা। দায়িত্বশীল, সংগঠনকুশল সমাজকর্মীই হবে গ্রামে সর্বোদয়ের মূল শক্তি, দল বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়। গ্রাম স্বরাজ হল গ্রামের মানুষের মধ্যে সমাজমুখী আদর্শ অর্থাৎ ন্যায়, সেবা আর সহযোগিতার আদর্শকে ছড়িয়ে দেওয়া। (৪) শিল্প নয়, পুঁজি বা শ্রমের লড়াই নয়, উৎপাদন ও বন্টন, আর্থিক সমতা, সরল সমষ্টিজীবনেই (খাদি, চরকা, কুটীর শিল্প) আছে সমাজ উন্নয়নের স্বনির্ভর, সৃজনশীল রূপ। গান্ধীজির গ্রাম স্বরাজের মূল কথা আত্মনির্ভরশীল, বিকেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রসার ঘটিয়ে দারিদ্র দূরীকরণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।

গান্ধীজি বলেছেন, পরিকল্পনা শুরু করতে হবে গ্রাম থেকে। সংগঠিত গ্রাম সমাজই নেবে জনশিক্ষা ও অন্যান্য কাজকর্মের দায়িত্ব। গ্রাম গড়ার জন্য যে গঠনমূলক কার্যক্রম সেই কার্যক্রমকে রূপায়িত করার দায়িত্ব নেবে গ্রাম নিয়ে সংগঠিত গ্রাম সমিতি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জমি বন্টন সব কাজেই দায়িত্ব নেবে গ্রাম সমিতি। গ্রামে গ্রামে জাতীয় সেবার কাজ ছড়িয়ে দিতে হবে। গ্রাম সমাজ (গ্রাম স্বরাজ) হল লক্ষ্য আর এই লক্ষ্য পরিপূরণের পন্থা হল গঠনমূলক কার্যক্রম। গঠনমূলক কার্যক্রমের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে স্বরাজ। গান্ধীজির কথায়, স্বরাজ কখনও কোন এক সকালে স্বর্গ থেকে নেবে আসবে না। স্বরাজ উঠবে প্রতিটি ইট গাঁথার মত সমষ্টিগত কার্যক্রমের মাধ্যমে, গান্ধীজির গঠনমূলক কার্যক্রমে আছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, অস্পৃশ্যতা বর্জন, গ্রামবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় অবসরের ব্যবস্থা, খাদি উৎপাদন কেন্দ্র গড়া, গ্রামীণ শিল্প, স্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, পরিবেশ রক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতার বিকাশ, কৃষকের অধিকার রক্ষা, শ্রম সংগঠন, আদিবাসীর উন্নয়ন, ছাত্র সেবা সংগঠন, গৃহপালিত জন্তুর সুরক্ষা ইত্যাদি নানা কার্যক্রম। সন্দেহ নেই গান্ধীজির এই কার্যক্রমের মধ্য দিয়েই বাস্তু, দল ইত্যাদির অবসান ঘটে গ্রামে আসবে আইন-বহির্ভূত ও স্বতঃস্ফূর্ত সমাজ সংগঠন।

গান্ধীজি গ্রাম স্বরাজ বলতে সোজা কথায় যা বুঝেছেন তা হল, (১) এটি এক পরিপূর্ণ প্রজাতন্ত্র, যা তার প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, (২) তবে এর অর্থ এই নয় গ্রামগুলির মধ্যে কোন পারস্পরিক নির্ভরশীলতা নেই। গ্রামের প্রথম কাজ হল নিজের খাদ্য নিজে উৎপাদন, নিজের পরিবেশ নিজে তৈরী করা, নিজের কিছু মূল সংস্থানের ব্যবস্থাও সংরক্ষণ। এর পর প্রয়োজনমত অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রাম সুযোগ সুবিধা থাকলে নিজেই বাড়বে এবং ক্ষেত্র বিশেষে অন্যগ্রামের সাহায্য ও সহায়তা নেবে। গ্রামে কাজের ভিত্তি হবে সমবায়িক। গ্রামে নির্বাচিত পাঁচজনের পঞ্চায়েত সব কাজে নেতৃত্ব দেবে। পঞ্চায়েত হবে একই সঙ্গে আইনসভা, শাসন বিভাগ ও বিচার সংস্থা। অহিংসা, সত্যাগ্রহ, অসহযোগ হয়ে গ্রামের মানুষের (গ্রাম সমাজের) আচরণের পন্থা। গান্ধীজির এই আদর্শ গ্রাম সমাজের মধ্যেই আছে বিকেন্দ্রিকরণের মূল ধারণা। কেন্দ্রিকরণকে তিনি সমাজের অহিংস, নৈতিক কাঠামোর বিরোধী মনে করেছেন। তিনি জানেন, কেন্দ্রীকতাকে বজায় রাখতে হলে চাই পর্যাপ্ত শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা। কিন্তু শক্তি প্রয়োগের এই ব্যবস্থা গান্ধীর নৈতিক সমাজ ও গ্রাম স্বরাজের আদর্শের পরিপন্থী। যে রাজনীতি ও অর্থনীতি নৈতিক মূল্যকে অবহেলা বা অবজ্ঞা করে সেই রাজনীতি বা অর্থনীতি ভুল। গ্রাম সমাজ ও গ্রাম স্বরাজের মধ্যে আছে প্রকৃত নৈতিক অর্থনীতি যেখানে ব্যক্তি স্বার্থ নয়, বিভেদ নয় আছে আর্থিক সমতা ও ন্যায়। গান্ধীজির এই সমাজে মানুষ ভোগী হবে না, লোভী হবে না অনুসরণ করবে চারটি নৈতিক আদর্শ: নির্লোভতা, অপরিগ্রহ, শরীর শ্রমের মর্যাদা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ। গান্ধীজি যে বিকেন্দ্রীক পল্লীসমাজ ও গ্রাম স্বরাজের কথা বলেছেন তা হল একটি বিরাট পরিবারের মত যেখানে প্রত্যেকেই হবে প্রত্যেকের সুখ দুঃখের অংশীদার, যেখানে পরস্পরের পরিচয়ই নেই সেখানে এই ব্যবস্থা সম্ভব নয়। সেজন্যই গান্ধীজি বলেছেন ক্ষুদ্র, বিকেন্দ্রিক সমাজের কথা। এই সমাজে পুঁজির আশ্রমে শিল্প সৃষ্টি হবে না (কারণ এর ফলেই মুনাফা, ধনবৈষম্য সৃষ্টি হয়), শ্রমের আশ্রমে উৎপাদন হবে। এই সমাজে কোন ব্যবস্থাপক, সুবিধাভোগী শ্রেণী থাকবে না, ব্যক্তি মালিকানা থাকবে না। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বা কারখানার সামাজীকরণ বা জাতীয়করনের চূড়ান্ত বিরোধী তিনি ছিলেন না। তবে গান্ধীজি চেয়েছেন লাভের জন্য নয় ভালবাসার প্রেরণা ও মানবতার কল্যাণেই মানুষ কাজ করবে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি অছিবাদের (Trusteeship) কথা বলেছেন। মানুষের দেহের ও বুদ্ধির শক্তিতে প্রকৃতিগত বিভেদ থাকতেই পারে। মানুষ তো জড় পদার্থ নয় যে তাকে গড়ে পিটে সমান করা যাবে। প্রকৃতিগত অসাম্যের কথা মনে রেখেই প্রত্যেকে সাধ্যমত কাজ করবে এবং প্রয়োজনমত গ্রহণ করবে। যোগ্যতা বেশি হলেই মানুষ নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে তাকে ব্যবহার করবে না। সমাজের কল্যানের জন্যই সে কাজ করবে। গান্ধীজি এক কথায় অছিবাদের যে নীতিকে তুলে ধরেছেন তা হল: আমার কাছে যে সম্পদ আছে তা আমার ভোগের জন্য নয়, ঐ

সম্পদ সমাজের, আমার কাছে গচ্ছিত আছে মাত্র। গান্ধীজি পুঁজিপতিদের সমাজের অছি করেছেন এবং তাদের হৃদয়ের কাছে আবেদন রেখেছেন। রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া অপেক্ষা অছিবাদের বোধকেই তিনি পছন্দ করেছেন বেশী। গ্রাম সমাজেও অছিবাদের এই নীতি সমানভাবে প্রযোজ্য। গ্রামের গরীব মানুষের মধ্যে জ্ঞান ও সংঘবদ্ধতা সৃষ্টির আহ্বান করেছেন তিনি। গ্রাম স্বরাজের সাফল্যের এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ পথ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশের দশক থেকেই গান্ধীজি গ্রাম স্বরাজ সম্পর্কে তাঁর ভাবনাচিন্তা প্রকাশ করেছেন 'হরিজন' পত্রিকায় এই ভাবনা পরিণতি লাভ করেছে চল্লিশের দশকে। ১৯৪২ সালের ২৬ জুলাই গ্রাম স্বরাজ সম্পর্কে, পঞ্চায়েত সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সুদৃঢ়ভাবে প্রকাশিত হয় 'হরিজন' পত্রিকায়। এই পর্বেই তিনি ঘোষণা করেন ভবিষ্যৎ ভারতীয় সমাজ কী রূপ নেবে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা তাঁর পক্ষে করা সম্ভব নয়। তবে গ্রাম স্বরাজ, 'গঠনমূলক কার্যক্রম' 'অছিবাদ' সম্পর্কিত ভাবনাগুলি জাতীয় কংগ্রেসের কাজকর্মে প্রতিফলিত হবে ও আশা তিনি করেছেন। এমনকি তার, শেষ উইল ও বাণীতে (Last will and Testament) তিনি এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন। কংগ্রেস ক্রমশ একটি জনসেবকদল (Lok Sevak Sangha) হিসাবে দেশের সাত লক্ষ গ্রামের সামাজিক, নৈতিক এবং আর্থিক স্বাধীনতা ও স্বশাসনের লক্ষ্যে কাজ করে যাবে। তবে ইতিপূর্বেই গান্ধীজি গ্রাম স্বরাজ ও সর্বোদয়ের আদর্শকে প্রচার করার জন্য কংগ্রেসকে মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে নির্বাচনে জয়লাভ করে জাতীয় কংগ্রেস এই সময় সাতটি প্রদেশের কার্যভার গ্রহণ করে এবং গ্রামীণ উন্নয়ন ও সংস্কারের কাজে গান্ধীজির গঠনমূলক কার্যক্রমের ধারণাকে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়। কৃষি সংস্কার, বাজেয়াপ্ত জমির প্রত্যর্পন, জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, স্বাস্থ্য, কুটীর শিল্পের প্রসারে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা বিশেষ দায়িত্ব পালন করে।

প্রান্তলিপি : গান্ধীজির গ্রাম সমাজ, গ্রাম স্বরাজ বা স্বশাসনের আদর্শ অবশ্য কংগ্রেস সংগঠনে সকলে গ্রহণ করতে পারে নি। গান্ধীজির সঙ্গে এ বিষয়ে প্রবল মত পার্থক্য ছিল মতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের তাঁরা স্বরাজ্য পার্টি গড়ে এবং স্বায়ত্তশাসন ও স্থানীয় শাসনের জন্য নির্বাচনের দাবি জানিয়ে গান্ধীজির বিরুদ্ধে সরব হলেন। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির চরকা ও খাদির ভাবনাকে মেনে নিতে পারেন নি। সুভাষ চন্দ্র বসু, সমাজবাদী দল ও কমিউনিষ্ট পার্টি ও গান্ধীজির চিন্তার বিরোধিতা করেছেন। জওহরলাল অবলম্বন করতে চাইলেও গ্রামীণ সংস্কারের প্রশ্নে মানসিকভাবে তিনি সমাজতন্ত্রের পথেই ঝুঁকেছিলেন।

পরবর্তীকালের ঘটনা অবশ্য অন্যদিকে মোড় নেয়। ৪০ এর দশকে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে স্থানীয় প্রশাসন ও আইনের কাজে তেমনভাবে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি। কংগ্রেস দলও এই সময় নানা ঘটনার চাপে এবং পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আন্দোলন ও সংগঠনের প্রশ্ন নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, কংগ্রেস সংগঠনে নেতৃত্বের বিরোধ, গণপরিষদের দাবি, শাসন সংস্কারের প্রশ্নে ব্রিটিশ শাসক আর জাতীয় নেতৃবর্গের দরাদরি—সমস্ত ঘটনাই গ্রামস্বরাজ ও গ্রাম সংগঠনের মূল প্রশ্ন থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে এবং স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্ম হয়। স্বাধীন ভারতে স্বায়ত্তশাসন আর গ্রামীণ শাসন ও সংস্কার বিষয়ে আইন প্রণয়ন নীতি নির্ধারণ আর নীতিকে কার্যকর করার দায়িত্ব এসে পড়ে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে গঠিত সরকারের হাতে। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে গণপরিষদে বিতর্ক হয়েছে। প্রাথমিকভাবে কংগ্রেস শাসিত সরকার এক্ষেত্রে তেমন উৎসাহ ব্যঞ্জক প্রচেষ্টা দেখাতে পারে নি একথা সত্য তবে পরবর্তীকালে এক্ষেত্রে সরকারের তরফে গঠনমূলক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

পরবর্তী অংশগুলির আলোচনায় গ্রাম শাসন বিষয়ে গণপরিষদের বিতর্ক এবং স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রাম শাসনের ধারা কী ছিল এবং স্বাধীন দেশের সরকার এক্ষেত্রে সাংগঠনিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক বা সাংবিধানিক দায়িত্ব কিভাবে পালন করেছে সে বিষয়ে শিক্ষার্থী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

৫.৭ গ্রাম শাসন বিষয়ে গণপরিষদের বিতর্ক

স্বাধীন ভারতে একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কর্মতৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছিল, তিন বছর আগে থেকেই। তিন বছর দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা, বিতর্ক খসড়া প্রস্তাব, তার বিন্যাস ও পুনর্বিন্যাসের মধ্য দিয়ে অবশেষে গণপরিষদ স্বাধীন জাতির জন্য এক গণতান্ত্রিক সংবিধানকে রূপ দিয়েছে। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী ওই সংবিধান চালু হল। গণতান্ত্রিক সংবিধান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও স্বাধীন ভারতের এই সংবিধানে স্থানীয় শাসন বা গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসনের বিষয়টি সাংবিধানিকভাবে তেমন মর্যাদা পায় নি। গান্ধীজি পঞ্চায়েতকে আরো বেশী ক্ষমতা দেবার বা পঞ্চায়েতকে নবজন্ম দেবার আশা ব্যক্ত করলেও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রাম স্বরাজের আদর্শকে রূপ দেবার, দেশের অর্থনীতিকে সংগঠিত করবার ইচ্ছা পোষণ করলেও, সংবিধান প্রণেতাদের এ ব্যাপারে, তেমন কোন সদিচ্ছা বা উদ্যোগ ছিল না। সংবিধান খসড়া কমিটির সভাপতি ড. বি. আর আম্বেদকর (B. R. Ambedkar) স্থানীয় শাসন বা গ্রাম শাসনের প্রশ্নকে বরাবরই উপেক্ষা করেছেন, গ্রাম স্বরাজের চেয়ে জাতীয় সংহতি ও কেন্দ্রপ্রবণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিই তাঁর আস্থা ছিল বেশী। সংবিধান খসড়া কমিটির অন্যান্য সদস্যরাও এ ব্যাপারে বিস্ময়জনকভাবে নীরবতা পালন করেছেন। লক্ষ্যণীয় সংবিধান রচনার কাজে সাহায্য করার জন্য বা সংবিধানগত সমস্যা নিয়ে গণপরিষদকে পরামর্শ দেবার জন্য যে সব কমিটি বা উপ-কমিটি (Sub-committee) গড়া হয়েছে তার মধ্যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক কোন কমিটি ছিল না। সম্ভবত কেন্দ্রীয় সংবিধান কমিটি (Union Constitution Committee) বা, প্রাদেশিক সংবিধান কমিটির (Crovincial Constitution Committee) বাইরে এ বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ে পরামর্শ নেবার কথা ভাবা হয় নি। সংবিধান রচনার কাজে যাঁরা নিযুক্ত ছিলেন বা এ বিষয়ে যে সমস্ত বিশেষজ্ঞের পরামর্শ বা মতামত গ্রহণ করা, হয়েছে তাঁদের অধিকাংশই শহুরে এবং বিত্তশালীয় মানসিকতা পুষ্ট বলে কোন কোন মহলে অভিযোগ করা হয়। ব্যবসায়িক, রক্ষণশালী, অনমনীয় আইনী মতবাদপুষ্ট, প্রভাবশীল ও প্রভুত্ববাদী দলীয় ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত গণপরিষদ গ্রামের মানুষের ইচ্ছা, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের ভাবনাকে গুরুত্ব দিতে রাজী ছিলেন না। গান্ধীজি নিজেই জানিয়েছেন, গণপরিষদের কার্যবিবরণী (Croceedings) তাঁর বোধগম্য হয় নি।

যে ঘোষণা, সংকল্প, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, অঙ্গীকার জওহরলাল নেহরু গণপরিষদের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব (Objective Resolution) হিসাবে পেশ করেছিলেন বা যে সংবিধান দেশের মানুষের অভাব মেটাবে, তাদের আত্মবিকাশের সুযোগ এনে দেবে বলে নেহরু আবেগের ভাষায় বলেছিলেন পঞ্চায়েত বা স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে উপেক্ষা তার প্রকৃত কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করে। তবে পঞ্চায়েত নিয়ে গণপরিষদে বিতর্ক হয়েছে, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এ ব্যাপারে সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শদাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, পরবর্তীকালে এ বিষয়ে গণপরিষদের কোন কোন সদস্য সংশোধনী এনেছেন এবং সংবিধানের ৪০ ধারায় বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্যই বিষয়টি এসেছে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ও কার্যকরী ব্যবস্থা নেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারগুলিকে।

৫.৮ স্বাধীন ভারতে গ্রাম শাসনের রূপ

স্বাধীন ভারতে গ্রাম শাসনের প্রসঙ্গে, প্রথমেই সংবিধানের কথা দিয়ে শুরু করতে হয়। এ বিষয়ে আগেই বলা হয়েছে সংবিধানে পঞ্চায়েত প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র, এর বেশী কিছু নয়। এ বিষয়ে যতটুকু বলা হয়েছে

তা বলা হয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি পর্যায়ে (Directive Principles of State Policy, Part IV of the Indian Constitution) নির্দেশমূলক নীতির অনেকটা জুড়েই গান্ধীজির গ্রামসমাজের আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে বলে কোন কোন মহলে বলা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত সংগঠনের সাথে সাথে সামাজিক-আর্থিক-রাজনৈতিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, পর্যাপ্ত জীবিকার অধিকার, সম্পদের মালিকানা নিয়ন্ত্রণ, কর্মশিক্ষার সুযোগ, শিশুদের জন্য যোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি, কুটীর শিল্পের প্রসার, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি ও পশুপালন ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব নেবার কথা বলা হয়েছে। এই ধারণাগুলির মধ্যে সমাজ সংস্কারের আদর্শ, সমাজ বিপ্লবের বাণী বা গান্ধীজির আদর্শকে গ্রহণ করার ইচ্ছা থাকলেও এই সব কথার সুনিশ্চিত কার্যকারিতা নেই, কারণ নীতিগুলি, আদালতে বিচার্য নয়। পঞ্চায়েত বা গ্রাম সংগঠনের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে এতটা অবহেলার চোখে দেখানোর বিষয়টি অনেকেই ভালভাবে নেন নি। পঞ্চায়েত সংগঠনে সংবিধানগত ভাবে রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব থাকলো না, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রসারে কেন্দ্রীয়ভাবে কোন আইনী দায়িত্ব ও নীতিবিত্ত উল্লেখ করা হল না। শুধুমাত্র শাসনতান্ত্রিক হিতোপদেশ হিসাবেই এল পঞ্চায়েত সংগঠনের কথা। সংবিধানের ৪০ ধারায় বলা হল: "রাষ্ট্র গ্রাম-পঞ্চায়েত সংগঠনের ব্যবস্থা করবে এবং ওই পঞ্চায়েতগুলির হাতে এমন ক্ষমতা অর্পণ করবে যাতে এগুলি স্বায়ত্তশাসনের এক একটি কেন্দ্র হিসাবে কাজ করতে পারে"।
(The State shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government)।

স্বাধীন ভারতে গ্রামশাসন ও সংগঠন প্রসঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিবর্তনে তাকে অবশ্যই এক একটি ধাপ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়ঃ

প্রান্তলিপি ঃ স্যার আইভর জেনিংস (Ivor Jennings) নির্দেশমূলক নীতিগুলির আইনী কার্যকারিতার অভাব লক্ষ্য করে এগুলিকে 'Pious aspiration' অর্থাৎ হিতোপদেশ হিসাবে চিহ্নিত করেন। সংবিধান বিশেষজ্ঞ বি. এন. রাউ (B.N.Rau) রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে এগুলি নৈতিক আদেশ, (moral precept) হিসাবেই গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন। আম্বেদকর নীতিগুলির মধ্যে দেখেছেন অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিফলন। গ্র্যানভিল অস্টিন (G. Austin) এর মধ্যে দেখেছেন সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্য (goals of social revolution)।

৫.৮.১ প্রথম ধাপ : ১৯৪৮-১৯৫৬

এই পর্বে গ্রামীণ সংগঠন বিষয়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তবে জাতীয়তাবাদী নেতাদের কাছে ভূমি সংস্কার গ্রামের অগ্রগতির একটি লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে গঠিত অর্থনৈতিক নীতি বিষয়ক কমিটি কৃষি ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য সুপারিশ করে। ইতিপূর্বে জে. পি. কুমারাপ্পার (J. P. Kumarappa) নেতৃত্বে যে কৃষি সংস্কার কমিটি (Agrarian Reforms Committee) গঠন করা হয়েছে সেই কমিটি পরবর্তীকালে যে রিপোর্ট পেশ করেছে তাতে ভূমি সংস্কার, কৃষকের অধিকার আর অখণ্ড ভূমি প্রশাসন গড়ে তোলা—এই তিনটি উল্লেখযাগ্য সুপারিশ ছিল। এই সুপারিশের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যে ভূমি সংস্কারের উৎসাহ এলেও, আইনী ব্যবস্থা হলেও, কোন আইনই কার্যকর হয় নি।

১৯৫০ সাল থেকেই অবশ্য গ্রাম সংগঠনের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত উদ্যোগ নেওয়া হল। তবে পঞ্চায়েত নয়, গ্রামীণ উন্নয়ন প্রশ্নে গুরুত্ব পেল সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (Community Development Project)। এর সঙ্গে যুক্ত হল জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা (National Extension Services)। গান্ধীজি চেয়েছিলেন ঔপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোকে পরিত্যাগ করে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ঐতিহ্যকেই ফিরিয়ে আনা হোক নতুন ভাবে, কংগ্রেস সংগঠন হয়ে উঠুক গ্রামে গঠনমূলক কার্যক্রমের সংগঠন। গণপরিষদে গান্ধীজির ভাবনা গুরুত্ব পায় নি। সংবিধানের ৪০ ধারায় পঞ্চায়েতের কথা সংক্ষেপে ঘোষণা করেই গণপরিষদ তার দায়িত্ব সেরেছে। স্বাধীন ভারতে সরকার এক্ষেত্রে

প্রচলিত পশ্চিমী বা ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে অতিক্রম করে যেতে পারে নি। ব্রিটিশ শাসকের মতই জেলাস্তরে প্রশাসনিক ক্ষমতাকে পুঞ্জিভূত করাই ছিল ওর আশু লক্ষ্য। প্রতিনিধির মাধ্যমে জন অংশগ্রহণ—গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের এই মূল ভাবনা থেকে সরকার সরে এসেছে। বলা হয়েছে বটে, সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প পল্লী উন্নয়ন, গ্রাম সমাজের পুনর্গঠন সম্পর্কে গান্ধীজির চিন্তা-ভাবনারই প্রকাশ। ১৯৫২ সালে গান্ধীজির জন্ম দিবস ২ অক্টোবরেই প্রকল্পটির সূচনা হল পরিকল্পনা কমিশনের তদারকীতে। অথচ এই প্রকল্পে সাহায্য আর পৃষ্ঠপোষকতা এল মার্কিন সরকারের কাছ থেকে। এলাকা অনুসারে এক একটি প্রকল্পকে তিনটি প্রদেয় অধীনে এনে, প্রতিটি ব্লকের অধীনে ১০০টি গ্রামকে রাখা হল। কৃষি উৎপাদন পরিচালনা আর কৃষি উন্নয়নের সাথে সাথে কৃষকের স্বার্থে, কৃষি পরিবার ও নারীর স্বার্থে প্রশাসনকে পরিচালনা করার কথা ভাবা হল। ব্লক হল গ্রামীণ সংগঠনের নিম্নস্তর আর ব্লক অফিস হল প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের কেন্দ্র। জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে কৃষি গবেষণা এবং উৎপাদন কৌশল ও জ্ঞান সরবরাহের কাজ চলেছে।

সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প গান্ধীজির গঠনমূলক কর্মসূচীরই রূপায়ন সরকারীভাবে একথা বলা হলেও, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের মূল লক্ষ্য গ্রামের মানুষকে সরকারি কাজের সঙ্গে যুক্ত করা ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের ধারণাকে সফল করার কোন প্রচেষ্টা সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পে ছিল না। প্রকল্পের গ্রাম নির্বাচন ব্যবস্থাও সঠিকভাবে হয়নি। প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্লক অফিসের কাজকর্মে পল্লী উন্নয়ন ও সমাজসেবার চোখে আমলাতান্ত্রিক জাল-জটিলতাই ছিল বেশী। গ্রামে অর্থনৈতিক ক্ষমতায় কেন্দ্রীভবন রোধ করা যায় নি। গ্রামে সমষ্টি উন্নয়নও কল্যাণের স্বার্থে যে বিরাট কর্মযজ্ঞের ব্যবস্থা হওয়া উচিত সেটাও হয়নি। মার্কিন অভিজ্ঞতাপুষ্ট এই প্রকল্পকে তাত্ত্বিক প্রতারণা ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না। ধারণা ব্যর্থ কৌশল হিসাবেই একে বর্ণনা করা যেতে পারে। গ্রাম সমাজ বা পল্লী উন্নয়নের কর্মকাণ্ড তেমন না থাকলেও, প্রকল্পের ব্যয় আর অপব্যয় ছিল চোখে পড়ার মত।

একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংস্থা হিসাবে গ্রামীণ ভারতবর্ষে স্বাধীনতার প্রায় দশ বছর পরেও কোন স্ব-শাসিত ব্যবস্থার সূত্রপাত হয় নি। তবে এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির সূচনা হয় দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়কাল থেকে।

৫.৮.২ দ্বিতীয় ধাপ ঃ ১৯৫৭-১৯৭৬

১৯৫০-৫১ সালে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির বলেই হোক বা ভারতের পরিকল্পিত উন্নয়নের কারণেই হোক ভারতের প্রায় ৮৩ হাজার গ্রামে গ্রাম পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল এই সময় থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চায়েত কমিটিগুলি ধীরে হলেও কাজ করতে শুরু করেছে। কমিটি ১৯৫৪ সালের একটি রিপোর্টে স্বীকার করেছে গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের ভিত্তি গড়ে তুলতে সহায়ক। পঞ্চায়েত শুধুমাত্র একটি স্বায়ত্ত শাসনের স্থানীয় মাধ্যম নয়, গ্রামে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার এবং সমষ্টি জীবন প্রসারের এক প্রকৃত শক্তি। পৌর সামাজিক, আর্থিক, বিচার সংক্রান্ত সব কাজই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সম্ভব। ১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের এক সভায় নেহরু যে আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করলেন তাতে সমাজতান্ত্রিক এক সমাজ গড়ার বাসনা ব্যক্ত হল। ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশনে নেহরুর ভাবনা সমর্থিত হল। সন্দেহ নেই এই পর্ব থেকেই শুরু হল গ্রামীণ পুনর্গঠনের গঠনমূলক ভাবনা। প্রথম পরিকল্পনায় গ্রাম পঞ্চায়েতকে গ্রামের সম্পদ সৃষ্টি ও প্রসারের ব্যাপারে আইনগত দায়িত্বদানের কথা বলা হয়েছিল এবং উৎপাদন পরিকল্পনা, বাজেট প্রস্তুত, সরকারি সাহায্যের মাধ্যম হিসাবে কাজ করা, গ্রামে স্বেচ্ছাশ্রম সংগঠিত করা, জমি সমবায়িক পরিচালনা ভূমি সংস্কার ইত্যাদি কাজে পঞ্চায়েত দায়িত্ব নেবে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণেই পঞ্চায়েত সংগঠিত হয়নি এবং গ্রামের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করতে পারে নি। সরকারি স্তরেই এক্ষেত্রে

ব্যর্থতা ছিল প্রকট। উদ্যোগী ও অনুগত দলীয় কর্মীর অভাবেও পঞ্চায়েত ব্যর্থ হয়েছে। তবে ১৯৫৫ সালের সব থেকে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্যোগ শুরু হয়ে গেল রীতিমত জোর কদমে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পঞ্চায়েতকে পৌর ও উন্নয়নমূলক কাজে এবং ভূমি পরিচালন ও ভূমি সংস্কারের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণের কথা বলা হল। দ্বিতীয় পরিকল্পনা, কালেই গঠিত হল বলবন্ত রাই মেহতার নেতৃত্বে একটি কমিটি (Balwantarai Mehta Committee)। এই কমিটিকে পূর্ববর্তী প্রজন্ম নিয়ে সমীক্ষা করার ও জেলা প্রশাসনের পুনর্গঠন বিষয়ে সমীক্ষা করতে এবং সুপারিশ করতে বলা হল। ১৯৫৭ সালে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

পূর্ববর্তী ব্লক প্রকল্পের অরাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক সাংগঠনিক কাঠামো, বিদেশী অভিজ্ঞতাপুষ্টি প্রকল্প এদেশের পক্ষে অনুকূল নয় এবং জেলা ভিত্তিক উপর-নিচ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রামীণ উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক নয় একথা ভেবে বলবন্ত রাই কমিটি জেলার নিচের স্তরে (Sub-district Level) সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের সুপারিশ করে। কমিটির সুপারিশে ব্লকভিত্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার পাশাপাশি জন অংশগ্রহণের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর একটি গণতান্ত্রিক সংস্থা সৃষ্টির সুপারিশ করা হয়। বলবন্ত রাই মেহতা কমিটির রিপোর্টে একটি ত্রি-স্তর (Three-ther) পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সুপারিশ করা হল ঃ সর্বনিম্ন স্তরে গ্রাম পঞ্চায়তে মধ্যবর্তী স্তরে অঞ্চল পঞ্চায়েত এবং সর্বোচ্চ স্তরে জেলা পরিষদ। গ্রামের বিধানসভার নির্বাচকেরা ১০—১৫ জনের যে কার্যনির্বাহী সভা গঠন করবে তা পরিচিত হবে গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাবে। গ্রামের উন্নয়নের যাবতীয় দায়িত্ব (রাস্তাঘাট নির্মাণ, জনস্বাস্থ্য, সংরক্ষণ, জল সরবরাহ, কৃষি উৎপাদন ইত্যাদি) থাকবে গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে। অঞ্চল পঞ্চায়েত গড়ে উঠবে পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামসভা (গ্রামের নির্বাচকদের সংস্থা) নিয়ে। প্রধানত কর ধার্য আর আঞ্চলিক স্তরে বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন হবে এর কাজ। জেলা পরিষদ জেলা স্তরে উন্নয়নের যাবতীয় কাজ (কৃষি, সেচ, সমবায়, কুটীর শিল্প, স্বাস্থ্য ইত্যাদি) সম্পাদন করবে। বলবন্ত রাই কমিটি আগেকার ব্লক প্রকল্পের মধ্যে স্থানীয় উদ্যোগকে সঞ্চারিত করার কোন ব্যবস্থা বা গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়নের স্বার্থে উপযুক্ত নের্তৃত্ব গড়ে তোলার ব্যবস্থা লক্ষ্য করে নি। স্থানীয় শিক্ষার মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াবার যে সুযোগ বা সুবিধা সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের ছিল তাকেও কাজে লাগানো হয় নি। বলবন্ত রাই মেহতা কমিটি মনে করে স্থানীয় স্বার্থের প্রসারের জন্যই প্রতিনিধিমূলক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাই গ্রামের উপযুক্ত সংগঠন।

বলবন্ত রাই মেহতা কমিটির সুপারিশ মেনে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ রাজ্যে রাজ্যে পঞ্চায়েত গড়ে এর হাতে স্থানীয় উন্নয়নমূলক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব ছেড়ে দেবার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানালো। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, ক্ষমতা ও দায়িত্বের সুষ্ঠু স্থানান্তর ও প্রত্যর্পণ সংগঠন ও উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থের যোগান—বলবন্ত রাই কমিটির এইসব প্রস্তাব মেনেই রাজ্যগুলিকে পঞ্চায়েত পুনর্গঠনের কথা বলা হল। সন্দেহ নেই পঞ্চাশের দশকের শেষে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তোলার এই উদ্যোগ অভিনব ও বৈপ্লবিক। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৩ এই পর্বে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ, রাজ্য সরকারগুলির উপর চাপ সৃষ্টি এবং রাজ্যে রাজ্যে তৎপরতা সব কিছুই অভিনবত্ব দাবি করতে পারে। ইতিমধ্যে তৃতীয় পরিকল্পনা কমিশনও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উদ্দেশ্যগুলি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ, সমবায়ের প্রসার, স্থানীয় মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, আর্থিকভাবে গরীব ও দুর্বল মানুষদের সহায়তা দান, স্বেচ্ছামূলক সংগঠনগুলির সহায়তায় কর্তৃত্ব

প্রাণ্ডলিপি ঃ বলন্ত রাই মেহতা কমিটি সুপারিশের ভিত্তিতে গঠিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এক অর্থে স্বাধীন ভারতের প্রথম সংগঠিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। অনেকে একে প্রথম প্রজন্মের পঞ্চায়েত বলে মনে করেন। গান্ধীজি বা বিনোতা ভাবে পঞ্চায়েতর মাধ্যমে যে গ্রাম স্বরাজের ধারণাকে প্রচার করেছেন এই পঞ্চায়েত অবশ্যই সে ধরণের পঞ্চায়েত নৈতিকতার অনুশাসন বা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সগঠনের কোন ধারণা নয়, এই পঞ্চায়েত একান্তভাবেই ছিল প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক।

ও উদ্যোগের প্রগতিশীল বিস্তার এবং গ্রামে সংহতি ও স্বতঃপ্রণোদিত সাহায্যের শক্তিকে উৎসাহিত করা পঞ্চায়েত ব্যবস্থার লক্ষ্য বলে তৃতীয় পরিকল্পনায় ঘোষণা করা হল। তৃতীয় পরিকল্পনায় গ্রামীণ উৎপাদন পরিকল্পনা, জল সরবরাহ, ক্ষুদ্র সেচ, বিদ্যালয় স্থাপনে, পরিবার পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও সমবায়, কূপ খনন ও অন্যান্য স্থানীয় পরিষেবার দায়িত্ব দেওয়া হল গ্রাম পঞ্চায়েতকে। পঞ্চায়েত সমিতিকে স্থায়ী কমিটির (Standing Committees) মাধ্যমে সমাজসেবা, অর্থ ও কর ও প্রশাসনিক দায়িত্ব নেবার কথা বলা হল। জেলা পরিষদের হাতে দেওয়া হল পঞ্চায়েত সমিতি রচিত পরিকল্পনার সমন্বয় ও সংহত করার এবং নিচের স্তরের বিভিন্ন কাজ ও বন্টন ব্যবস্থায় তদারকীর দায়িত্ব। পঞ্চায়েতের জন্য সম্পদ সংস্থান ও রাজ্য সরকারগুলির পঞ্চায়েত সংগঠনে কি ভূমিকা হবে সে বিষয়টিই নির্দেশ করা হল তৃতীয় পরিকল্পনায়।

ইতিপূর্বে ১৯৫৮ সালের ১২ জানুয়ারী বলবন্ত রাই মেহতা কমিটির সুপারিশ জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের সম্মতি লাভ করেছে এবং অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, গুজরাজ, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, মহিশুর, উড়িষ্যা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যেও এ বিষয়ে অগ্রগতি ছিল আশাপ্রদ। বিভিন্ন রাজ্যে জেলা ও ব্লক স্তরে পরামর্শদাতা কমিটি, সমন্বয় কমিটি, স্থায়ী কমিটি গড়ে, কর্মচারী নিয়োগ করে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে বাস্তব রূপদানের চেষ্টা চলেছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সক্রিয়তা স্থানীয় ক্ষেত্রে নেতৃত্বের সঞ্চালন ও বিকাশে সহায়তা করেছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার এই অভিনব তৎপরতা ও সচলতার কারণ কী? গবেষক ও বিষেজ্ঞরা মনে করেন।

১। বলবন্ত রাই কমিটি গ্রাম জীবনের মনস্তত্ব বুঝেছিলেন এবং গ্রামের উপযোগী পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সুপারিশ করার বিষয়টি জনপ্রিয় হয়েছিল।

২। বলবন্ত রাই কমিটির সুপারিশ কেবলমাত্র প্রশাসনিক ছিল না, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মানেও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ভবিষ্যতে দৃঢ় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ভিত গড়ে দিতে, আরো মর্যাদাপূর্ণ পঞ্চায়েত তৈরি করতে এটি ছিল আদর্শস্থানীয়। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত বিভিন্ন স্তরের সমন্বয়, পঞ্চায়েতের আর্থিক স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্রে, গ্রামের উন্নয়নে বিস্তারিত কর্মসূচী, গ্রামসভা, পঞ্চায়েত নির্বাচনের সুপারিশ—সব কিছুর প্রেক্ষাপটের এই সুপারিশ ছিল অভিনব।

৩। সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের আমলাতান্ত্রিক ব্যয়সাধ্য, অপচয়মূলক ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থাপনার একেবারে বিপরীতধর্মী এক গণতান্ত্রিক, ভারতীয় অভিজ্ঞতাপুষ্ট গতিশীল গ্রাম প্রশাসন ব্যবস্থার সুপারিশ করেছিল বলবন্ত রাই কমিটি।

৪। সরকারের কাছেও এই কমিটির সুপারিশ গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে কারণ কংগ্রেসের মত একটি শাসকদলের কাছে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রয়োগের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়াবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গণপরিষদের বিতর্কে, বা স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রথম প্রথম নেহরুর স্থানীয় শাসন সম্পর্কে যে বিরাগ বা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছিল এই পর্বে তা ছিল না। বরং কংগ্রেস অধিবেশনে বা জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের বক্তৃতায় বা লোকসভার বিতর্কে এই পর্বে নেহরু সন্তোষজনক ও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত করেছেন। রাজ্য বিশেষে পঞ্চায়েতকে গ্রামে ক্ষমতা বাড়াবার সংস্থা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে একথা অসত্য নয়। মহারাষ্ট্র গুজরাট ও উত্তর প্রদেশের মত রাজ্যে শাসক দলের প্রাদেশিক কমিটিগুলির এক্ষেত্রে হিসাবী মনোভাব লক্ষ্য করবার মত। অবশ্য অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, বা পশ্চিমবঙ্গে বিষয়টি একরকম ছিল না। এই সব রাজ্যে বিরোধী শক্তিশালী রাজনৈতিক দলকে প্রতিরোধ ও দমন করার স্বার্থেই বা দলে উপদলীয় কার্যকলাপ রোধ করতেই পঞ্চায়েতের উপর শাসক দল নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্য বজায় রাখতে চেয়েছেন।

তবে পঞ্চায়েত সম্পর্কে এই আবেগ, উত্তেজনা বা পঞ্চায়েত রাজের এই মাধুর্য বা নিনাদ পরবর্তীকালে আর

ছিল না। বলবন্ত রাই মেহতা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে যত দ্রুত অধিকাংশ রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সচল ও সক্রিয় হয়েছিল ষাটের দশকের প্রথমার্ধে, ঠিক ততটাই দ্রুততার সঙ্গে এইসব রাজ্যে ষাটের দশকের শেষার্ধে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ক্রমশ স্থবির এবং সত্তরের দশকে ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। পরবর্তীকালে পঞ্চায়েত সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত অশোক মেহতা কমিটি (Asok Mehta Committee) প্রথম পর্ব বা প্রজন্মের এই পঞ্চায়েতের উত্থান (১৯৫৯-১৯৬৩) স্থবিরতা (১৯৬৫-১৯৬৯) ও ভাঙন (১৯৬৯-১৯৭৭) এই তিনটি পর্যায়কে চিহ্নিত করে।

প্রথম প্রজন্মের পঞ্চায়েতের এই স্থবিরত্ব ও ভাঙনের পেছনে যে সব কারণ ছিল তার মধ্যে অন্যতম হল :—

- পঞ্চায়েত নিয়ে যে আশা ব্যক্ত হয়েছিল বা উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল, অধিকাংশ রাজ্যের সরকার পঞ্চায়েত সম্পর্কে সেই আসা ও উৎসাহ হারিয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচন হয় নি। উন্নয়নের কাজে স্থবিরতা এসেছে, নিচের স্তরের পঞ্চায়েতগুলির স্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না। পঞ্চায়েতের নামে জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদই ক্ষমতাশালী হয়েছে। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ও দুর্নীতি চরমে উঠেছে। এর উপর ছিল অতিরিক্ত সরকারী হস্তক্ষেপ, পর্যাপ্ত অর্থের অভাব এবং যতটুকু অর্থ পাওয়া গেছে তার অপচয়।

- পঞ্চায়েতের ভাঙনের আর একটি দিক হল ১৯৬০ ও সত্তরের দশক থেকে গ্রামীণ উন্নয়নে প্রজন্মের ক্ষেত্রে বিকল্প কর্মসূচীর প্রয়োগ। ষাটের দশকের পঞ্চায়েতের স্বকীয় চিন্তা ছেড়ে গ্রহণ করা হল ফোর্ড ফাউন্ডেশনের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে ধার করা নিবিড় উৎপাদন প্রকল্প (নিবিড় কৃষি এলাকা প্রকল্প, Intensive Area District Programme-IADP)। মেক্সিকো, ফিলিপাইন ও তাইওয়ানের অনুকরণে প্রায় একই সময়ে গ্রহণ করা হল কৃষির প্রযুক্তিগত উন্নতি ও আধুনিকীকরণের পদ্ধতি—সবুজ বিপ্লব (Green Revolution)। বলা হল পঞ্চায়েত বা ভূমি সংস্কার নয়, ভারতে কৃষি উন্নয়ন ও গ্রামীণ উন্নয়নে গতি আসবে সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে। সবুজ বিপ্লবের নামে কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ধারাবাহিক প্রয়োগের কথা বলা হল। বলা হল বিস্ময়কর বীজ, রাসায়নিক সার, একই জমিতে বহু ফলন, আধুনিক যন্ত্রপাতি, শষ্যের আধুনিক পরিপাক ক্রিয়া—সব মিলে সবুজ বিপ্লব গ্রামাঞ্চলে অভূতপূর্ব কর্মতৎপরতা ও সুফল এনেছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরের রাজ্যগুলিকে সবুজ বিপ্লব অভাবনীয় সাফল্য এনেছে, পঞ্চায়েত ক্রমশই পিছিয়ে পড়েছে। এরপর সত্তর দশকে একে একে এল গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প, গরীবী হঠাও কর্মসূচী, সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী (Integrated Rural Development Programme)। আর পঞ্চায়েতের চেয়ে এইসব কাজে অতিরিক্ত প্রাধান্য পেল উন্নয়ন ও সেবার নানা স্বেচ্ছামূলক সংগঠন (Voluntary Agencies), বিভিন্ন বিধিবদ্ধ এজেন্সী, বোর্ড ও কর্পোরেশন। উন্নয়নের এত বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টায় ঢাকা পড়ে গেল বিকেন্দ্রীকরণের গ্রামীণ সংগঠন পঞ্চায়েত, সরকারী প্রতিপত্তি যত বেড়েছে, শাসক দলের কেন্দ্র, রাজ্য আর জেলা কমিটির প্রতিপত্তি যত বেড়েছে, ততই কমেছে পঞ্চায়েতের ভূমিকা।

- কেন্দ্রীভূত প্রশাসন, পরিকল্পনা কমিশন সব মহল থেকেই প্রচার করা হল পঞ্চায়েত ব্যবস্থার হাত ধরেই গ্রামে জাতপাত, উপদলীয় চক্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, বেসরকারী আমলা (non-official Bureaucrat), আধিপত্য ও প্রভাবের রাজনীতি, দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। ক্ষমতার সংকট থেকেই সৃষ্টি হয়েছে গ্রামে উন্নয়নের সংকট। পঞ্চায়েত কোনভাবেই সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেনি, স্থানীয় উৎসাহ বাড়ানোর ক্ষেত্রেও পঞ্চায়েত ব্যর্থ। অতএব কেন্দ্রীয় নেতৃত্বেই ওর বিকল্প গড়ে তোলা দরকার।

৫.৮.৩ তৃতীয় ধাপ : ১৯৭৭-১৯৮৫

পঞ্চায়েত সম্পর্কে ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে ইতিবাচক সাড়া মেলে সত্তরের দশকের শেষার্ধে জনতা

সরকারের আমলে। বলা চলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার একরকম পুনর্জন্ম ঘটলো এই সময়ে। ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হল জনতা সরকার। কংগ্রেস শাসনের দীর্ঘ যুগের অবসান হল। ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসেই জনতা সরকার পঞ্চায়েতের কাজকর্ম বিষয়ে সমীক্ষার উদ্দেশ্যে অশোক মেহতার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল নিয়োগ করে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রচলিত পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি বিষয়ে মেহতা কমিটি অনুসন্ধান করে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার স্থবিরতা ও ভাঙনের কারণ হিসাবে এর অগোছালো কর্মসূচী, নিষ্ক্রিয়তা, এর উপর কায়েমী স্বার্থের প্রভাব, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির সদিচ্ছার অভাব, অর্থের অভাব প্রভৃতির উল্লেখ করে। বলবন্ত রাই কমিটি পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে বিধিবদ্ধ, নির্বাচিত, কাজকর্মে ব্যাপক, কর্মী দক্ষতা এবং আর্থিকভাবে সুসজ্জিত এক প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দিতে চেয়েছিল। বলবন্ত রাই কমিটির এই প্রত্যাশা পূরণ হয় নি। অশোক মেহতা কমিটি অতীতের এই ব্যর্থ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরো সক্রিয়, উদ্যোগী করার, রাজনৈতিকভাবে আরো সুসংগঠিত করার ব্যাপারে জোরালো যুক্তি দিয়েছে অশোক মেহতা কমিটি। পঞ্চায়েতকে ঢেলে সাজাবার জন্য চাপ দিয়েছে নতুন যুগের এই কমিটি।

অশোক মেহতা কমিটি পঞ্চায়েতকে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের প্রকৃত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করেছে এবং বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে গ্রামোন্নয়ন পরিচালনায় এর সক্রিয় ভূমিকা পালনের উপর। ১৯৭৮ সালে কমিটি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উপর ১৩২টি সুপারিশ সহ এর রিপোর্ট পেশ করে। অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশগুলির মধ্যে কয়েকটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য ঃ

১। দ্বিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ঃ জেলা পরিষদ ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণের প্রথম বা উর্ধতন স্তর। জেলার নিচে অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে গঠিত হবে মন্ডল পঞ্চায়েত। জেলা পঞ্চায়েতে থাকবেন জেলার নির্বাচিত প্রতিনিধি, মণ্ডল পঞ্চায়েতের সভাপতি, বড় পৌর সংস্থাগুলির প্রতিনিধি, দুজন মহিলা এবং বর্তমান সভ্যদের দ্বারা মনোনীত দুজন সদস্য (Co-opted সদস্য)। এর সঙ্গে থাকবেন জেলার সাংসদ, বিধায়ক, বিধান পরিষদের সদস্যগণ। মণ্ডল পঞ্চায়েতের সদস্য হবেন গ্রামের নির্বাচিত ১৫ জন সদস্য, কৃষক পরিষেবা সমিতির সদস্য, দুজন মহিলা Co-opted সদস্য।

২। গ্রাম কমিটি ঃ এই কমিটির সদস্যরা হবেন গ্রাম থেকে নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, গ্রাম থেকে নির্বাচিত জেলা পরিষদের সদস্য, ছোট ও প্রান্তিক চাষীদের প্রতিনিধি।

৩। পঞ্চায়েতের নিয়মিত নির্বাচন এবং এই নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলির অংশগ্রহণ, প্রধান নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা (প্রধান নির্বাচনী কমিশনারের পরামর্শমত) পঞ্চায়েত নির্বাচন পরিচালনা।

৪। ক্ষমতা, কাজ ও সম্পদ সমাবেশের ব্যাপারে পঞ্চায়েতের সক্রিয় ভূমিকা। জেলার পরিকল্পনা রচনায় পঞ্চায়েতের ভূমিকা, পঞ্চায়েত তহবিলের (Fund) নিরপেক্ষ হিসাবের ব্যবস্থা, দুর্বল শ্রেণীর কল্যাণে পঞ্চায়েতের বিশেষ দায়িত্ব।

৫। পঞ্চায়েতের জন্য একটি পৃথক, সরকারি মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি, পঞ্চায়েত নির্বাচন, আইন, হিসাবরক্ষা, প্রশিক্ষণের কাজে এই মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভূমিকা থাকবে।

৬। পঞ্চায়েতের কাজকর্মে পক্ষপাতিত্ব বা সরকার কর্তৃক পঞ্চায়েতের বাতিলের ব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য নয়।

৭। পঞ্চায়েতের বিষয়ে জনসমর্থন সমাবেশের কাজে স্বেচ্ছামূলক সংগঠনগুলির ভূমিকা স্বাগত।

৮। ন্যায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে স্থানীয় ভিত্তিতে বিচার ব্যবস্থা পরিচালনায় ব্যবস্থা থাকবে।

অশোক মেহতা কমিটি নিঃসন্দেহে ভারতের গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার উপর থেকে এতকালের বাধা-বিপত্তি ও নির্ভরতা কাটিয়ে একে আরো প্রাতিষ্ঠানিক, গঠনমূলক ও রাজনৈতিকভাবে বিশ্লিষ্ট করতে চেয়েছে। 'অশোক মেহতা কমিটি' এর উপর থেকে আমলাতান্ত্রিক বাধা অপসারণ করে, এর পূর্বেকার কর্তৃত্বমুখী প্রবণতা ও ত্রুটিপূর্ণ সাংগঠনিক নকসাকে অতিক্রম করে পঞ্চায়েতকে প্রকৃত অর্থেই উন্নয়ন ও পরিকল্পনার এক স্বায়ত্তশাসনমূলক ব্যবস্থায় রূপ দিয়েছে। পঞ্চায়েতকে নিছক প্রশাসনিক সংস্থা হিসাবে না ভেবে একে উন্নয়ন ও পরিকল্পনার এক জনমুখী মাধ্যম হিসাবে ভাবা হল। পঞ্চায়েতকে এই সঙ্গে আধুনিক ও প্রকৃত অর্থেই গণতান্ত্রিক ও দায়িত্বশীল করে তোলার ইচ্ছা ব্যক্ত হল কমিটির সুপারিশে। ১৯৭৯ সালে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে কমিটির রিপোর্ট সাদরে গৃহীত হল এবং এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই গ্রামীণ উন্নয়ন ও সংগঠনে পঞ্চায়েতের ভূমিকা কী হবে তা নিয়ে এই নির্দেশরেখা স্থির হল।

কেন্দ্রের জনতা সরকারের পতনের ফলে অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশ কেন্দ্রে কার্যকর হয় নি অর্থাৎ পঞ্চায়েত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন নির্দেশিকা বা পরিকল্পনা পেশ হয় নি। তবে আশীর দশকের প্রথমার্ধ থেকেই কর্ণাটক, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ বা পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত সম্পর্কে নতুনভাবে উৎসাহ সৃষ্টি হয়, আইন পাশ বা সংশোধনী হতে থাকে এবং গ্রামীণ উন্নয়ন ও পরিকল্পনায় পঞ্চায়েত স্বাধীনভাবে কী ভূমিকা নিতে পারে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার প্রয়াস শুরু হয়। কর্ণাটক বা অন্ধ্রপ্রদেশে অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশকেই অনুসরণ করার চেষ্টা হলেও, কেরলে কিন্তু এ নিয়ে কিছুটা পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা গেল। অশোক মেহতা কমিটির অন্যতম সদস্য ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ (E. M. S. Namboodiripad) পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে প্রকৃত অর্থের স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠান হিসাবে, সংগঠিত করার সুপারিশ করেন। নাম্বুদ্রিপাদ শুধু গ্রাম স্তরেই পঞ্চায়েত সংগঠনের কথা বলেন এবং তিনি নিজে কেরালায় এক-স্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করেন। যদিও পরবর্তীকালে কেরালা জেলা প্রশাসন আইন এনে এই রাজ্যে দ্বিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কার্যকর করে। পশ্চিমবঙ্গেও নতুন সংশোধনী পঞ্চায়েত আইনে (১৯৮৩) অশোক মেহতা কমিটির প্রভাব ছিল। রাজ্যে রাজ্যে পঞ্চায়েতের আইনী ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ধারা কী ছিল সে বিষয়ে বর্তমান পর্যায়ের আলোচনা তৃতীয় এককে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

পঞ্চায়েত সম্পর্কে বলবন্ত রাই মেহতা কমিটি ও অশোক মেহতা কমিটির দৃষ্টিভঙ্গি দুটি পৃথক যুগের এবং প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গি। দুটি কমিটির মধ্যে ব্যবধান ২০ বছরের। বলবন্ত রাই কমিটির চিন্তায় ছিল পঞ্চায়েতের প্রথম প্রজন্ম তথা শৈশবকালের অভিজ্ঞতা। তুলনামূলকভাবে অশোক মেহতা কমিটির অভিজ্ঞতা হল পঞ্চায়েত যৌবনকালের এবং পরিণত যুগের অভিজ্ঞতা। দুটি কমিটি দুটি রাজনৈতিক দলের মতাদর্শে পরিচালিত—প্রথমটি কংগ্রেসের এবং দ্বিতীয়টি জনতাদলের। বলবন্ত রাই কমিটি পঞ্চায়েতকে দেখেছে প্রধানত কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টি দিয়ে, অশোক মেহতা কমিটির দৃষ্টি ছিল একাধারে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক। বলবন্ত রাই কমিটি ত্রিস্তর, অশোক মেহতা কমিটির দুই স্তরের পঞ্চায়েতের সুপারিশ করে। গ্রামের জনগণের হাতে ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেবার সুপারিশ উভয় কমিটিই করেছে, পঞ্চায়েতকে স্বাতন্ত্র দেবার কথাও বলেছে উভয় কমিটি তবে এক্ষেত্রে অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশ আমূল সংস্কারবাদী (Radical)। প্রথম যুগের পঞ্চায়েতের আমলাতান্ত্রিকতা, পক্ষপাত ও অদূরদর্শীতাকে কাটিয়ে উঠে দ্বিতীয় যুগে পঞ্চায়েতকে আরো গণতান্ত্রিক, আরো স্বাবলম্বী ও আরো কর্মমুখী ও সংগঠিত হবার পরামর্শ দিয়েছে অশোক মেহতা কমিটি।

৫.৮.৪ চতুর্থ ধাপ ঃ গ্রাম শাসনের সাংবিধানিক মর্যাদা

আশীর দশকের শেষার্ধ এবং নব্বইয়ের দশক থেকে ভারতবর্ষের গ্রামীণ বিকেন্দ্রিকরণের ব্যবস্থাকে আরো পরিণত

ও স্বচ্ছ করার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল। আশীর দশক থেকেই পঞ্চায়েত সংগঠনের ক্ষেত্রে রাজ্যে রাজ্যে যে উদ্দীপনা দেখা গেল সেদিকে তাকিয়েই গ্রামের উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে দেখা গেল এক নতুন উৎসাহ। সপ্তম ও অষ্টম পরিকল্পনায় পঞ্চায়েতী রাজের বিকাশও মর্যাদা বৃদ্ধির কথা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার কথা বলা হল। কেন্দ্রীয় উদ্যোগের সঙ্গে রাজ্য সরকারগুলির কর্মপ্রচেষ্টা যুক্ত হয় গ্রাম শাসনে এর নব রূপায়ণের এক নতুন গতি। পঞ্চায়েতকে সাংবিধানিক মর্যাদা দান করে কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চায়েতের এই নবগতিতে এক তরঙ্গ নিয়ে এল। পঞ্চায়েত সম্পর্কে এতকালের বিরাগ বা পঞ্চায়েতের স্থবিরত্ব কেটে গেল। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যুগ্ম প্রচেষ্টায় পঞ্চায়েত পেল নতুন মান ও মর্যাদা। পঞ্চায়েত সম্পর্কে এতকাল সংবিধান যে নীরবতা পালন করেছে বা সামান্য কিছু উল্লেখ করেই থেমে গেছে এবার দেখা গেল সেই সংবিধানকে সংশোধন করে পঞ্চায়েত সম্পর্কে ব্যাপক সংস্কারের ব্যবস্থা হল। সংবিধানে পঞ্চায়েত সম্পর্কে নতুন ধারা যুক্ত হল, এল পঞ্চায়েত বিষয়ে নতুন সংযোজন। সংবিধানে তৃতীয় স্তরের সরকার হিসাবে স্বীকৃতি পেল পঞ্চায়েত এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মত এর কর্মক্ষেত্র, সুনির্দিষ্টভাবে নির্বাচিত হল। আশীর দশকে দু-চারটি রাজ্য ছাড়া (মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম ইত্যাদি) প্রায় সব রাজ্যেই পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কম-বেশি এর কাজও শুরু হয়ে গেছে। ১৯৮৪ সালে পরিকল্পনা কমিশনের সৌজন্যে গঠিত জি. ভি. কে. রাও কমিটি (G. V. K. Rao Committee) গ্রামোন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী রূপায়ণে পঞ্চায়েতকে যুক্ত করার পরামর্শ দিল। পঞ্চায়েত নির্বাচন ও পঞ্চায়েতের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুদৃঢ় করতে দায়িত্বশীল জনমত গঠন, পরিকল্পনা রচনা ও ভূমি সংস্কারের রূপায়নে পঞ্চায়েতকে আরো বেশি করে যুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছে এই কমিটি। জেলাস্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধিত্ব জেলা পরিষদের সদস্য ও সভাপতি নির্বাচন, জেলার উন্নয়নে জেলা পরিষদকে সর্বতোভাবে যুক্ত করার সুপারিশ করেছে এই কমিটি, ব্লক ব্যবস্থায় নব রূপায়ণ, পঞ্চায়েতে মহিলাদের সংরক্ষণ, মণ্ডল পঞ্চায়েত গঠন ইত্যাদির কথা বলে জি. ভি. রাও কমিটি পঞ্চায়েতের সাংবিধানিক মর্যাদা দানের বিষয়ে এক অনুকূল পটভূমি তৈরি করেছে।

১৯৮৬ সালে গঠিত এল. এম. সিংভি কমিটি (L. M. Singhvi Committee) গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের কার্যকারিতার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েতের সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে এই কমিটির সুপারিশেই সর্বপ্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন বাধ্যতামূলক করা, পঞ্চায়েতের অর্থসংস্থান, পঞ্চায়েত বিষয়ক বিবাদ মেটানোর জন্য বিচার বিভাগীয় ট্রাইব্যুনাল (Judicial Tribunal) গঠন, স্বায়ত্তশাসন চরিত্র যুক্ত করতে গ্রামের পুন-র্বিন্যাস এই বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েতকে সরকারের তৃতীয় স্তর হিসাবে গ্রহণ করার সুপারিশ করা হল। এই সুপারিশের কথা মাথায় রেখেই রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার সরকারিভাবে পঞ্চায়েত সংগঠনের জন্য রাজ্যে রাজ্যে সম্মেলন কর্মশালা (Workshop) আহ্বান করে জনমত যাচাইয়ের চেষ্টা শুরু করে। সংবিধানে ৬৪ তম সংশোধন বিল এনে বিষয়টিকে সাংবিধানিকভাবে গুরুত্ব দেবার প্রচেষ্টা হলেও শেষপর্যন্ত এই প্রচেষ্টা সফল হয় নি। ৬৪ তম সংবিধান সংশোধন বিলে পঞ্চায়েত সম্পর্কে পর্যাপ্ত সাংবিধানিক ব্যবস্থার সুপারিশ হলেও বিলটি শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত হয় নি। তবে এই সংশোধনী বিলের হাত ধরেই যে পরবর্তীকালের ৭৩ তম সংবিধান সংশোধন বিলের মডেল তৈরি হয়েছিল এবং বিলটি শেষ পর্যন্ত আইনী মর্যাদা লাভ করেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পঞ্চায়েত সম্পর্কে এই পর্বে সারকারিয়া কমিশনের (Sarkaria Commission) এর প্রস্তাবও ছিল উল্লেখযোগ্য। ৭৩-তম সংবিধান সংশোধন আইনে গ্রাম সভা গঠন, পঞ্চায়েতের অর্থ, পঞ্চায়েত

প্রান্তলিপি : ৬৪ তম সংশোধন বিলে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তন, পঞ্চায়েত নির্বাচন বাধ্যতামূলক কথা, তপশীল জাতি-উপজাতি ও নারীদের উপযুক্ত আসন সংরক্ষণ, পঞ্চায়েতকে আর্থিক ক্ষমতা দান ও পঞ্চায়েতের হিসাব পরীক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। বিলটির সাংবিধানিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ১৯৮৯ সালের ১৫ মে লোকসভার বক্তৃতা করেন।

নির্বাচন, পঞ্চায়েতের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তৃত সুপারিশ আছে। পঞ্চায়েত গঠনে রাজ্যগুলির মধ্যে যথাসম্ভব সমরূপতা (Uniformity) আনা, তফশীল জাতি-উপজাতি ও নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ, বিধান সভার মত গ্রামসভা ডেকে পঞ্চায়েতকে দায়বদ্ধ করা, পঞ্চায়েতের হাতে পরিকল্পনা ও উন্নয়নের দায়িত্ব দান—ইত্যাদি বিষয়েও কার্যকর ব্যবস্থা নেবার কথা নতুন সংবিধান সংশোধন আইনে বলা হয়েছে।

৫.৯ রাজ্য গ্রাম শাসনের রূপ : সাম্প্রতিক ব্যবস্থা

সংবিধান চালু হবার প্রথম পাঁচ বছরে রাজ্যে গ্রাম শাসনের অবস্থান বা রূপ কী হতে পারে এ বিষয়ে কোন ধারণা লাভ করা সম্ভব ছিল না। ওই পর্বে গ্রাম উন্নয়নের প্রকল্প ছিল, পঞ্চায়েতও ছিল কিন্তু পঞ্চায়েতের কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। সংবিধানের ঘোষিত লক্ষ্যের সঙ্গে পঞ্চায়েতের অবস্থান বা কাজকর্মের কোন মিলই ছিল না। জমিদারী ব্যবস্থার অবসান ঘটলেও গ্রামে এই ব্যবস্থার রেশ থেকে গেছে। দুই একটি রাজ্যে (যেমন উত্তর প্রদেশ) পঞ্চায়েত নির্বাচন হলেও নির্বাচনের চেয়ে গ্রাম সংগঠনে মনোনয়ন ব্যবস্থাই প্রাধান্য পেয়েছে। আর গ্রামের পঞ্চায়েত কর্মচারী (যেমন তহশীলদার) মনোনয়নে কৃষকসভার চেয়ে জমিদার সংগঠনগুলির কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গ সহ দু-একটি রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা রাজনৈতিক অস্থিরতা যে ছিল না তা নয়। পশ্চিমবঙ্গে এই পর্বে ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচন নিয়ে উত্তেজনা ছিল। পঞ্চায়েত নিয়ে গ্রামে গ্রামে বিবাদ, উত্তেজনা, মামলা যেমন ছিল, তেমনি ছিল ব্যাপক আমলাতান্ত্রিক চাপ ও চাতুরী। সাধারণভাবে পঞ্চায়েত সংগঠন উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, কেরালা বা মধ্যভারতে থাকলেও (নানাবতী ও আঞ্জারার মতে, এই সময় প্রায় ৮৩ হাজারের বেশী গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল) পঞ্চায়েতের কাজকর্মে জাতপাত, সামাজিক বিভেদ, সরকারী হস্তক্ষেপ থাকার ফলে এগুলির অস্তিত্ব তেমনভাবে চিহ্নিত হয় নি।

ষাটের দশকে অবশ্য পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলেছে। এই পর্বে কংগ্রেস দলীয় সংগঠনের নেতৃত্বে গ্রামে পঞ্চায়েত সংগঠনে সচলতা এসেছে। বলবন্ত রাই মেহতা কমিটির সুপারিশ নিয়ে প্রথম প্রজন্মের যে পঞ্চায়েত হাজির হল সেখানে দেখা গেল অভূতপূর্ব উৎসাহ। ১৯৫৮ সালেই পঞ্চায়েতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ালো প্রায় ১,৬৫,০০০। উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, কেরালা, হিমাচল প্রদেশে এক্ষেত্রে বিরাট সাড়া এল। তুলনামূলকভাবে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা বা অন্ধ্রে পঞ্চায়েত সংগঠনের গতি ছিল স্লথ। তবে এই পর্বে সামগ্রিকভাবে সংগঠনে, কাজে কর্মে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় এক অভূতপূর্ব গতি লক্ষ্য করা গেল। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রতিটি স্তরে বিশেষ দায়িত্বপালনের সুযোগ পেল। গ্রাম আর ব্লক স্তরে প্রত্যক্ষ নির্বাচন চালু হল। পঞ্চায়েত সমিতির হাতে এল আর্থিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব। গ্রাম পঞ্চায়েত স্থানীয় আবশ্যিক ও পরিষেবামূলক কাজে দায়িত্ব পেল। জেলা ও গ্রামস্তরের পঞ্চায়েত সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি রাজ্যই বলবন্ত মেহতা কমিটির সুপারিশ মেনে অগ্রসর হবার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হলেও পঞ্চায়েত সমিতির গঠনের ক্ষেত্রে কোন রাজ্যের দ্বিধা ছিল। যেমন মহিশুর ও গুজরাটে তালুক ব্যবস্থাকে মধ্যবর্তী স্তরে নেওয়া হল। তবে অধিকাংশ রাজ্যে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছেন এবং বাস্তবে অনেক রাজ্যেই পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচন পদ্ধতি প্রত্যক্ষ ছিল না।

ইতিমধ্যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দলিলে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন লক্ষ্য ও প্রতিটি স্তরের কাজকর্মের একটি তালিকা পেশ হয়। রাজ্যগুলি বিভিন্ন স্তরের কাজকর্মে এই তালিকাকেই কম-বেশি অনুসরণ করেছে। সর্বনিম্ন স্তরে জলসরবরাহ, সেচ, পরিবার পরিকল্পনা উন্নয়ন ও সমবায়ের কাজে যেমন অগ্রগতি হয়েছে মধ্যবর্তী স্তরেও তেমনি কৃষি, নিষ্কাসন ব্যবস্থা, সামাজিক শিক্ষা, কুটীর শিল্প, জরুরী ভিত্তিক ত্রাণ ইত্যাদি কাজ চলেছে। সমিতি প্রধান ব্লক

উন্নয়ন আধিকারিকের উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও কোন কোন রাজ্যে পেয়েছেন। জেলা প্রশাসনে জেলা পরিষদ পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের গুরু দায়িত্ব পেয়েছে এবং জেলা প্রমুখ হয়েছেন, পঞ্চায়েতের উর্ধস্তরের প্রধান কর্তাব্যক্তি। তবে, এই পর্বে অধিকাংশ রাজ্যে পঞ্চায়েতের কাজকর্মে যতটা গতি আসবে আশা করা গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত তা আসে নি। সম্পদের অপ্রাচুর্য, রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ এ দুটি প্রধান বাধা ছাড়াও দলীয় প্রভাব, দুর্নীতি ইত্যাদিও বেড়েছে। মাদ্রাজে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে ব্লক স্তরে, অন্ধ্রে প্রাধান্য পেয়েছে পঞ্চায়েত সমিতি আর উত্তরপ্রদেশে জেলা কাউন্সিল। গ্রামীণ উৎপাদন পরিকল্পনায় অধিকাংশ রাজ্যেই পঞ্চায়েতের কোন ভূমিকাই ছিল না। রাজস্থানে গ্রামের পরিকল্পনা রচনার কাজে পঞ্চায়েতের কোন ভূমিকা ছিল না। পঞ্চায়েত অনেক রাজ্যেই পর্যাপ্ত অনুদান পায় নি। অনুদান প্রদানের ব্যবস্থাতেও সমতার নীতি পালিত হয় নি। রাজস্থানে পঞ্চায়েতের নিচের স্তরে পঞ্চ ও সরপঞ্চ (Panchas and Sarpanchas) নির্বাচনে ঐক্যমত্য হলেও পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান নির্বাচনে ঐক্যমত্যের প্রবল অভাব দেখা গেছে। দল হিসাবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস অংশ নিলেও, দলের মধ্যে নেতৃর্ত্বের দ্বন্দ্ব ছিল প্রকট। নির্বাচনী কারচুপিও কম ছিল না। নির্বাচন প্রচারে বা জনমত সংগঠনে দলীয় প্রতিনিধিদের বা প্রার্থীর তেমন উদ্যোগ ছিল না। প্রার্থী মনোনয়নে রাজনৈতিক চাপ ছিল বড় বেশী। স্বভাবতই স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের লক্ষ্য বা কার্যক্রম পরিপূরণে বিরাট ফাঁক থেকে গেছে। পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতিগুলিও (Standing Committee) তেমনভাবে সক্রিয় ছিল না। সরকারি আধিকারিকের চোখে পঞ্চায়েতীরা ছিল, এককথায় 'উদ্বেগ আর শংকার কেন্দ্র'। ত্রানের ক্ষেত্রে দুর্বল মানুষেরা অবহেলিতই থেকে গেছেন। অধিকাংশ রাজ্যে অনগ্রসর মানুষেরা পঞ্চায়েতের কাজকর্ম সম্পর্কে একরকম অবগতই ছিলেন না বলে পঞ্চায়েত বিষয়ে গবেষকেরা মন্তব্য করেছেন। ঋণ, সাহায্য, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ফসলের অবস্থান বা ক্রয় বিক্রয় বিষয়ে গ্রামের মানুষের কাছে পঞ্চায়েত নের্তৃত্ব কোন সদর্থক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। স্বভাবতঃই পরবর্তীকালে দীর্ঘ সময় ধরে রাজ্যে রাজ্যে পঞ্চায়েতের কাজকর্মের দুর্বলতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে পঞ্চায়েতের ধারাবাহিক নিস্ক্রিয়তা ও স্থবিরত্ব।

ওই স্থবিরত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেই পঞ্চায়েতকে আবার জাগিয়ে তোলার কাজ শুরু হল ১৯৭৮ সাল থেকে। অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশ নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে আবার চাঞ্চল্য শুরু হল। পঞ্চায়েতের নতুন কাঠামো আর তার মূল কাজ গ্রামোন্নয়ন সংগঠন ও পরিচালনার সুপারিশ মেনে অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, কর্ণাটক প্রায় সব রাজ্যেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পুনপ্রবর্তন হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে মৌলিক (Redical) দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার। ১৯৭৭ সালের জুন মাসে পঞ্চায়েত নির্বাচন সংগঠনের মধ্য দিয়ে রূপ পেল নতুন 'রাজনৈতিক' পঞ্চায়েতের ধারণা। নতুন পঞ্চায়েত নিয়ে এল পঞ্চায়েত নির্বাচনে নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব, গরীব ও সাধারণ মানুষের মধ্যে জাগ্রত হল রাজনৈতিক অংশগ্রহণের নতুন চেতনা। ভূমি সংস্কার আর উন্নয়নের কাজে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যুক্ত হল গ্রামের মানুষ। ভূমিসংস্কার, দারিদ্র দূরীকরণ, সুসংহত গ্রামীণ কর্মসূচী রূপায়ন, গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প সব কাজেই গ্রামের মানুষের সাথী হল পঞ্চায়েত। একই সঙ্গে বিকেন্দ্রিক পরিকল্পনার যে লক্ষ্য ধার্য হল পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার তাকে সফল করতে পঞ্চায়েতকেও গুরু দায়িত্ব দিল। পঞ্চায়েতের সঙ্গে হাত ধরেই চলল জেলা পরিকল্পনা কমিটির কাজ। আমলাতন্ত্র নয়, নির্বাচিত পঞ্চায়েতই হল পরিকল্পনা রূপায়নের ও সমন্বয়ের অন্যতম প্রধান শক্তি। অধিক দায়িত্বশালী ও স্বশাসিত পঞ্চায়েতের ধারণাকে সফলভাবে কার্যকর করতে পঞ্চায়েতে নির্বাচনকে নিয়মিত করার সাথে সাথে গ্রামোন্নয়নের সমস্ত কাজেই (পরিকল্পনা সহ) পঞ্চায়েতকে দায়িত্ব দেওয়া হল। সরকারি করুণায় নয়, স্বনির্ভরশীল গ্রামের নিজের উদ্যোগেই এগিয়ে এল খাদ্য, স্বাস্থ্য, আশ্রয়, শিক্ষা আর অন্যান্য কাজের দায়িত্ব নিয়ে।

১৯৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সংগঠন ও কাজকর্ম আরো সংহত, হয়েছে নতুন পঞ্চায়েত

সংশোধনী আইনের মাধ্যমে। পঞ্চায়েত নির্বাচন বাধ্যতামূলক করা, পঞ্চায়েতে মহিলা ও তফসিলী জাতি-উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষণ, পঞ্চায়েতের সদস্যদের মধ্যে দপ্তর ভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন, পঞ্চায়েতের আখের সূত্র বৃদ্ধি, পঞ্চায়েতের হিসাব পরীক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা অর্থ কমিশন গঠন, গ্রাম সংসদ গঠন পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত আইনের কতকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ দিক। এতকালের প্রশাসনিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নতুন আইনে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক মর্যাদা পেয়েছে। নব্বইয়ের দশক থেকে পঞ্চায়েতের রাজ্য প্রশাসনের উপর নির্ভরতা যেমন কমেছে, তেমনি এর দায়িত্ব বেড়েছে। নীতি-নির্ধারনের প্রশ্নে পঞ্চায়েতের সমিতিগুলির (কমিটি) দায়িত্ব বেড়েছে। বিভিন্ন গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে পঞ্চায়েতের ভূমিকা চোখে পড়েছে। তবে সম্পদ সৃষ্টির কাজে, পঞ্চায়েতকে আরো গতিশীল করার কাজে ১৯৮০'র দশক পর্যন্ত পঞ্চায়েতের যে ভূমিকা ছিল পরবর্তীকালে সে ভূমিকা চোখে পড়েনি। স্থানীয় মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করলেও উন্নয়নের কাজে ভূমি সংস্কারের কাজে আগের মত সামিল করা যায় নি। দুর্নীতি, ক্ষমতা ও আধিপত্যের দলীয় লড়াই, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে পরিকল্পনার অভাব লক্ষ্য করা গেছে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের গরীব শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা গেছে কিনা এ নিয়েও কোন কোন মহলে সন্দেহ করা হয়েছে।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নবরূপায়নে সব রাজ্যেই নতুন সাংবিধানিক আইনের প্রয়োগ হয়েছে। এই আইন মেনেই রাজস্থান ও হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, কেরালা, কর্ণাটক সর্বত্রই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সংগঠনে গতি এসেছে। নির্বাচন, পঞ্চায়েতে মহিলাদের সংরক্ষণ, উন্নয়নের কাজে পঞ্চায়েতকে দায়িত্ব দান—সব ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকারগুলির উদ্যোগ বেড়েছে সন্দেহ নেই। তবে পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করে বিগত শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে রাজ্যে রাজ্যে স্থানীয় রাজনীতিতে চাঞ্চল্য, উত্তেজনা ও রাজনৈতিক লড়াইও বেড়ে গেছে। ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৮-এই সময়কালের মধ্যে সাময়িকভাবে দুবার এবং ১৯৯৯ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (National Democratic Alliance) পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাংবিধানিক ও আইনগত সংস্কারকে কার্যকর করতে সরকারি পর্যায়ে সক্রিয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ঘোষণা করে। ১৯৯৬ সালে জনতাদলের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকার (এইচ. ডি. দেবেগৌড়া ও আই. কে. গুজরাল এই সরকারের যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন) পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাংবিধানিক মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে সচেতন ছিল। পঞ্চায়েত নিয়ে ওই সময় থেকেই স্থানীয় রাজনীতিতে ক্ষমতায় ও স্বার্থের নানা চক্র এমনভাবে বাসা বেঁধেছে। যা কার্যক্ষেত্রে প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পক্ষে ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হয়েছে।

৫.১০ সারাংশ

গ্রাম সমাজের সংগঠন ও গ্রাম শাসন ভারতের মত উন্নয়নশীল সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান কেন্দ্র। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের আদর্শকে সফল করতে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের ভাবনা অপরিহার্য। অতীতকাল থেকেই ভারতে গ্রাম শাসনের এক ঐতিহ্য ছিল। মধ্যযুগে সুলতান আমলে বা মুঘলযুগে সাম্রাজ্য শাসনের স্বার্থেই প্রশাসনিক বিভাগ ও স্থানীয় শাসনের ব্যবস্থা হয়। ব্রিটিশ শাসনকালেই প্রশাসনিক ও আইনগতভাবে গ্রাম শাসনের একটি ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রাম শাসনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৮৬৪, ১৮৭১, ১৮৭২, ১৮৮৫ সালে ব্রিটিশ শাসক কিছু আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে লর্ড মেয়ো ও লর্ড রিপনের অবদান স্মরণীয়। বিংশ শতকের প্রথম তিন দশকে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। গ্রাম শাসন বিষয়ে এক মৌলিক ও অভিনব প্রকল্প পেশ করেছেন গান্ধীজি। সমাজ গঠনের গঠনমূলক কাজকর্মে তিনি যুক্ত করতে চেয়েছেন গ্রাম ও পঞ্চায়েতকে। গ্রাম স্বরাজের সমাজমুখী আদর্শকে তিনি রূপ দিতে চেয়েছেন ভারতীয় সমাজে। গ্রাম স্বরাজ হল এক পরিপূর্ণ প্রজাতন্ত্র।

গ্রামের নির্বাচিত পাঁচজনের পঞ্চায়েতই গ্রাম স্বরাজের আদর্শকে রূপ দেবে। স্বাধীন ভারতে গ্রাম শাসন নিয়ে গণপরিষদের সদস্য বা সংবিধান প্রণেতাদের তেমন একটা সদিচ্ছা লক্ষ্য করা যায় নি। নির্দেশমূলক নীতি পর্যায়ের একটি ধারায় (Part IV, Art 40) এর উল্লেখ মাত্র ছিল। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ এই পর্যায়ে গ্রাম সংগঠনের ক্ষেত্রে যে পরিকল্পিত উদ্যোগ ছিল সেখানে পঞ্চায়েত নয়, প্রাধান্য পেয়েছে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প। ১৯৫৭ সালে সর্বপ্রথম ভারত সরকার বলবন্ত রাই মেহতার নেতৃত্বে একটি কমিটি গড়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হল। ইতিপূর্বে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পঞ্চায়েতকে গ্রামীণ উন্নয়নে যুক্ত করার কথা বলা হয়। বলবন্ত রাই কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করে রাজ্যে রাজ্যে পঞ্চায়েতের কাজে গতি আনার চেষ্টা হয় বটে তবে তা ছিল সাময়িক। অচিরেই পঞ্চায়েত স্থবিরত্ব লাভ করে। বলবন্ত রাই কমিটির সুপারিশ মত নির্বাচন হয় নি এবং পঞ্চায়েতের বিকল্প হিসাবে গ্রাম উন্নয়নের অন্যান্য প্রচলন ও কর্মসূচী প্রাধান্য পায়।

দীর্ঘকালের স্থবিরত্ব কাটিয়ে অবশেষে ১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আনা হয়। ঐ বিষয়ে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত জনতা সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৯৮ সালে অশোক মেহতার নেতৃত্বে গঠিত কমিটি পঞ্চায়েতকে নবজন্ম দান করে। দ্বিতীয় প্রজন্মের এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আরো গঠনমূলক ও রাজনৈতিকভাবে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। ভারতের পঞ্চায়েত বিবর্তনে নব্বইয়ের দশক এক উল্লেখযোগ্য পর্ব। এই পর্বে ভারত সরকার সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধন আইন এনে ভারতের পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সাংবিধানিকভাবে নবমর্যাদা দান করে। পঞ্চায়েতকে সরকারের তৃতীয় স্তর বলে বিবেচনা করা হয়। সংগঠনে ও কাজে-কর্মে পঞ্চায়েতকে আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করা হয়। পঞ্চায়েতের নিজস্ব কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত হয়। একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গেও পঞ্চায়েত সম্পর্কে এক নতুন আইন (১৯৯৪) এনে গ্রামীণ শাসন, পরিকল্পনা ও উন্নয়নে পঞ্চায়েতকে যুক্ত করার কথা বলা হয়। পঞ্চায়েত আরও সংহত ও উদ্দেশ্যমুখী হয়ে ওঠে। অন্যান্য রাজ্যেও পঞ্চায়েত সংগঠনে বিশেষ তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চায়েত নিয়ে এই থেকে স্থানীয় রাজনীতিতে উত্তেজনা ও ক্ষমতার লড়াইও বেড়ে গেছে।

৫.১১ অনুশীলনী

১। একটি বা দুটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন ঃ

(ক) পঞ্চায়েত কথাটির অর্থ কী ?

(খ) গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝেন ?

(গ) ব্রিটিশ আমলে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের সংস্কার এনেছেন এমন দুজন প্রশাসকের নাম করুন।

(ঘ) গান্ধীজি গ্রাম স্বরাজ বলতে কী বুঝেছেন ?

(ঙ) প্রথম প্রজন্মের পঞ্চায়েত কী ?

(চ) দ্বিতীয় প্রজন্মের পঞ্চায়েত বলতে কী বলা হয়েছে ?

(ছ) বিবর্তনের সর্বশেষ ধাপে পঞ্চায়েত কী মর্যাদা পেয়েছে ?

(জ) দুটি প্রজন্মে পঞ্চায়েত সম্পর্কে যে দুটি কমিটি গঠিত হয়েছিল তাদের নাম কী ?

২। টীকা লিখুন ঃ (অনধিক ৫০ শব্দে)

(ক) গান্ধীজির গ্রাম সংগঠন প্রকল্প ;(খ) গ্রাম শাসনের গুরুত্ব ;

(গ) ব্রিটিশ ভারতে গ্রাম শাসনের ব্যবস্থা ; (ঘ) বলবন্ত রাই মেহতা কমিটি ;

(ঙ) অশোক মেহতা কমিটি।

৩। অনধিক ৫০ শব্দে উত্তর করুন ঃ

(ক) গ্রাম শাসনের গুরত্ব বর্ণনা করুন।

(খ) ভারতবর্ষে গ্রাম শাসন ও সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি উল্লেখ করুন।

(গ) পঞ্চায়েত বিষয়ে বলবন্ত রাই কমিটি ও অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশের পার্থক্য কী ?

(ঘ) গ্রাম শাসন সম্পর্কে গান্ধীজির বক্তব্য সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

৪। অনধিক ১৫০/২০০ শব্দের মধ্যে প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) ভারতে গ্রাম শাসনে অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(খ) ব্রিটিশ শাসনকালে গ্রাম শাসনের ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা বা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে সে বিষয়ে উল্লেখ করুন।

(গ) ভারতবর্ষে গ্রাম শাসনের বিবর্তনটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(ঘ) গ্রাম শাসনের বিবর্তন ও বিকাশে অশোক মেহতা কমিটির অবদান উল্লেখ করুন।

(ঙ) বিভিন্ন সময়ে গ্রাম শাসনের ক্ষেত্রে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যে পরিবর্তন এসেছে সে বিষয়ে আলোচনা করুন।

৫.১২ গ্রন্থপঞ্জি

1. A Avasthi and A. P. Avasthi : **Indian Administration (1998)**

2. Subhash. C. Kashyap (ed) **Perspectives on the constitution of India (1993).**

3. Asok Kumar Mukhopadhyay, **The Panchayat Administration in West Bengal (Revised edition)** Buddhadev Bhattacharya-**Evolution of Political Philosophy of Gandhi (1969).**

4. A. R. Desai : **Rural Sociology in India (1978).**

5. দেবাশিস চক্রবর্তী:গণ প্রশাসন, পরিচালন ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা (১৯৯৫)।

6. সুভাষ সোম : জন প্রশাসন (১৯৯৯)।

7. Amiya K. Chaudhuri, **"A Conceptual Framework of Panchayati Raj". The Calcutta Journal of Political Studies, Vol. I. Nos. 1& 2, 2001.**

একক ৬ ☐ গ্রাম শাসনের কাঠামো

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য
৬.২ প্রস্তাবনা
৬.৩ গ্রাম শাসন কাঠামোর অর্থ ও তাৎপর্য
৬.৪ ভারতে গ্রাম শাসন কাঠামোর রূপ
৬.৪.১ পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তর ও তাদের এলাকা (আকার)
৬.৪.২ বিভিন্ন স্তরে পঞ্চায়েতের গঠন পদ্ধতি
৬.৪.৩ পঞ্চায়েত নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন
৬.৪.৪ পঞ্চায়েতের কার্য-নির্বাহী সংস্থা, কর্মীবৃন্দ ও কার্যালয়
৬.৪.৫ পঞ্চায়েতের কমিটি
৬.৪.৬ পঞ্চায়েতের রাজস্ব
৬.৪.৭ পঞ্চায়েত, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার
৬.৪.৮ পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের সমন্বয়
৬.৫ পঞ্চায়েত ও গ্রামের সামাজিক কাঠামো
৬.৬ সারাংশ
৬.৭ অনুশীলনী
৬.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৬.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি—

- গ্রাম শাসন কাঠামোর অর্থ ও তাৎপর্যকে চিহ্নিত করতে পারবেন।
- ভারতে গ্রাম শাসন কাঠামোর বিভিন্ন দিক ও তার গঠনমূলক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সঙ্গে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্ক কেমন সে বিষয়ে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবেন। গ্রামের সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে বর্তমান পঞ্চায়েত শাসন কাঠামোর সঙ্গে বর্তমান পঞ্চায়েত শাসন কাঠামোর সম্পর্কে বিষয়েও প্রসঙ্গত কিছু ধারণা পেতে পারেন।

৬.২ প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী এককের আলোচনা থেকে ভারতে গ্রাম শাসনের দীর্ঘ বির্বতনের গতিটি আপনারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং অতীত, মধ্যযুগ ও ব্রিটিশ শাসনের পর্যায় অতিক্রম করে স্বাধীন ভারতে একেবারে সাম্প্রতিককাল

পর্যন্ত এদেশের গ্রামীণ স্থানীয় শাসনব্যবস্থা কিভাবে বিকশিত হয়েছে তার একটি স্থিরচিত্র আপনারা পেয়েছেন। বর্তমান এককে ভারতে গ্রামীণ শাসনের বাস্তব রূপটিকে বুঝতে গ্রামীণ শাসন কাঠামো ও তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। আলোচনার প্রথমেই গ্রাম শাসন কাঠামো বলতে কী বোঝায় এবং এর প্রয়োজন কী সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তর, ওদের গঠন পদ্ধতি, পঞ্চায়েত নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্ব পঞ্চায়েতের নেতৃত্ব ও কর্মচারী, পঞ্চায়েত কমিটি, পঞ্চায়েতের অর্থ, সরকারের উপরের দুটি স্তরের সঙ্গে পঞ্চায়েতের সম্পর্ক গ্রামীণ শাসন কাঠামোর এগুলিই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভারতের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্রটিকে বুঝতেই পঞ্চায়েতের কাঠামোগত ও গঠনগত এইসব বৈশিষ্ট্যগুলিকে একে একে বর্তমান এককের আলোচনায় আনা হয়েছে। বর্তমান এককের আলোচনার সব শেষে গ্রামের সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে বর্তমান রাজনৈতিক ও শাসন কাঠামোর কোন সংযোগ আছে কিনা সে বিষয়ে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই আলোচনা শিক্ষার্থী পাঠককে পঞ্চায়েত শাসনের বাস্তব দিকটি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং এ বিষয়ে তাঁর নিজের মতামত সঞ্চয়ে ও প্রকাশে সাহায্য করবে।

৬.৩ গ্রাম শাসন কাঠামোর অর্থ ও তাৎপর্য

গ্রাম শাসনের মূল লক্ষ্য হল গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণ অর্থাৎ গ্রামের সাধারণ মানুষকে গ্রামের উন্নয়নের কাজকর্মে সচেতন ও সক্রিয় করে তোলা। গ্রাম যে, এখন আর নিছক পুরোনো গ্রাম নেই, গ্রামের সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামো যে বদলে গেছে তুলনামূলক সমাজতত্ত্ব, সামাজিক পুরাতত্ত্ব ও রাজনীতির গবেষকেরা সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গ্রামের শাসন বা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আজ আর অতীতের পাঁচজনের গ্রামীণ শাসন-পরিষদের (Village Council) হাতে নেই। বিবাদের নিষ্পত্তি করা বা সরকারের কর সংগ্রহের এজেন্ট হিসাবে একটি বিচ্ছিন্ন সংস্থা হিসাবে কাজ করা নয়, পঞ্চায়েত আজ প্রকৃত অর্থেই গ্রাম শাসনের এক গণতান্ত্রিক শক্তি। একটি বিচ্ছিন্ন ও সংকীর্ণ ভৌগলিক অঞ্চল হিসাবে নয়, জাতি-বর্ণ অধ্যুষিত কিছু পরিবার বা সমষ্টি নয়, গ্রামকে আজ দেখা হচ্ছে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অথচ বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসাবে, দেশের গণতান্ত্রিক শাসনের প্রাণশক্তি (Nucleus) হিসাবে। নির্বাচন, ভোটাধিকার, প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে গ্রাম শাসনে এসেছে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য ও কর্মতৎপরতা। বাইরে থেকে চাপানো কোন শাসন বা সংগঠন নয়, পঞ্চায়েত আজ প্রকৃত অর্থেই গ্রামের মানুষের নির্বাচিত সংগঠন। গ্রামের পরিকল্পনা, উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রামে গ্রামে সংযোগ ও সমন্বয়ের কাজে গ্রামের মানুষই পঞ্চায়েতের সাথী ও প্রেরণা। গ্রাম শাসন এখন পূর্বের মত কোন স্বেচ্ছাচারী শাসন বা মধ্যস্ততার (সালিসী) সংগঠন নয় বা সুবিধাভোগীদের শাসন-সংগঠন নয়। সাধারণ, গরীব মানুষই এর নিয়ন্ত্রক এবং ওর পেছনে আছে সংবিধানের ও আইনের সমর্থন এবং অবশ্যই গ্রাম সমাজের ব্যাপক সমর্থন ও অনুমোদন।

৬.৪ গ্রাম শাসন কাঠামোর রূপ

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে গ্রাম পঞ্চায়েত সংগঠনে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে এবং স্বায়ত্তশাসনের একক হিসাবে পঞ্চায়েত যাতে কাজ করতে পারে তার জন্য তাকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্পণ করবে এ ধরণের একটি নির্দেশ রাষ্ট্রকে দেওয়া হলেও সংবিধান চালু হবার পর প্রথম কয়েক বছর গ্রাম পঞ্চায়েত সংগঠনের ব্যাপারে তেমন কোন কার্যকরী উদ্যোগ চোখে পড়ে না। যদিও প্রায় ৮৩ হাজার গ্রামে গ্রাম পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব ছিল এবং

উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, রাজস্থান, কেরালা, হিমাচল প্রদেশ প্রায় সব রাজ্যেই কম-বেশি পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব ছিল, সাংগঠনিকভাবে বা কাঠামোর দিক থেকে এগুলি ছিল দুর্বল এবং সম্ভবত এই কারণেই এই সব পঞ্চায়েতগুলির অধিকাংশই কার্যকর ছিল না। স্ব-শাসনের কাঠামো হিসাবে নয়, পঞ্চায়েতগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাজ করেছে শাসক দলের প্রাদেশিক কমিটির অনুগত সংগঠন হিসাবে স্থানীয় ক্ষেত্রে শাসক দলের ক্ষমতার কেন্দ্র হিসাবে। কাঠামোগত ভাবে পঞ্চায়েত যে একটি নতুন ব্যবস্থা হতে পারে তা একেবারেই বোঝা গেল না, বরং এর মাধ্যমে বর্ণবৈষম্য, শ্রেণীগত প্রাধান্য, উপদলীয় লড়াই এসবই লক্ষ্য করা গেল। গ্রামীণ স্তরে পঞ্চায়েতের গুণগত উৎকর্ষ বা মূল্য সম্পর্কেও উৎসাহ সৃষ্টির কোন প্রচেষ্টা ছিল না। সরকারি স্তরে প্রশাসনিকভাবে সামান্য কিছু অস্থায়ী ব্যবস্থাপনার কথা ভাবা হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামের উৎপাদন কর্মসূচী ও উন্নয়নে পঞ্চায়েতের কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব আছে একথা বলা হওে একটি সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে না তুললে পঞ্চায়েত যে তার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম নয়, একথা ভাবা হল না। পরিচালনার কোন সংস্থা না থাকলে পৌর, উন্নয়নমূলক বা ভূমি সংস্কারের কাজে পঞ্চায়েতের মত একটি সংস্থা কার্যকর ভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অবশ্য একটি সুসংগঠিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে জেলা স্তরে পঞ্চায়েত সংগঠনের সুপারিশ করা হল এবং গ্রাম পঞ্চায়েতকে এর কার্যকরী আঙ্গিক সংস্থা হিসাবে গড়ে তোলার কথা বলা হল। তবে একটি স্বয়ংক্রিয় সংস্থা হিসাবে পঞ্চায়েত সংগঠনের সুপারিশ সর্বপ্রথম করেছে বলবন্ত রাই মেহতা কমিটি। বলবন্ত রাই মেহতা কমিটি সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার কাজে নিযুক্ত ব্লক প্রশাসনের কর্মী বা বিভিন্ন পরামর্শদান কমিটির সদস্যদের কাজে উৎসাহ ও দৃঢ় অঙ্গীকারের অভাব এবং অতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা লক্ষ্য করে এবং কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও অর্থের অভাব সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এর উপযুক্ত বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে একটি ত্রিস্তর ভিত্তিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সুপারিশ করে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতই ভারতে গ্রাম শাসনের বিভিন্ন স্তরের উপযুক্ত গণতান্ত্রিক কাঠামো হিসাবে বিবেচিত হল ঃ সর্বনিম্ন স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত, মধ্যবর্তী স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি ও সর্বোচ্চ স্তরে জেলা পরিষদ। বলবন্ত রাই মেহতা কমিটি পঞ্চায়েত সংগঠনে অন্য যে সব সুপারিশ করেছে তার মধ্যে অন্যতম হল পঞ্চায়েতকে একটি নির্বাচিত সংস্থা হিসাবে গুরুত্ব দান ও পঞ্চায়েতকে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে মর্যাদা দান।

সাময়িকভাবে পঞ্চায়েত সংগঠনে উৎসাহ এলেও এবং পশ্চিমবঙ্গ সহ অনেক রাজ্য এ ব্যাপারে আইনগত ও প্রশাসনিক উদ্যোগ নিলেও পঞ্চায়েত সংগঠনের অন্যান্য বিষয়গুলি, যেমন, পঞ্চায়েত নির্বাচন, পঞ্চায়েতের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্ব, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের সমন্বয়, পঞ্চায়েতের তহবিল—এই সব ক্ষেত্রগুলি অবহেলিত থেকে গেছে। পঞ্চায়েতের নির্বাচন ও নির্বাচিত প্রতিনিধি বা গণতান্ত্রিক কমিটিগুলির জায়গা নিয়েছে বিভিন্ন স্তরের মনোনীত সংস্থা (যেমন ব্লক পরামর্শদান কমিটি বা জেলা কাউন্সিল), সরকারি আমলা এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ও সংগঠন। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বদলে ছিল পরোক্ষ নির্বাচন, যে ক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলী ছিল প্রভাবশালীদের নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্র সংস্থা এবং কার্যনির্বাহী পদ বা কার্যালয় (Executive Office) ছিল ক্ষমতা আর পৃষ্ঠপোষকতার কেন্দ্র। কোন কোন ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের মধ্যবর্তী সংস্থা পঞ্চায়েত সমিতির সক্রিয়তা থাকলেও, জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রায় পরিত্যক্তই হয়েছে। পঞ্চায়েত স্তরে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের গুরুত্ব ছিল, সাধারণ মানুষের নয়। জেলা পরিষদ পরামর্শদাতা সংস্থার অধিক কিছু ছিল না। পঞ্চায়েতের কাজকর্মে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় বিভিন্ন স্তরের স্থায়ী কমিটিগুলি কিন্তু পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে কিছুটা এইসব কমিটির অস্তিত্ব থাকলেও, গ্রাম বা জেলা স্তরে এদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। পঞ্চায়েতের মধ্যবর্তী স্তরে প্রধান এবং ব্লক অফিসারের (বিকাশ অধিকারী) ক্ষমতা ও অহমিকার লড়াই এবং এই লড়াইয়ে ইন্ধন যুগিয়েছে গ্রামের প্রভাবশালী স্বার্থের মানুষ।

বলবন্ত রাই মেহতা কমিটির সদিচ্ছা থাকলেও প্রথম প্রজন্মের পঞ্চায়েত যে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী ছিল না এবং পঞ্চায়েতের মূল দর্শন (জন অংশগ্রহণ ও স্ব-শাসন) যে দীর্ঘকাল (প্রায় ১৫ বছর) অবহেলিত থেকেছে এবং পঞ্চায়েত যে ক্রমশ একটি স্থবির ও নিষ্ক্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে পাঠক এ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই ধারণা পেয়েছেন। এই পরিস্থিতি যে সত্তরের দশকের শেষার্ধ থেকেই বদলে গেছে এবং পঞ্চায়েতের সংগঠনে ও কাজকর্মে আবার যে জোয়ার এসেছে সে বিষয়েও পাঠক অবগত হয়েছেন। ১৯৭৭ সালে দীর্ঘকালের কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটে, জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসে এবং সরকার অশোক মেহতার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে এই কমিটির কাছে পঞ্চায়েতের পুনরুজ্জীবনের পন্থা ও পদ্ধতি বিষয়ে পরামর্শ নেয়। অশোক মেহতা কমিটির পরামর্শের ভিত্তিতেই ১৯৭৮ সাল থেকে শুরু হয় দ্বিতীয় প্রজন্মের পঞ্চায়েত সংগঠনের প্রস্তুতি। এর পরবর্তীকালে অবশ্য পঞ্চায়েত গঠন এবং গ্রাম শাসনের কাজকর্মে তেমন বাধা পড়েনি। অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশ মেনে রাজ্যে রাজ্যে নির্বাচিত পঞ্চায়েত গঠনের উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেছে। পঞ্চায়েত সংগঠনে পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, অন্ধ্র ও কর্ণাটক সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। সাংগঠনিকভাবে পঞ্চায়েতের এই অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তীকালে পঞ্চায়েত সাংবিধানিক মর্যাদাও লাভ করে। সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধনের পঞ্চায়েত সরকারের তৃতীয় ক্ষেত্র হিসাবে পরিচিত হয়। পঞ্চায়েত তার গঠনতান্ত্রিক ও কাঠামোগত সব বৈশিষ্ট্য নিয়েই ভারতের রাজনীতিতে একটি গঠনমূলক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সংবিধানে এই সংশোধনীয় পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও পঞ্চায়েত আইনের সংশোধনী এনে পঞ্চায়েতের কাঠামো ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে। কাঠামোগত যে সব ব্যবস্থা অশোক মেহতা কমিটি, ৭৩ তম সংবিধান সংশোধন আইন ও পশ্চিমবঙ্গের নতুন পঞ্চায়েত আইনে সংযোজিত হয়েছে পরবর্তী অংশের আলোচনায় তার উল্লেখ করা হয়েছে।

৬.৪.১ পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তর ও তাদের এলাকা

বলবন্ত রাই কমিটি পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরকে নির্দেশ করে নিচের স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত, মধ্যবর্তী স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি, এবং উপরের স্তরে জেলা পরিষদ। এই সুপারিশের উপর ভিত্তি করেই অধিকাংশ রাজ্যেই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ১৯৫৭ সালের মধ্যে প্রায় সব রাজ্যেই পঞ্চায়েত আইন হলেও এবং ৭৩ শতাংশ গ্রামে বিধিবদ্ধ পঞ্চায়েত গঠিত হলেও কোন রাজ্যেই স্ব-শাসিত সংস্থা হিসাবে পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব ছিল না। ১৯৫৯ সালের পর গ্রাম, ব্লক ও জেলা তিনটি স্তরে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা স্ব-শাসিত সংস্থা হিসাবে কাজ করতে শুরু করলেও তিনটি স্তরের কোনটিতেই প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত গঠিত হয়নি। এমনকি সব রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাও ছিল না। অধিকাংশ রাজ্যই উপরের ও নিচের অর্থাৎ জেলা ও গ্রাম পঞ্চায়েতের নমুনা গ্রহণ করলেও মধ্যবর্তী স্তরে কোন কোন রাজ্য গ্রহণ করেছে ব্লকের ধারণা, আবার মহিশ্রারের মত কোন কোন রাজ্যে মধ্যবর্তী স্তর ছিল তালুক। পশ্চিমবঙ্গে চার স্তরের পঞ্চায়েত ছিল। গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ। ১৯৫৭ সালের পঞ্চায়েত আইনে গ্রাম পঞ্চায়েত ও তার উপরে অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠনের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৬৩ সালের জেলা পরিষদ আইন অনুসারে ব্লক স্তরে আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা স্তরে জেলা পরিষদ গঠিত হল। অন্ধ্রপ্রদেশে ব্লককেই পঞ্চায়েতের মধ্যবর্তী স্তর হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

অশোক মেহতা কমিটি ত্রিস্তরের বদলে দ্বি-স্তর পঞ্চায়েতের সুপারিশ করেছে—উপরের স্তরে জেলা পরিষদ ও নিচের মণ্ডল পঞ্চায়েত। কর্ণাটকে অশোক মেহতা কমিটির রিপোর্ট মেনে নিচের স্তরে মণ্ডল পঞ্চায়েত ও উপরের স্তরে জেলা পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা হয়। মধ্যবর্তী স্তরে অবশ্য মনোনীত সংস্থা হিসাবে তালুক পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব ছিল। কেরালায় নাম্বুদ্রিপাদ এক স্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পক্ষে বললেও, ১৯৭৯ সালের আইন অনুসারে দ্বিস্তরের

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সুপারিশ হলেও ১৯৮৭ সালের আগে তা চালু করা সম্ভব হয় নি। এই দুটি স্তর ছিল —জেলা কাউন্সিল ও গ্রাম। অন্ধ্রে গঠিত হয় দ্বি-স্তর পঞ্চায়েত ঃ নিচের স্তরে মণ্ডল প্রজা পরিষদ ও উপরের স্তরে জেলা প্রজা পরিষদ। আসামে গ্রাম ও মহকুমা স্তরে, হরিয়ানায় গ্রাম ও ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সংগঠনের ব্যবস্থা হয়। পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনা হয়। ১৯৯২ সালে সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধনে সারা ভারতের জন্য মোটামুটি ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কাঠামোকেই গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। ১৯৯৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন রাজ্যে এই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরো সুদৃঢ় করেছে।

৬.৪.২ বিভিন্ন স্তরে পঞ্চায়েতের গঠন পদ্ধতি

বলবন্ত রাই মেহতা কমিটি সব রাজ্যের জন্য যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সুপারিশ করেছে তার গঠন পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

গ্রাম পঞ্চায়েত ঃ গ্রামের বিধানসভায় নির্বাচকেরা যে ১০—১৫ জনের কার্যনির্বাহী সংস্থা গঠন করে তাকে বলা হবে গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রামের নির্বাচিক মণ্ডলীকে বলা হবে গ্রাম সভা।[১]

পঞ্চায়েত সমিতি ঃ পঞ্চায়েত সমিতি গঠিত হবে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত প্রধান (প্রায় ৩০ থেকে ৪০ জনের মত) এবং কিছু সহযোজিত (Co-opted)[২] সদস্য ও যে নির্বাচনী এলাকায় ব্লক অবস্থিত সেই এলাকার বিধায়ক ও সদস্য দ্বারা।

জেলা পরিষদ ঃ জেলা পরিষদের সদস্য হবেন প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি (এদের পদাধিকার বলে সদস্য অর্থাৎ 'ex-officio member' বলা হয়), সহযোজিত কিছু সদস্য, জেলার বিধায়ক সভার ও লোক-সভার সদস্য এবং রাজ্য সরকারের নির্দেশমত জেলার বিধান পরিষদ ও রাজ্য সভার সদস্যবৃন্দ।

১। গ্রাম স্তরে পঞ্চায়েতের আকার সর্বত্র একরকমের নয়। কোথাও ৫০০ কোথাও বা ১,০০০ আবার কোথাও ৫,০০০ থেকে ১৫,০০০ জনসংখ্যার গ্রাম নিয়ে পঞ্চায়েত গঠিত। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার পঞ্চায়েতকে ওয়ার্ড ভিত্তিক ভাগ করা হয়। কেরালায় বৃহৎ পঞ্চায়েত ও পাঞ্জাবে ক্ষুদ্র পঞ্চায়েতের দৃষ্টান্ত আছে (বৃহৎ পঞ্চায়েতের জনসংখ্যা ন্যূনতম ৫,০০০ ক্ষুদ্র পঞ্চায়েতে অনধিক ৫০০)। কেরালায় গ্রামগুলি রাজস্ব গ্রাম (Revenue Village) নামে পরিচিত।

২। সহযোজিত সদস্য হিসাবে মহিলা, তফসিলী জাতি ও উপজাতি, প্রশাসন বিশেষজ্ঞ, সমাজসেবী প্রভৃতিদের মধ্য থেকে মনোনয়ন করা হয়।

অশোক মেহতা কমিটি যে দুই স্তর পঞ্চায়েতের সুপারিশ করেছে তার গঠন পদ্ধতি এইরকম ঃ

জেলা পঞ্চায়েত ঃ জেলায় নির্বাচিত প্রতিনিধি মণ্ডল পঞ্চায়েতের সভাপতি, বড় পৌর সংস্থাগুলির প্রতিনিধি, দুজন মহিলা, বর্তমান সভ্যদের দ্বারা মনোনীত দুজন সদস্য (Co-opt সদস্য), জেলায় সাংসদ, বিধায়ক ও বিধান পরিষদের সদস্য।

মণ্ডল পঞ্চায়েত ঃ নির্বাচিত ১৫জন সদস্য, কৃষক পরিষেবা সমিতির সদস্য, দুজন মহিলা Co-opted সদস্য। মণ্ডল পঞ্চায়েতের সীমা কয়েকটি গ্রাম ও ১৫ থেকে ২০ হাজার জনসংখ্যা। গ্রাম কমিটির মাধ্যমে গ্রামের মানুষ যুক্ত হবেন মণ্ডল পঞ্চায়েতে। গ্রাম থেকে নির্বাচিত পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদের সদস্য এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের প্রতিনিধি নিয়ে গ্রাম কমিটি গঠিত হবে।

সংবিধানের ৭৩তম সংশোধন আইনে গ্রামীণ ও মধ্যবর্তী স্তরে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত গঠনের কথা বলা হয়েছে। জেলা পরিষদেও রাজ্যের আইনসভার আইন মোতবেক নির্বাচনের ব্যবস্থা হবে বলা হয়েছে। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের কাঠামোর প্রশ্নে রাজ্য সরকারগুলিকে অবশ্য তাদের উপযোগী ব্যবস্থা নেবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

৬.৪.৩ পঞ্চায়েত নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন

ভারতে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থায় কাঠামোগত ও গঠনগত ক্ষেত্রে নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। পঞ্চায়েত আইনের প্রথম যুগে রাজ্যের পঞ্চায়েত আইনে যথাসম্ভব বেশি গ্রামকে বৈধ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অধীনে আনার কথা বলা হলেও, পঞ্চায়েত কোন স্বশাসিত সংস্থা হিসাবে গড়ে ওঠেনি। নির্বাচিত পঞ্চায়েত নয়, রাজ্য প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় নিযুক্ত পঞ্চায়েতই ছিল এই যুগের নীতি। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের মূল নীতি গণতান্ত্রিক পথে পঞ্চায়েত গঠনের সুযোগ এই সময় ছিল না। বলবন্ত রাই মেহতা কমিটির সুপারিশে নিচের স্তরে পঞ্চায়েত গঠনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কথা বলা হলেও মধ্যবর্তী ও জেলাস্তরে নির্বাচনের কথা বলা হয় নি। গ্রাম স্তরে গোপন জোটের মাধ্যমে নির্বাচন হলেও এই নির্বাচনে শাসক দল ও প্রভাবশালী জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য ছিল। এমনকি কোন কোন গ্রামে শাসক দলের প্রতিপত্তি এতটাই ছিল যে নির্বাচনে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় নি। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রভাবশালী প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। মধ্যবর্তী স্তরে নির্বাচন পরোক্ষ হওয়াতে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বা সরপঞ্চ (Sarpanch) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। নির্বাচিত না হয়েও এই পর্যায়ে বা জেলা পরিষদে আধিপত্য করার সুযোগ পেয়েছেন সাংসদ বা বিধায়কেরা। পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের প্রধান বা সভাপতি ক্ষমতা অনেকাংশেই নির্ভর করেছে তাঁদের স্থানীয় প্রতিপত্তি, বুদ্ধি ও দক্ষতা এবং অবশ্যই ব্যক্তিত্বের উপর। বহু রাজ্যেই সাংসদ, বিধায়ক বা কালেক্টর ও ব্লক আধিকারিকদের সঙ্গে তাদের বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে মধ্যবর্তী স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি ও তার সভাপতি প্রায় একচেটিয়া ভূ মিকা পালন করেছেন। সমস্ত স্থায়ী কমিটিগুলির সভাপতি হিসাবে এবং বি. ডি.ওকে তার অধীনস্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিক হিসাবে ব্যবহার করার সুযোগ তিনি গ্রহণ করেছেন। সমিতির সদস্য হিসাবে প্রভাবশালী বর্ণগোষ্ঠীর সদস্যদের ছিল পূর্ণ আধিপত্য। সমিতির সভাপতি প্রতিনিধিত্বের বদলে পৃষ্ঠপোষকতার নীতিতে বেশী আস্থাশীল ছিলেন। উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা সাধারণ মানুষদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা হয় নি।

পঞ্চায়েতে নেতৃত্বের প্রশ্নে, বা প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে গুরুত্ব পেয়েছে দলীয় আনুগত্য, বর্ণগোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য এবং অতীতের জমিদার সংগঠনের (যার কিছু অবশিষ্ট ছিল) সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ। পঞ্চায়েতে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব নয় প্রাধান্য পেয়েছে কর্তৃত্বমুখী শৃঙ্খলা বা স্তর বিন্যাসের প্রচলিত ধারা। গান্ধীজি বা জয় প্রকাশ নারায়ণের সাংগঠনিক চিন্তাভাবনাও কোন গুরুত্ব পায় নি। গ্রামের মানুষ বা কৃষকের আস্থা জাগানোর চেয়ে প্রশাসনিক সৌজন্য লাভ করার ইচ্ছাই ছিল পঞ্চায়েত নেতৃত্বের মধ্যে প্রবল। পরোক্ষ নির্বাচনের ক্ষতিকর দিকগুলি ছিল সরপঞ্চ বা প্রধানরা ঐকমত্যের ভিত্তিতেই নির্বাচিত হতেন। নির্বাচন হলে বিরোধী প্রার্থীর উপর নানা ধরনের বাধাবিপত্তি ও চাপ সৃষ্টি করা হত। পঞ্চায়েত আইনে সদস্য সহযোজনের যে নীতি ছিল অর্থাৎ মহিলা, তফসিলী জাতি ও দুর্বল ও অনগ্রসর মানুষদের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করা সেই নীতি মানা হত না। সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল গ্রামের বসবাসকারী মানুষেরা নন, সহযোজনের পদ্ধতিতে পঞ্চায়েত প্রতিনিধি হচ্ছেন শহরের মানুষ। সহযোজিত এইসব সদস্যদের হাজিরাও খুব আশাপ্রদ ছিল না। সমিতির অধিবেশনে সক্রিয় অংশগ্রহণ অর্থাৎ আলোচনা বা সিদ্ধান্তে অংশ নেওয়ার ব্যাপারেও এই সদস্যদের দ্বিধা ছিল।

অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নতুন যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বিভিন্ন রাজ্যে পুনর্গঠিত হয়েছে সেখানে নির্বাচন, নেতৃত্ব বা প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেছে. মণ্ডল পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে রাজনৈতিক বা দলীয় প্রতিনিধিরা এলেও প্রতিনিধিত্বের মানে এদের গ্রহণযোগ্যতা ছিল অধিক। জাতিভেদ বা বর্ণবৈষম্য, আমলাতান্ত্রিকতা, পৃষ্ঠপোষকতার নীতির চেয়ে নাগরিক পরিষেবা বা ন্যায্য বন্টনের নীতিকে এঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন। জেলা স্তরেও নেতৃত্বের ও প্রতিনিধিত্বের মান ছিল উঁচু। উন্নয়নের কাজে, স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহের কাজে বা পরিকল্পনার কাজে এঁদের উৎসাহ ছিল পূর্বের পঞ্চায়েত নেতৃত্বের চেয়ে অনেক বেশি। মহিলা নেতৃত্ব বা অনগ্রসর শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের মানও ছিল তুলনামূলকভাবে ভাল। পশ্চিমবঙ্গে, কেরালায়, কর্ণাটকে, অন্ধ্রপ্রদেশে ১৯৭৮ সালের পর দায়িত্বশীল ও স্বশাসিত পঞ্চায়েতের ভাবনা অধিক কার্যকর রূপ নেয়। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৮ সালের ৪ জুন নির্বাচনের মাধ্যমে ৩,২৪২টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৩২৪টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ১৫টি জেলা পরিষদ গঠিত হয়। এর পর থেকে আজ পর্যন্ত ৬ বার (সাম্প্রতিক নির্বাচন মে, ২০০৩)। নির্বাচন হয়েছে। ১৯৮৩ সালের সংশোধিত পঞ্চায়েত আইনে পঞ্চায়েতকে আরো গণমুখী ও সুসংহত করা হয়েছে। ১৯৯২ সালের আইনে নির্বাচন, আসন সংরক্ষণ, নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে আরো গণতান্ত্রিক হয়েছে। ৬ মাস অন্তর নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে আর্থিক ও প্রশাসনিক দায়বদ্ধতার ব্যবস্থা অবশ্যই অভিনব।

প্রান্তলিপি : পশ্চিমবঙ্গে ষষ্ঠ পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে ২০০৩ সালের ১১মে। মোট আসন ছিল জেলা পরিষদে ৭১৩, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৮,৫০০ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪৯,১৪৪। এর মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিষ্পত্তি হয়েছে জেলা পরিষদে ৩২, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৮৭২ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে ৫৩৭৯টি আসনে। ১৭টি জেলায় জেলা পরিষদের সংখ্যা ১৭, পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা ৩২৯ ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা প্রায় ৩,৩০০। বিগত প্রতিটি নির্বাচনেই 'বামফ্রন্ট' বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করেছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী বা প্রতিনিধিদের বয়স সম্পর্কে সব ক্ষেত্রে সঠিক ধারণা লাভ করা সম্ভব না হলেও তুলনামূলক ভাবে মধ্যবয়সী (৪০— ৫০ বৎসর), যুবকের (২৫— ৩৫ বৎসর) সংখ্যাই বেশি। প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা খুব কম ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট মানের বেশি নয়। নিরক্ষর, প্রাথমিক বা মধ্যমানের (অষ্টম শ্রেণী) প্রার্থীই বেশী। মহিলী প্রার্থীদের সংখ্যা পরবর্তীকালে বেড়েছে। প্রার্থীদের একটি বড় অংশ উচ্চ বর্ণগোষ্ঠীর মানুষ। এদের বেশীরভাগই জমির মালিক। জমির মালিকানা হীন, দরিদ্র প্রার্থীর ভোটে দাঁড়াবার ও জিতে আসার সুযোগ পরবর্তীকালে বেড়েছে। উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মানুষেরা প্রতিনিধিত্বের হার ৩৫:৬৫। সব প্রার্থীই অঞ্চলে পরিচিত বা সম্মানিত ব্যক্তি তা বলা যাবে না। পত্র পত্রিকা ও সমীক্ষার সূত্রেই প্রতিনিধি বা নেতার যোগ্যতা বা অবস্থান সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৮ সালের পর থেকে প্রতিটি নির্বাচনেই দলীয় শক্তি ও আনুগত্যের মাপকাঠিতে প্রার্থী বাছাই হয়েছে। উত্তরোত্তর প্রতিনিধির যোগ্যতা, নেতৃত্বের সামর্থ্য এবং নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠিতে ও প্রার্থী পছন্দের বিষয়টি যাচাই করা হয়েছে।

৬.৪.৪ পঞ্চায়েতের কার্যনির্বাহী সংস্থা, কর্মীবৃন্দ ও কার্যালয়

পঞ্চায়েতের কাঠামোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হল পঞ্চায়েতের কার্যনির্বাহী গোষ্ঠী (Exective Body) ও কর্মীবৃন্দ (Staff)। কার্যনির্বাহী গোষ্ঠীর মধ্যে পঞ্চায়েতে নিচের স্তরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন গ্রাম পঞ্চায়েতে মুখিয়া (Mukhiya) বা সরপঞ্চ (Sarpanch) বা প্রধান এবং উপ-মুখিয়া, উপ-সরপঞ্চ বা উপ-প্রধান। মধ্যবর্তী বা পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান কার্যনির্বাহী সভাপতি ও তাঁর সহকারী সহ-সভাপতি, জেলা পরিষদ স্তরে সভাপতি (সভাধিপতি), সহ-সভাপতি (সহ-সভাধিপতি) প্রধান কার্যনির্বাহী। বিভিন্ন স্তরে এঁরাই শাসনবিভাগীয় ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রধান কার্যপালিকা শক্তি। বিভিন্ন পরিকল্পনা

ও কর্মসূচীকে কার্যে রূপায়িত করা এঁদের প্রধান দায়িত্ব। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পূর্ত, কৃষি, সেচ, ত্রাণকার্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও তদারকির দায়িত্বে থাকেন বিভিন্ন স্তরের প্রধান বা সভাপতিগণ। সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসচী, দারিদ্র দূরীকরণ, গ্রামীণ প্রকল্পের রূপায়নে সভাপতিদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। পঞ্চায়েতের তহবিল গঠন, আর্থিক তদারকী ও বাজেট অনুমোদনেও এদের স্বাধীন ভূমিকা আছে। অতীতে নিজেদের কর্তব্য বা দায়িত্ব সম্পর্কে তেমন সচেতনতা এদের ছিল না, কিন্তু যতই স্ব-শাসিত সংস্থা হিসাবে পঞ্চায়েতের গুরুত্ব বেড়েছে, পঞ্চায়েতের গণতন্ত্রীকরণ ঘটেছে ততই বিভিন্ন স্তরের কার্যনির্বাহী সংস্থা ও তার প্রধানদের দায়িত্ব ও সচেতনতা বেড়েছে। অতীতে পঞ্চায়েত প্রধানরা বা পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের সভাপতিরা সব ক্ষেত্রে তাদের পদ ও দায়িত্বের পক্ষে যোগ্য ছিলেন না—প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত বা প্রশাসনিক যোগ্যতা তাদের ছিল না। এমনকি পঞ্চায়েত আইন বিষয়েও তাঁরা সচেতন বা অভিজ্ঞ ছিলেন না। প্রশাসনিক কাজে অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও ছিল না। বর্তমানে অবশ্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এদের অভিজ্ঞ করবার ব্যবস্থা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন স্তরে পঞ্চায়েত গঠনের পর, পঞ্চায়েত পরিচালনার দায়িত্ব কে পাবেন সে ব্যাপারে নানা মহলে উৎসাহ, উত্তেজনা থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কোন যোগ্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে পঞ্চায়েতের প্রধান হিসাবে মাথায় রেখেই নির্বাচনী প্রচার চলে। সন্দেহ নেই পঞ্চায়েত স্তরের যোগ্য নেতারা কালক্রমে রাজ্য ও জাতীয় স্তরেও রাজনীতিগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন।

পঞ্চায়েতের প্রধান বা উপ-প্রধান পদে নারী, তপসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। একই ব্যবস্থা পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে বিভিন্ন স্তরে নারী বা অনগ্রসর জাতির জন্য সংরক্ষণের এই নীতি সব ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের সংগঠনে সচিব অধিকারিক ও কর্মচারীদের নির্ধারিত দায়িত্ব আছে। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ সর্বস্তরেই সচিব (Secretary) হলেন কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ব্যক্তি এবং তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। সাধারণত রাজ্য সরকারের রচিত নিয়মশৃঙ্খলা ও বিধিনিয়ম সাপেক্ষে বিভিন্ন স্তরের প্রধান কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষের (প্রধান বা সভাপতি) নিয়ন্ত্রণাধীনে তাঁরা কাজ করেন এবং নিজ নিজ স্তরের পঞ্চায়েতের কাছে তাঁরা দায়ী থাকেন। পঞ্চায়েত সচিবের নিয়োগ, যোগ্যতা বা মর্যাদা, বেতন, প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অবশ্য সব রাজ্যে একই নিয়ম বা ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয় না। অতীতে সব রাজ্যে পূর্ণ সময়ের জন্য সচিব নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল না। আবার অনেক রাজ্যেই (উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব) সচিব সরকারি কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হলেও পঞ্চায়েতের নানা কাজে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিতেন। রাজস্ব আদায়, ন্যায় পঞ্চায়েতের কাজে সাহায্য এবং নানা পরিষেবামূলক কাজে সচিবকে গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিহারে পঞ্চায়েত সচিবকে গ্রাম সেবক বলা হত এবং উৎপাদন ও উন্নয়নের নানা ক্ষেত্রে তার বিশেষ দায়িত্ব ছিল । কেরালায় পঞ্চায়েত সচিবকে পঞ্চায়েতের কার্যনিবহী আধিকারিক বলা হত। অনেক ক্ষেত্রে (মাদ্রাজ) সব পঞ্চায়েতে সচিব নিয়োগ করা হত না। অধিক জনসংখ্যা বেষ্টিত ও অধিক সম্পদের অধিকারী গ্রামগুলিতে সচিব নিযুক্ত হতেন। ছোট পঞ্চায়েতের প্রাত্যহিক কাজকর্মের দায়িত্ব ছিল করণিকের (Clerk) হাতে। মহিশুরে পাটোয়ারী নামক কম বেতনের কর্মচারীর হাতে পঞ্চায়েতের দৈনন্দিন কাজকর্ম দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল। বর্তমানে অবশ্য প্রায় সব রাজ্যেই পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে পঞ্চায়েতের রেকর্ড ও অন্যান্য নথিপত্র রাখা, প্রধান বা সভাপতিকে প্রয়োজনীয় তথ্য যোগানো, কাগজপত্র তৈরি করা, প্রত্যেকটি কাজের ফাইল রক্ষণাবেক্ষণ, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে সংযোগ ও তথ্য আদান-প্রদানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের কথা ভেবে সচিব ও কর্মচারী নিয়োগের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা আছে এবং এ ব্যাপারে সরকারি অনুমোদনও পাওয়া যায়। পঞ্চায়েতের শৃঙ্খলা বিধানের উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত আইনে (১৯৭৩) দফাদার, চৌকিদার নিয়োগের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। পঞ্চায়েতকে তার কাজে সাহায্য ও শক্তি যোগানোর উদ্দেশ্যে কর্মচারী নিয়োগের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে অশোক মেহতা কমিটি ও

সংবিধানে ৭৩তম সংশোধনে। তার সচিব বা আধিকারিকের নিয়োগের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের নিজস্ব এক্তিয়ার থাকবে কিনা, স্ব-শাসনের জন্য পঞ্চায়েতের নিজস্ব কার্যালয় ও কর্মীর গুরুত্ব আছে কিনা, এই কর্মী এলাকার মধ্যে থেকে নিযুক্ত হবেন কিনা এগুলি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। গ্রাম স্তরে না হলেও, বর্তমানে মধ্যবর্তীও জেলা স্তরে প্রায় সব রাজ্যেই পঞ্চায়েতের কার্যালয় আছে। সব ক্ষেত্রে যে এইসব কার্যালয়গুলি সাজানো গোছানো তা বলা যাবে না। তবে পঞ্চায়েতের এই কার্যালয়গুলি যে নির্বাচনের সময় এবং বিভিন্ন গ্রামীণ কর্মসূচী রূপায়নের সময় মানুষের ভীড়ে, ব্যস্ততা ও কাজের তাগিদে যে উৎসাহের এক কেন্দ্র হয়ে ওঠে, প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে সে বিষয়ে অনেক গবেষকই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

৬.৪.৫ পঞ্চায়েতের কমিটি

পঞ্চায়েতের কাঠামোর আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের কমিটি। পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে অর্থ, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ, কৃষি, সেচ ও সমবায়, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, খাদ্য ও সরবরাহ, ত্রাণ ও জনকল্যাণ, বন ও ভূমি সংস্কার নানা ক্ষেত্রে স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) এবং এই সব কমিটির কর্মাধ্যক্ষ ও সচিব নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। এই সমস্ত স্থায়ী কমিটিগুলি সারা বছর ধরেই কাজ করবে এবং তাদের নির্ধারিত বা অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করবে বলা হয়েছে। অতীতে এইসব কমিটিগুলি রাজ্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে গঠন করা যাবে এবং রাজ্য সরকারই তাদের কাজের নিয়মবিধি স্থির করবেন এরকম ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য সরকারি আইনে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের দায়িত্বে নতুন মাত্রা আনা হয় এবং কমিটিগুলির গঠন প্রণালী ও কাজকর্মে নতুন গতি আনার চেষ্টা হয়। সাবেকি প্রভাবশীল নেতৃত্ব বা আমলারা নয়, পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও স্থানীয় উৎসাহী ও অভিজ্ঞ মানুষকে এর সদস্য করার প্রস্তাব হয়। সন্দেহ নেই কমিটিগুলির মাধ্যমে পঞ্চায়েতের দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রসারিত হয়েছে। আগে কমিটিগুলির অধিবেশন নিয়মিত বসত না বা বসলেও তা অল্প সময়কালের জন্য বসত। কমিটির সিদ্ধান্ত সরকারি আমলার অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে কমিটির বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিরাই মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, সরকারী অনুমতি বা অনুমোদনের কড়াকড়ি নেই। কমিটির সদস্যদের রাজনীতিবোধ ও দায়বদ্ধতা বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নে ও অন্যান্য কাজে অনেকটাই প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৭৮ সালের পর পঞ্চায়েতের কাজকর্মে যে রাজনৈতিক গতি এসেছে, পঞ্চায়েতের স্থায়ী সমিতিগুলির কাজকর্মে তা প্রতিফলিত হয়েছে।

৬.৪.৬ পঞ্চায়েতের রাজস্ব

পঞ্চায়েতের কাঠামোগত উদ্ভাবন ও সংহতির আরেকটি চিহ্ন তার তহবিল (Fund)। আর্থিক স্বয়ংভরতা ছাড়া একটি স্ব-শাসিত সংস্থা হিসেবে পঞ্চায়েতের পক্ষে কোনভাবেই কার্যকর ভূমিকা নেওয়া সম্ভব নয়। পূর্বে পঞ্চায়েত তার গুরুত্ব হারিয়েছিল যতটা না প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কারণে তার চেয়ে বেশি এর দুর্বল আর্থিক অবস্থানের কারণে। গ্রামীণ উৎপাদন প্রকল্প রচিত হয়েছিল বটে কিন্তু এর মূল্য কাগজে-কলমে বেশি ছিল না। এই প্রকল্পকে কার্যকর করার জন্য পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল ছিল না। প্রকল্পকে রূপায়িত করতে গেলে প্রয়োজন ছিল আর্থিক সাহায্য বা অনুদান। অনুদান বা ঋণ যা এসেছে তা দিয়ে সার, বীজ, ক্ষুদ্র সেচ এসবের যোগান সম্ভব হলেও, উৎপাদনের বৃহত্তম ক্ষেত্রে (পুকুর খনন, বড় সেচ, পাম্প কর্মী রক্ষণাবেক্ষণ) অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি। পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টি চেষ্টা হয় নি, কৃষক বা গ্রামের মানুষকেও উৎপাদনের কাজে উৎসাহিত করা যায় নি। পঞ্চায়েতের রাজস্ব বৃদ্ধির প্রয়াসেও ছিল শিথিলতা। কর আরোপ ও আদায়ের কাজে পঞ্চায়েত সমিতি কৃতিত্ব

কিছুই ছিল না। অধিকাংশ পঞ্চায়েত সমিতিই ভূমি রাজস্ব শিক্ষা, পেশা, মেলা ইত্যাদির উপর কর বা সেস চাপাতে ব্যর্থ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সমিতির প্রত্যাশিত বার্ষিক আয়ের নব্বই ভাগই আদায় করা যায় নি। স্থানীয় সম্পদ সমাবেশে পঞ্চায়েতের ব্যর্থতা ছিল প্রকট। সম্পদ সৃষ্টির জন্য করকে জনহিতকর কার্য বা স্থানীয় মানুষের উপকারের সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজন ছিল। মানুষের উপর স্থায়ী কর ধার্য না করে উন্নয়নের কিছু কিছু এলাকায়, যেমন বিদ্যালয় নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি কাজে কর আদায়ের ব্যবস্থা করা যেত। এরকম ব্যবস্থা হয় নি। সুতরাং এলাকার মানুষ কর দেবার ব্যাপারে ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। ভূমি রাজস্ব আদায় করা যায় নি, কারণ এই রাজস্ব কোন কাজে ব্যয় হবে সে ব্যাপারে করদাতারা সচেতন ছিলেন না। কর আদায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাতেও গলদ ছিল। উচ্চবিত্তরা পঞ্চায়েতের উপরই আস্থাশীল ছিলেন না, সুতরাং এর তহবিল সম্পর্কে এদের উৎসাহ ছিল। অন্যদিকে পঞ্চায়েতের নেতা বা আমলারা পঞ্চায়েতের সঞ্চিত সামান্য তহবিলেরও অপব্যয় করেছে। অর্থ আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীরাও (অধিকাংশ বহিরাগত সরকারী কর্মচারী) দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেনি।

পঞ্চায়েতের আর্থিক স্বয়ংভরতার ব্যাপারে অশোক মেহতা কমিটি গুরুত্ব দেয়। অশোক মেহতা কমিটি দীর্ঘকাল পঞ্চায়েতের অবক্ষয় ও এর ক্রমহ্রাসমান ভূমিকার পেছনে যে সব কারণ চিহ্নিত করেছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল পঞ্চায়েতের আর্থিক অসামর্থ্য। অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই ১৯৭৮ সালের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সহ অধিকাংশ রাজ্যে (অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে অন্যতম কর্ণাটক, কেরালা ও অন্ধ্র) পঞ্চায়েতের আর্থিক স্বয়ংভরতা আনার চেষ্টা হল। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৩ সালের সংশোধিত পঞ্চায়েত আইনে পঞ্চায়েতকে কয়েক ক্ষেত্রে সক্রিয় করার কথা ভাবা হল ঃ (১) সরকারি প্রকল্প রূপায়নের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টির দিকে নজর দেওয়া। এ ব্যাপারে সরকারের কৃষি বিভাগ, ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প বিভাগের ও শিক্ষা বিভাগের সহায়তায় পঞ্চায়েত সেচ প্রকল্প কৃষি উপাদান সংগ্রহ, খাদ্য প্রক্রিয়া, গ্রামীণ কর্মসংস্থান ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে নিজের আর্থিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। (২) গ্রামীণ সম্পদ পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে নিজের সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে নজর দেবে। (৩) কর ধার্য ও শুল্ক আদায়ের প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতাও পঞ্চায়েত পাবে। লাইসেন্স ফি, বাজার, রাস্তা ও যান-বাহনের উপর উপ-শুল্ক বসাবার ক্ষমতাও পঞ্চায়েতের আছে। পঞ্চায়েত এখন সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে ঋণ নিতে পারে। ১৯৯২ সালের আইনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের আয়ের সূত্র বৃদ্ধির ব্যবস্থা হল। কর ও শুল্ক ধার্যের সঙ্গে পঞ্চায়েতে বাড়ী নির্মাণের অনুমোদন ও সুসংহত নগরায়ন পরিকল্পনার দায়িত্ব পেল। একই সঙ্গে পঞ্চায়েতের হিসাব পরীক্ষা ও অডিটে ব্যবস্থা হল। পঞ্চায়েতে যাতে আর্থিক অপচয় বা অনিয়ম না হয় তা নিয়ন্ত্রণের জন্য অর্থ কমিশন গঠন ও অডিটর নিয়োগের ব্যবস্থা আছে।

৬.৪.৭ পঞ্চায়েত, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার

ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পঞ্চায়েত গঠনের ব্যাপারে কমিটি গঠন করে সুপারিশ নেওয়া হয়েছে। বলবন্ত রাও মেহতা কমিটি বা অশোক মেহতা কমিটির প্রস্তাবগুলি ছিল রীতিমত অভিনব ও বৈপ্লবিক। বলবন্ত রাই মেহতা কমিটির সুপারিশ মেনেই রাজ্যে রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়। তবে ১৯৫৯-৬৫ এই বছরগুলির পরে আর পঞ্চায়েত সক্রিয় ছিল না। এর একটি কারণ ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে গ্রামীণ উন্নয়নের বিকল্প কর্মসূচী গ্রহণ। এই কর্মসূচীগুলিকে পঞ্চায়েতের কাজের সঙ্গে যুক্ত করার কোন উদ্যোগ ছিল না, বরং ওগুলিকে পঞ্চায়েতের প্রতিযোগী কর্মকাণ্ড হিসাবে ভাবা হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলিও পঞ্চায়েত সংগঠনে বা প্রসারে নিজস্বভাবে উদ্যোগী হয় নি। ১৯৬৫ সালের পর থেকে প্রশাসনিকভাবে পঞ্চায়েতকে একরকম নিষ্ক্রিয় করে তোলার প্রবণতাই লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চায়েতের কাজকর্মে প্রশাসনিক সহায়তা দেবার বদলে প্রশাসনিক তদন্ত

বাড়াবাড়ি রকমের প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ হয়েছে। সরকারি আইনে পঞ্চায়েতকে আইনগত প্রশাসনিক বা আর্থিক নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে বেশি এবং পঞ্চায়েত সম্পর্কে উৎসাহের চেয়ে সতর্কতা ছিল বেশি। এই পর্বে রাজস্ব আধিকারিক (Revenue Officer), রাজস্ব আদায়কারী (Revenue Collector), সরকারি হিসাবরক্ষক ও পরীক্ষক (Government Accountant and Auditor), ইন্সপেক্টর পঞ্চায়েতের কাজে সতর্ক নজর রেখেছে। তবে নজরদারীর ব্যবস্থা যে সব রাজ্যে সমান ছিল বা সন্তোষজনক ছিল তা বলা যাবে না। আয়-ব্যয় রক্ষণাবেক্ষণে বা পরীক্ষায় সতর্কতার ব্যবস্থা পঞ্চায়েতের সুষ্ঠু কাজকর্মের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর, কিন্তু অন্যান্য হস্তক্ষেপ বা সতর্কতা ভাল নয়। রাজ্য সরকারগুলির তরফে এটাই হয়েছে এবং স্ব-শাসিত সংস্থা হিসাবে পঞ্চায়েত ক্রমশই তার মূল্য হারিয়েছে। ১৯৭৮ সালের পর অবশ্য পঞ্চায়েতকে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে আবার স্ব-ভূমিকায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ হয়েছে এবং অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশ মেনে কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চায়েতকে রাজ্যে রাজ্যে বলীয়ান ও গণতান্ত্রিক করার উৎসাহ দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার চেয়েছে পঞ্চায়েতকে কাঠামোগতভাবে আরো মজবুত করা হোক, পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে একে যুক্ত করা হোক, স্থানীয় উন্নয়নের কাজে স্থানীয় মানুষকেই পঞ্চায়েতের নের্তৃত্বে সমবেত করা হোক। কেন্দ্রীয় সরকারের উৎসাহে আর রাজ্য সরকারগুলির উদ্যোগে (এ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ছিল অগ্রণী) ১৯৮০ সালের পর থেকে কাঠামো ও কার্যগতভাবে পঞ্চায়েত অনেক বেশি কার্যকর হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়ের তরফেই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক ভিত্তি দেবার আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখা গেল। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে 'নিচ থেকে পরিকল্পনা' (Planning from Below) গ্রহণ ও রূপায়ণের ব্যবস্থা হল, স্থানীয় পরিকল্পনা কমিটিতে অগ্রাধিকার পেলেন পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। জেলা পরিকল্পনা ও সমন্বয় পরিষদে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি (জেলার প্রতিটি ব্লকের), জেলা পরিষদের স্থায়ী কমিটির কর্মাধ্যক্ষগণ স্থান পেলেন এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি হলেন এর সহ-সভাপতি। জেলা পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি হলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি। সব রাজ্যে এই ব্যবস্থা সমানভাবে কার্যকর না হলেও এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে চাপ এসেছে। এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট ও চাপের কাছে নতি স্বীকার করেই রাজ্যে রাজ্যে পঞ্চায়েতকে সংগঠিত করার জন্য আইন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৩ সালের সংশোধিত পঞ্চায়েত আইন এ ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করেছে। কেন্দ্রের জনতা সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত সম্পর্কে নতুন ভাবনা কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ও রাজ্য সরকারগুলিকে এক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনে বাধ্য করেছে। আশির দশক থেকে প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক ভাবে পঞ্চায়েত নব মর্যাদা দেবার প্রেক্ষাপট এটাই। ১৯৮০ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং পঞ্চায়েত এই তিনটি ক্ষেত্র ও শক্তির সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেসব সমন্বয়ী দৃষ্টি কাজ করেছে এগুলি হল (১) বিকেন্দ্রিক পরিকল্পনা কাঠামো (২) উৎপাদন ও উন্নয়নে ভারসাম্য বিধান (৩) গ্রামে ন্যায়বিচার (বন্টনমূলক ন্যায়) প্রতিষ্ঠা ও অসাম্য দূরীকরণ (৪) গ্রামীণ উন্নয়নের কেন্দ্রীয় কর্মসূচীগুলির রূপায়ণে সমবেত উদ্যোগ (৫) পঞ্চায়েতকে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্মে ভারসাম্য আনা (৬) গ্রামের উন্নয়নের পরিকাঠামো সৃষ্টি (৭) সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও কমিটিগুলির কাজে সমতা আনা এবং বিধিনিষেধের (আর্থিক আইনগত) এবং নিয়ন্ত্রণের (আমলাতান্ত্রিক) বাধা অপসারণ।

আধিকাংশ রাজ্যেই বর্তমানে পঞ্চায়েতের কাজকর্মে কেন্দ্র ও রাজ্যের মন্ত্রণালয় বা দপ্তরগুলির উপর নির্ভরতা নয়, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ব্লক অফিসারের কাছে দায়িত্বশীলতা নয়, পঞ্চায়েতের সদস্য, কর্মী, আধিকারিক ও সমিতির (কমিটি) সদস্যদের দায়িত্ব বেড়েছে এবং পঞ্চায়েতের দায়িত্বশীলতা বেড়েছে নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে সরকারী অফিসারের তদারকী বা নজরদারী নয়, পঞ্চায়েতের উপর এখন নজরদারীর ব্যবস্থা হয়েছে গ্রাম সভা আর গ্রাম সংসদের মাধ্যমে। পঞ্চায়েতের আর্থিক নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব এখন সরকারের নয়, অর্থ কমিশনের।

৬.৪.৮ পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের সমন্বয়

১৯৫৭ থেকে ১৯৭৮-এই পর্বে পঞ্চায়েত ছিল বটে, কিন্তু পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের কাজকর্মে কোন সমন্বয় ছিল না। ১৯৫৮ সালে বলবন্ত রাই মেহতা কমিটি যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সুপারিশ করে সেখানে পঞ্চায়েতের নিম্ন, মধ্যবর্তী ও উচ্চ এই তিনটি স্তরের কাঠামো ও কার্যবিন্যাসে একটি সমতা থাকবে বলে আশা করা হয়েছিল। প্রতিটি স্তরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, স্ব-শাসন, আর্থিক স্বাধীনতার নীতি কার্যকর হবে বলে প্রত্যাশা করা হলেও, বিন্যাস বা কাজের ক্ষেত্রে বাস্তবে কোন একরূপতা ছিল না, বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যোগাযোগ সমন্বয়ও ছিল না। যেমন, অনেক রাজ্যে ত্রিস্তর কাঠামোও মানা হয় নি। দেখা গেছে কোন কোন রাজ্যে গ্রাম স্তরে প্রত্যক্ষ নির্বাচন হলেও অন্য দুটি স্তরে নির্বাচন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে হয় নি। কোথাও আবার পঞ্চায়েতের মধ্যবর্তী স্তর যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, উপরের স্তর তেমন গুরুত্ব পায় নি। অনেক রাজ্যেই পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থায় গ্রাম সভা তার প্রয়োজনীয় গুরুত্ব পায় নি। আর্থিক স্বয়ংভরতার ব্যাপারেও প্রায় পঞ্চায়েতের অবস্থান ছিল নগণ্য। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের মূল লক্ষ্য উন্নয়নের নানা কাজে জনসাধারণের অংশগ্রহণ সব স্তরে সমানভাবে সাফল্য পায় নি। সব স্তরে সমানভাবে উৎপাদন, গ্রামীণ শিল্প, সমবায় সংগঠনের কাজে পঞ্চায়েতের উদ্যোগ সমান ছিল না। স্থানীয় মানব সম্পদ ও অন্যান্য সম্পদকেও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সব স্তরের পঞ্চায়েতে কাজের গতি সমান ছিল না। স্বভাবতই পঞ্চায়েতের সংহতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। দুর্বল শ্রেণী, মহিলা বা অনগ্রসর শ্রেণীরাও পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরে সমান সুযোগ-সুবিধা পায় নি বা প্রতিনিধিত্বের অধিকার পায় নি। তিনটি স্তরের মধ্যে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এতকাল সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অস্পষ্ট। বিভিন্ন, স্তরের পঞ্চায়েতের আকার, নির্বাচন পদ্ধতি, নেতৃত্ব ও তাদের যোগ্যতা, কার্যালয় বা কর্মী এমন কি কাজের বন্টন সম্পর্কেও সরকারের দৃষ্টি স্বচ্ছ ছিল না। উপরের স্তরের পঞ্চায়েতের কাছে নিচের স্তরের পঞ্চায়েতের দায়িত্ব কী বা নিচের স্তরের পঞ্চায়েতের উপর স্তরের পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণ কতটা সে বিষয়েও কোন স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। সামগ্রিকভাবে জেলার পরিকল্পনায় বা স্থানীয়ভাবে পঞ্চায়েতের উৎপাদন বা উন্নয়ন প্রকল্পে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের ভূমিকার অবদান বা পারস্পরিক সাহায্য সহায়তার ধারা কী হবে সেটাও বোধগম্য ছিল না। গ্রামের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ আর্থিক বা প্রশাসনিকভাবে কী সহায়তা করতে পারে সেটাও ব্যাখ্যা করা হয় নি। এর ফলে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরগুলি নিজস্ব ঘেরাটোপেই কাজ করেছে। রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার ক্ষেত্রেও পঞ্চায়েতের উপরের স্তরগুলির সুবিধা ছিল বেশি।

১৯৮০ সালের পর পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার সামগ্রিক গুরুত্ব বেড়ে যায়। এ ব্যাপারে অশোক মেহতা কমিটির প্রস্তাব গুরুত্বপূর্ণ। এই কমিটির প্রস্তাবেই পঞ্চায়েতকে আরো সংহত করার বিভিন্ন স্তরের পঞ্চায়েতের কাঠামো ও কাজে ভারসাম্য রক্ষার নীতি গুরুত্ব পায়। পশ্চিমবঙ্গসহ বেশ কিছু রাজ্যের পঞ্চায়েত আইনে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্ক ও সমন্বয়ের প্রশ্নটি গুরুত্ব পায়। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের কাজে সমন্বয় আনার জন্য যে সব ব্যবস্থাগুলি গুরুত্ব পায় তার মধ্যে অন্যতম হল : (১) সমন্বয়ের মূল স্তর হিসাবে পঞ্চায়েত সমিতিকে দায়িত্বদান। উপর ও নিচের স্তরের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে পঞ্চায়েত সমিতি, (২) পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে পরিকল্পনার সমন্বয়। এই সমন্বয়ের কাজে জেলা পরিকল্পনা কমিটিকে বিশেষ দায়িত্বদান। (৩) বিভিন্ন স্তরের স্থায়ী কমিটিগুলির কাজে সমন্বয় আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। (৪) রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক, গ্রামীণ উন্নয়নের কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলিও পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে সংযোগ ও সমন্বয়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে সমন্বয় আনার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত গঠনমূলক। অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেগু দেশম সরকার, কর্ণাটকে হেগড়ের নেতৃত্বে সরকার এবং

কেরালার বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট পঞ্চায়েত সংগঠন ও সমন্বয়ের কাজে উল্লেখযোগ্য সংস্কার এনেছে। পঞ্চায়েতের কর্মকাণ্ডে এই সংস্কার ও সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গী অন্যান্য রাজ্যকেও প্রভাবিত করেছে।

৬.৫ পঞ্চায়েত ও গ্রামের সামাজিক কাঠামো

প্রায় সব রাজ্যেই পঞ্চায়েত হবে গ্রামের মানুষের প্রতিনিধি সংস্থা এবং পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গ্রামের মানুষের দ্বারাই নির্বাচিত হবেন পঞ্চায়েতের এটাই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক। বেশীরভাগ রাজ্যেই মনোনীত পঞ্চায়েত ১৯৫৫-৫৬ এবং ১৯৬৩ সালের আইনের বলে একটি বিধিবদ্ধ নির্বাচিত সংস্থায় রূপান্তরিত হবে এবং পঞ্চায়েতে সাধারণ মানুষ, কম সুবিধাভোগী ও অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ থাকবে এটা আসা করা হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খা ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সরল গতি যে ভারতের মত জটিল ও অনমনীয় সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে মানানসই হয়ে উঠতে পারবে না, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের লক্ষ্য যে ভারতের অনড় সামাজিক কাঠামোর বাধাপ্রাপ্ত হবে স্বাধীনতার পঞ্চান্ন বছরের পরেও এদেশের মানুষ সেটা বুঝে উঠতে পারে নি। পঞ্চায়েতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে এদেশের সামাজিক কাঠামোর বিরাট ব্যবধান থেকেই গেছে। গণতান্ত্রিক পঞ্চায়েত কাঠামোর বৈশিষ্ট্য হল—(১) পঞ্চায়েতে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, (২) অনগ্রসর শ্রেণীর পক্ষে আইনগত ব্যবস্থা, (৩) পঞ্চায়েতে নারীর উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব ও সক্রিয় অংশগ্রহণ, (৪) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষেবায় পঞ্চায়েতের ধারাবাহিক অঙ্গীকার এবং পঞ্চায়েতের কাজেকর্মে সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রতিফলন এবং (৫) পঞ্চায়েতের প্রশাসন ও পরিচালনায় প্রকৃত গণতান্ত্রিক নীতির প্রয়োগ অর্থাৎ জনমুখী, সৎ ও দক্ষ প্রশাসন। পঞ্চায়েতকে প্রতিষ্ঠানগতভাবে গণতান্ত্রিক করে তুলতে আর একটি বিষয়ও জরুরী। এটা হল কৃষক, কারিগর এবং সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে পঞ্চায়েতের নেতৃত্বের সন্ধান এবং এ ব্যাপারে তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া। গণতান্ত্রিক পঞ্চায়েত কাঠামো সৃষ্টির এই প্রচেষ্টায় বার বার বাধা এসেছে এদেশের প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা ও কাঠামোর প্রতিকূল পরিবেশ ও শক্তি থেকে। প্রতিকূল সামাজিক কাঠামো ও শক্তির সূত্র হল : (১) পূর্বতন জমিদার ও বিত্তশালী, মানুষেরাই আজও ক্ষমতার দুর্গ বা আশ্রয়স্থল। ক্ষমতার এই দুর্গে সাধারণ মানুষের প্রবেশের সুযোগ বা সুবিধা নেই (২) রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিজোট গ্রামের সামাজিক-আর্থিক পরিবর্তনের পথে বাধা সৃষ্টি করে। জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়, নারী-পুরুষের ভেদাভেদকে গ্রামে অতিক্রম করা সম্ভব নয় (৩) রাজনৈতিক মতাদর্শ, বিপ্লবী আদর্শ, পরিবর্তনকামী শক্তির প্রভাব গ্রামে কম। (৪) পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত মাধ্যমগুলি, উন্নয়নের সুবিধাগুলি গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছয় নি। স্বভাবতই সমাজ কাঠামোর উপর পরিবর্তনের কোন প্রভাব পড়ে নি।

সাবেকি প্রভাবশালী গোষ্ঠী এবং নতুন পরিবর্তনকামী গোষ্ঠীর মধ্যে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান, এই ব্যবধান দূর করার জন্য চাপ দেওয়া বা সমভাব আনার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির অভাব, প্রতিষ্ঠানগত সংস্কার বা প্রচারের বিক্ষিপ্ত অবস্থান—এইসব কারণেই গণতান্ত্রিক, আইনগত ও সাংবিধানিক সুযোগ-সুবিধা আর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে শেষ পর্যন্ত এই প্রতিকূল সামাজিক কাঠামো ও সাবেকি ক্ষমতার কাঠামোকে যে অপসারণ করা বা ভেঙে ফেলা সম্ভব আশির দশকের পরবর্তীকালের রাজনৈতিক আর্থিক পরিবর্তনগুলি তার প্রমাণ। পঞ্চায়েত সংগঠনে ও কাঠামোয় এই পরিবর্তনের ছাপ স্পষ্ট হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক রাজনীতিকরণের মধ্য দিয়ে এবং অন্যান্য রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পঞ্চায়েতকে সাংবিধানিক মর্যাদা দান (সংবিধানের ৭৩তম সংশোধন) এদেশে

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাফল্য ও অগ্রগতির সূচক। কাঠামোগত যতই পঞ্চায়েত গণতান্ত্রিক ও আধুনিক হয়ে উঠবে ততই এর সামাজিক প্রতিকূলতা ও স্থবিরত্ব কেটে যাবে। দ্বিতীয় প্রজন্মের পঞ্চায়েত এর প্রমাণ রেখেছে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের আর্থিক অসাম্য দূর হলে, গ্রামে পেশাগত (কর্মগত) সচলতা এলে, গ্রামের কাঠামোগত ও পরিকাঠামোগত উন্নতি হলে, যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে কাঠামোগত সংযোগ ও ভারসাম্য সৃষ্টি হলে, গ্রামের সঙ্গে শহরের সংযোগহীনতা কমে এলেও ভারসাম্য বৃদ্ধি পেলে এবং সর্বোপরি গ্রাম সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংস্কারে গতি এলেই সামাজিক ও শাসন কাঠামো হিসাবে পঞ্চায়েতের সাফল্য সূচিত হবে।

৬.৬ সারাংশ

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ভারতে গ্রাম শাসনের কাঠামোকে রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে। গ্রাম শাসন আজ পাঁচজনের এক সংস্থা নয় বা মানুষের বিবাদ নিষ্পত্তির, শান্তি-শৃঙ্খলা তদারকির কোন সংগঠন নয়, উৎপাদন, পরিকল্পনা, সামাজিক-আর্থিক পরিষেবার এক প্রসারিত, গণতান্ত্রিক কাঠামো। বর্তমানে এর পরিচয় পঞ্চায়েতী-রাজ হিসাবে। তিনটি স্তরে পরিব্যাপ্ত এর কাঠামো—গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ যথাক্রমে এর গ্রাম ব্লক ও জেলা স্তরের কাঠামো। গ্রাম সভা হল গ্রামের নির্বাচক মণ্ডলী। বলবন্ত রাই মেহতা কমিটি গ্রাম স্তরে প্রত্যক্ষ ও উপরের দুই স্তরে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির সুপারিশ করেছে। অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশে নিচের স্তরে (মণ্ডল পঞ্চায়েত) প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও জেলা স্তরে মনোনয়ন ব্যবস্থায় সুপারিশ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৩ সালের আইনে তিনটি স্তরেই নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়েছে। এই আইন মেনেই এখানে আজ পর্যন্ত ছটি পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে। পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের মধ্যে নির্বাচিত ছাড়াও সহযোজনের পদ্ধতিতে নারী, অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ ইত্যাদির মধ্য থেকে পঞ্চায়েতের সদস্য করার ব্যবস্থা আছে। আগের চেয়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা যে প্রসারিত হয়েছে তার একটি বড় প্রমাণ পঞ্চায়েতের কমিটি ব্যবস্থা ও পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল গড়ার ব্যবস্থা। রাজ্য সরকারের অনুদান ছাড়াও পঞ্চায়েত এখন ভূমি রাজস্ব, দোকান ও বাজার থেকে আদায়ীকৃত শুল্ক, পথ কর, যানবাহনের জন্য কর এবং ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে তহবিল গঠন করতে পারে। পূর্বে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে সংযোগ বা সমন্বয়ের ব্যবস্থা যতটা ক্ষীণ ছিল আজ আর তা নেই। এখন পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিকল্পনা কমিটি, সরকারি মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক, বিভিন্ন স্তরের স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় সমন্বয় আনা হয়। পঞ্চায়েতের ওপর ১৯৮০ সালের পূর্বে সরকারি নজরদারী ও নিয়ন্ত্রণ ছিল খুব বেশী। তবে পরবর্তীকালে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল না। পঞ্চায়েতকে সাহায্য করা, উৎসাহ দেওয়ার ক্ষেত্রেই সরকার এগিয়ে এসেছে। বিশেষ কারণে পঞ্চায়েতের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ যে থাকা দরকার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে পঞ্চায়েত সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী অনেক স্বচ্ছ ও গঠনমূলক। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগেই বলবন্ত রাই মেহতা কমিটি, অশোক মেহতা কমিটি গড়ে তোলা হয়। পঞ্চায়েতের সাংবিধানিক মর্যাদা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের অবদান আছে। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের প্রসারে সরকার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে প্রশাসনিক কর্মতৎপরতাকে জুড়ে দিয়েছে। পঞ্চায়েত সম্পর্কে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন পঞ্চায়েতের গণতন্ত্রীকরণের প্রয়াস কী, এদেশের জটিল, অনমনীয়, অনড় সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রচলিত সামাজিক কাঠামোর মধ্যে যে পঞ্চায়েতকে কার্যকর বা সফল করা যাবে না, তা বলাই বাহুল্য। তবে ক্রমশ সামাজিক কাঠামোর প্রতিকূলতা যে কেটে যাবে এবং এ ব্যাপারে রাজনৈতিক উদ্যোগ আর সংস্কারের মানসিকতা চাই।

৬.৭ অনুশীলনী

১। একটি বা দুটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

ক। গ্রাম শাসন বলতে প্রকৃত অর্থে কী বোঝায় ?

খ। গ্রামে শাসন কাঠামোর চারটি প্রধান দিক নির্দেশ করুন।

গ। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরগুলি কী কী ?

ঘ। গ্রাম পঞ্চায়েত বলতে কী বোঝেন ?

ঙ। পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিত্ব বা নেতৃত্বের দুটি আদর্শকে চিহ্নিত করুন।

চ। পঞ্চায়েতে উপযুক্ত নেতৃত্বের বাধা বা প্রতিকূলতা কী ?

ছ। পঞ্চায়েতের কার্যনির্বাহী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝেন ?

জ। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের প্রধান কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষ কে ?

ঝ। পঞ্চায়েতের কয়েকটি কমিটির নাম করুন।

ঞ। পঞ্চায়েতের তহবিলের সূত্র কী ?

সংক্ষেপে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন (৫০—৬০ শব্দের মধ্যে) ঃ

ক। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরগুলির গঠন পদ্ধতি উল্লেখ করুন।

খ। পঞ্চায়েতের কমিটি ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

গ। পঞ্চায়েতের নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

ঘ। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরগুলির সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রধান অসুবিধা কী ? সমন্বয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি বা মাধ্যমগুলি কী কী ?

ঙ। পঞ্চায়েতের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৩। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন ঃ

ক। পঞ্চায়েতের কাঠামোগত বিভিন্ন উপাদানগুলি কী কী ? পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের গঠনপদ্ধতি উল্লেখ করুন। বিভিন্ন স্তরের যোগাযোগের পদ্ধতিগুলি কী কী ?

খ। পঞ্চায়েতের তহবিল ও কমিটি ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

গ। পঞ্চায়েতের কাঠামো বিষয়ে একটি টীকা লিখুন।

ঘ। ভারতে পঞ্চায়েত কাঠামো ও সামাজিক কাঠামোর সম্পর্ক আলোচনা করুন।

ঙ। পঞ্চায়েতের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক বিষয়ে মন্তব্য ও আলোচনা করুন।

৬.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। A. R. Desai : Rural Sociology in India (1978).

২। Subhash C. Kashyap (ed) **Perspectives on the constitution of India.**

৩। অমিত বসু : পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত আইন (১৯৯৪)।

৪। দেবাশিস চক্রবর্তী: গণপ্রশাসন, পরিচালন ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা (১৯৯৫)।

একক ৭ □ গ্রামীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য

৭.২ প্রস্তাবনা

৭.৩ গ্রামীণ রাজনীতির প্রচলিত গতি

৭.৩.১ গ্রামের রাজনীতিতে গান্ধীজির ভাবনার প্রয়োগ : বিনোবা ভাবে ও জয়প্রকাশ নারায়ণের দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংগঠনিক কাজ

৭.৩.২ গ্রামীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া : কংগ্রেসের ভূমিকা

৭.৪ গ্রামীণ রাজনীতির রূপান্তর : জনতা সরকার এবং কমিউনিষ্ট ও বামপন্থী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্যোগ

৭.৫ গ্রামীণ রাজনীতির রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে পঞ্চায়েত : পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা

৭.৫.১ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত : ১৯৭৩ সালের আইন ও সরকারি ব্যবস্থা

৭.৫.২ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা : আশির দশক

৭.৫.৩ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত : ১৯৯২ সালের আইন ও ব্যবস্থা

৭.৬ পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া : বাস্তব ও সাম্প্রতিক চিত্র

৭.৭ পঞ্চায়েত : সাম্প্রতিক সর্বভারতীয় রাজনৈতিক চিত্র

৭.৮ সারাংশ

৭.৯ অনুশীলনী

৭.১০ গ্রন্থপঞ্জি

৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককের পাঠ থেকে —

- ভারতের গ্রামীণ রাজনীতির প্রচলিত ধারা ও রূপান্তর সম্পর্কে শিক্ষার্থী পাঠক কিছু ধারণা পাবেন।
- ভারতের গ্রামীণ রাজনীতির রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে পঞ্চায়েতের পরিবর্তিত অবস্থানকে চিহ্নিত করতে পারবেন।
- পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের সংগঠনে ও কাজে যে নতুন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হয়েছে এবং গ্রামীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার যে নতুন ধারার প্রসার ঘটেছে সে বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন।
- পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পঞ্চায়েতের বাস্তব ও সাম্প্রতিক চিত্রটি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৭.২ প্রস্তাবনা

আমরা আগেই জেনেছি ভারতবর্ষে গ্রামই হল সমাজ সংগঠন ও রাষ্ট্র-রাজনীতি ভিত্তি। ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রধান সূত্র হল গ্রামীণ রাজনীতির সুপরিকল্পিত বিকাশ। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের ভাবনাকে সফল

করতে এখানে নানা ধরণের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করা হয়েছে বটে, তবে আশির দশকের আগে এক্ষেত্রে তেমন সাফল্য আসে নি। প্রচলিত রাজনৈতিক ভাবনা ও প্রক্রিয়ায় গ্রামের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্র তেমন গুরুত্ব পায় নি। এই পর্যায়ে যে রাজনৈতিক দল সরকার পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছে গ্রামীণ রাজনীতির গতি-প্রকৃতি বোঝার ক্ষেত্রে তাদের সীমাবদ্ধতা ছিল। এই পর্বে রাজনীতি প্রচলিত ভাবনা নিয়েই, ওপর থেকে চাপানো রক্ষণশীল দৃষ্টি নিয়েই গ্রামের উন্নয়ন বা সংগঠনের কথা ভাবা হয়েছে। গ্রামে উন্নয়নের কোন রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। উন্নয়নের পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু প্রকৃত পরিকল্পিত উন্নয়নের কোন ধারণা ছিল না। প্রায় দু-দশক ধরে গ্রামে উন্নয়নের প্রশ্নে কেবল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য গ্রামের মানুষকে উন্নয়নের কার্যক্রম থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। প্রশাসন আর আমলার সাহায্যে যে গ্রামীণ উন্নয়নের প্রকল্প রূপায়ণের চেষ্টা হয়েছে সেখানে গ্রামীণ স্বয়ংভরতা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের ধারণা মূল্য পায় নি। প্রথম বা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অসাম্য হ্রাস, দরিদ্র ও অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের কাছে উন্নয়নের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদির কথা বলা হলেও উন্নয়নের কাম্য লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে যে রাজনৈতিক ও সরকারি প্রয়াস ও প্রক্রিয়া গ্রহণ করা উচিত ছিল তা নেওয়া হয় নি। বর্তমান এককের প্রথম অংশের আলোচনায় প্রচলিত এই রাজনৈতিক চিন্তা ও প্রক্রিয়ার ধারাটির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাজনীতির প্রচলিত পথে যে গ্রামের রাজনীতিকে সংগঠিত করা সম্ভব নয় শাসক দল কংগ্রেসের পক্ষে সেটা বোঝা সম্ভব না হলেও, প্রায় দু-দশক কাল গ্রামের রাজনীতির স্থবিরতা লক্ষ্য করে নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গ্রামের রাজনীতিতে এক সম্পূর্ণ নতুন ধারা আনতে চেষ্টা করে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত নতুন জনতা সরকার। জনতা সরকারের সৌজন্যে গ্রামের সংগঠনে ও রাজনীতিতে যে রূপান্তর এল পরবর্তী আলোচনায় তারই বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। গ্রামের রাজনীতিতে সম্পূর্ণ নতুন প্রবণতা ও প্রক্রিয়া নিয়ে এল পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার। ১৯৭৮ সালে ক্ষমতায় আসার পরই গ্রামের রাজনীতিকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেছে বামফ্রন্ট সরকার। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের ভাবনাকে কার্যকর রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টায়, প্রচলিত গ্রামীণ রাজনীতির ধারাকে বদলে দিয়ে গ্রহণ করা হল রাজনৈতিক উন্নয়ন আর সংগঠনের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনকে সংশোধন করে ১৯৮৩ সালে নিয়ে আসা হল রাজনৈতিক পঞ্চায়েতের ভাবনা। মতাদর্শগতভাবে গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার নিয়ে এল আমূল রূপান্তরের ভাবনা। সরকারের প্রশাসনিক নীতিতে এল পরিবর্তনের ভাবনা। ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণ, আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের অবসান এবং প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণ—নতুন সরকারের গ্রামীণ রাজনীতিক-সাংগঠনিক নীতির এই তিনটি প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে রূপায়িত করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হল পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠান। ১৯৭৩ সালের আইন মেনেই হল এই নির্বাচনের ব্যবস্থা। নির্বাচন অনুষ্ঠান, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত গঠনের সাথে সাথে শুরু হল এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার আইনী বৈধতা দান ১৯৮৩ ও ১৯৯২ সালের পঞ্চায়েত আইন শুধু পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে বৈধতা দানই করে নি একে আরো সংহত করেছে। সারা ভারতবর্ষে গ্রামীণ রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। বর্তমান এককের শেষ অংশে এই নতুন গ্রামীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিশিষ্টতা ও এর বাস্তব ও সাম্প্রতিক চিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে। ওই সঙ্গে সর্বভারতীয় রাজনীতি ও অন্যান্য রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাম্প্রতিক চিত্রকেও তুলে ধরা হয়েছে।

৭.৩ গ্রামীণ রাজনীতির প্রচলিত গতি ঃ গ্রাম সংগঠনের গান্ধীবাদী ও কংগ্রেসী ধারা

স্বাধীনতার পর প্রথম দু'দশকে গ্রামীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে দুটি 'স্পষ্ট' ধারা লক্ষ্য করা যায়—রাজনীতি ও শাসন সংগঠনে গান্ধীজির ভাবনার প্রয়োগ ও এক্ষেত্রে শাসক কংগ্রেস দলের দৃষ্টিভঙ্গি। গ্রামীণ রাজনীতি ও সংগঠন

সম্পর্কের গান্ধীজির ভাবনার (এ সম্পর্কে বর্তমান পর্যায়ের প্রথম এককে আলোচনা আছে) প্রয়োগ হয়েছে আংশিকভাবে। পঞ্চায়েতের যে স্বদেশী ভাবনাকে তিনি এদেশে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন তা স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সমর্থন পায়নি। স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে গ্রামের কী অবস্থান হবে তা নিয়ে গণপরিষদে তাঁর কোন বক্তব্য ছিল না বা তাঁর নেতৃত্বে ভারত সরকারের প্রথম দিকের কাজকর্মে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিলনা। পঞ্চায়েত নয়, সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প চালু করে গ্রামীণ রাজনীতিতে গতি আনতে সচেষ্ট হয়েছেন তিনি। গ্রামের প্রশাসন ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ বা গ্রামে গণউদ্যোগ সৃষ্টির কোন প্রচেষ্টা ছিল না। গান্ধীজির গ্রাম শাসনের ও পঞ্চায়েত ভাবনার সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান করেছেন সংবিধান খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান আম্বেদকর। গ্রামীণ রাজনীতি বা সরকার সম্পর্কে তাঁর কখনই কোন উচ্চাশা ছিল না বরং গ্রাম সম্পর্কে এক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেছেন তিনি। খসড়া সংবিধানে গ্রামের কোন স্থান ছিল না। গণপরিষদের অন্য কিছু সদস্য (এইচ. ডি. কামাথ, এন. জি. রঙ্গা, মহাবীর ত্যাগী প্রমুখ) অবশ্য গ্রামে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা স্থাপন ও গান্ধীজির গ্রাম ভাবনাকে প্রয়োগ করার পক্ষে জোর সওয়াল করেছেন।

৭.৩.১ গ্রামের রাজনীতিতে গান্ধীজির প্রয়োগ : বিনোবা ভাবে ও জয়প্রকাশ নারায়ণের দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংগঠনিক কাজ

সরকারের সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পে গান্ধীজির ভাবনা নয়, গুরুত্ব পেয়েছে মার্কিনী উপদেষ্টাদের পরামর্শ। গান্ধীজির গ্রাম স্বরাজের আদর্শকে গ্রামে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গান্ধীজির শিষ্য বিশিষ্ট গ্রাম সংগঠক বিনোবা ভাবে (Vinoba Bhave)। গান্ধীজির মতই গ্রামের রাজনীতিতে তিনি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সর্বোদয়ের আদর্শ। সর্বোদয় বলতে তিনি ভাল সরকার নয়, বুঝেছেন সরকার ও শাসন থেকে মুক্তি। ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণেই এই মুক্তি সম্ভব। স্বরাজ বাইরের কোন ক্ষমতা বা শাসনের কাছে আনুগত্য নয়, স্বরাজ হল আত্মশাসন (ruling your own self)। তিনি রাজনীতি বলতে বুঝেছেন ক্ষমতার রাজনীতি। গ্রামে এই ক্ষমতার রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হবে না, প্রতিষ্ঠিত হবে লোকনীতি—গণতন্ত্রের নীতি। লোকনীতিতে দমন বা শাসন নেই, আছে নীতির কর্তৃত্ব। বিনোবা ভাবে ৫০ ও ৬০-এর দশকে গ্রাম সমাজে এই লোকনীতিকেই ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। লোকনীতির প্রক্রিয়া হল (১) সর্বোদয় আন্দোলন, প্রচলিত সরকারি নীতির (কেন্দ্রিভূত, পরিকল্পিত শাসন ও অর্থনীতি) সম্পূর্ণ বিপরীত। এটি কোন কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা নয়, এই আন্দোলনে উৎপাদন বন্টন, প্রতিরক্ষা শিক্ষা সব কিছুই স্থানিক, বিকেন্দ্রিক (localized, decentralized)। এখানে রাষ্ট্রের ক্ষমতা নয়, গ্রামবাসীর, নাগরিকের কর্মশক্তির গুরুত্ব বেশি, (২) রাজনৈতিক দল, রাজনীতিক বা নির্বাচক বা নির্বাচন প্রক্রিয়া নয় গুরুত্ব পায় ঐকমত্যের ধারণা, সামাজিক সংহতির ধারণা, (Social Harmony, Integration)। মানুষে মানুষে বিরোধ, অনৈক্য সৃষ্টি নয়, লোকনীতির উদ্দেশ্য সবরকমের সামাজিক বিভাজন (জাতি, শ্রেণী, গোষ্ঠী, নারী-পুরুষের বিভেদ) অতিক্রম করে মানুষের মধ্যে সত্যিকারের ঐক্যের নীতিকে, সংহত মানবিকতার নীতিকে জাগ্রত করা। (৩) লোকনীতিতে আইনের শক্তি নয়, দমন-পীড়ন নয়, প্রাধান্য পায় নতুন এক ধরণের শক্তি—অহিংসার শক্তি, সামাজিক দায়িত্ববোধ বা অছিবাদের (Trusteeship) শক্তি। অতিরিক্ত সম্পদকে নিজের ভোগের জন্য নয়, সমাজের কাজে ব্যবহারের জন্য বিত্তশালীদের সমাজের অছি হবার জন্য গান্ধীজি যে ডাক দিয়েছিলেন বিনোবা ভাবে তাঁর ভূদান কর্মসূচীর মাধ্যমে তাকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। গান্ধীজির স্বরাজের আদর্শকে সমাজসেবা, শ্রমদান আর সাম্য যোগী (সমতা ও ভারসাম্য বিধানের ধারণা) চিন্তার মাধ্যমে গ্রাম সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন বিনোবা ভাবে। রাজনৈতিক কর্মী নয় বা রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জনের লড়াই নয়, বিনোবা ভাবে ভূদান কর্মীদের সমবেত করে সারাদেশের ৫ কোটি ভূমিহীন কৃষকের জন্য ৫ কোটি একক জমি সংগ্রহের কর্মসূচী

নিয়েছেন। অন্ধ্রে তেলেঙ্গানা জেলা থেকে ১৯৫১ সালে যে ভূদান কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছিল তার পরিণতি পেয়েছিল বিহারে। ১৯৫২-৫৪ এই পর্যায়ে ৩ কোটি জমি ভূদান হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল। তবে এই ভূদান আন্দোলনে দান পাওয়া জমিগুলি কতটা চাষের উপযোগী ছিল, কতটা আইনী জটিলতা মুক্ত ছিল এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে কিভাবে বন্টিত হয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। এই আন্দোলনে সরকার ও কংগ্রেস পার্টির উপরের মহলের প্রচ্ছন্ন সমর্থন থাকলেও পার্টি স্থানীয় বা তালুক বা জেলা স্তরের নেতাদের এ ক্ষেত্রে মোটেই উৎসাহ ছিল না। ভূদান আন্দোলনের নৈতিক দৃষ্টি বা ভূস্বামীদের কাছে আবেদনের পন্থা কমিউনিস্ট নেতাদের কোন মহলেই সমর্থন পায় নি। ভূমি সংস্কার বা কৃষকদের সংগঠিত আন্দোলন ছাড়া অন্য ব্যাপারে তাদের উৎসাহ তেমন ছিল না।

গ্রামে গান্ধীজির সর্বোদয় ভাবনাকে বিনোবা ভাবের মত নয়, অন্যভাবে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী জয়প্রকাশ নারায়ণ। জয়প্রকাশ বুঝেছিলেন সাধারণ রাজনৈতিক বা সামরিক কায়দায় সর্বোদয় আসবে না। দলীয় ক্ষমতার রাজনীতি নয়, তিনি চেয়েছেন গ্রামে গণতন্ত্র আর সামাজিক ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে। আইন বা পরিকল্পনার মধ্যে গ্রামের গরীব মানুষের উন্নয়ন হয় নি। ভূমি বন্টনের বা সংস্কারের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক বা আইনগত তৎপরতা ছিল না একথা ভেবেই তিনি প্রতিষ্ঠান, আইন বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয়, ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন (Reconstruction of Indian Solity) চেয়েছেন। জয়প্রকাশ আস্থা প্রকাশ করেছেন ভারতের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি। স্ব-শাসিত গ্রাম সমাজেই যে, ভারতের রাজনৈতিক শৃঙ্খলার ভিত্তি অতীতের এই ভাবনা তাকে স্পর্শ করেছে। এই স্বশাসিত ব্যবস্থাই যে ব্রিটিশ আমলাতান্ত্রিক শাসনের চাপে পড়ে রুদ্ধ হয়েছে সে কথা স্বীকার করে তিনি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন প্রাচীন ভারতের হারিয়ে যাওয়া সেই আত্মাকে। এক্ষেত্রে গান্ধীজির হিন্দু স্বরাজ ও গ্রাম স্বরাজের দর্শনেই জয়প্রকাশ পেয়েছেন দেশ ও গ্রামসমাজ পুনর্গঠনের বাণী। গান্ধীজির মতই তিনি পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থা, দলীয় প্রচার, নির্বাচনী ব্যবস্থার মধ্যে দেখতে পেলেন ক্ষমতার প্রতিপত্তি ও প্রভাব, অবাধ কেন্দ্রিকরণ আর নানারকম স্বার্থেই প্রকাশ। এই ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে তিনি পেশ করেন লোকসমাজের গণতন্ত্র (Communitarian Democracy) ও বিকেন্দ্রিক অর্থনীতি। গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রের অধীনে নয়, লোক সমাজ ও জনশক্তির অধীনে আনতে চেয়েছেন তিনি। ১৯৫৩ সালে নেহরুর কাছে সমাজবাদের গণতান্ত্রিক গঠনকার্যের এক প্রস্তাব করেছেন তিনি। ১৯৫০ সালে সমাজবাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তিনি গান্ধীর সর্বোদয় ভাবনাকে সমন্বিত করে সারা ভারতবর্ষে এক শোষণহীন সমবায়িক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। ১৯৫৭ সালে তিনি সমাজতন্ত্র থেকে সর্বোদয়ের পথে ঝুঁকেছেন। ১৯৫০-এর দশকে তিনি বাইরে ও ভিতরে সর্বত্র ক্ষমতা কেন্দ্রিভবনের প্রবণতা লক্ষ্য করে (সোভিয়েত রাশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির রাষ্ট্রিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রাধান্য এবং দেশে কংগ্রেস দলের একচেটিয়া প্রাধান্য ও শাসন ক্ষমতার অপব্যবহার) কেন্দ্রিভূত রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করেছেন। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভোটাদের কাছে তিনি শাসক দলের ক্ষমতা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানান এবং করেন 'যে কোন ধরনের ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ধ্বংস হোক'। লক্ষণীয় এর প্রায় ১৮ বছর পরে ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্র ক্ষমতার অপব্যবহার আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি একই প্রতিবাদ করেছেন। জরুরী অবস্থার উদ্ভূত পরিস্থিতির পেছনে যে রাজনীতি আর ক্ষমতার অপব্যবহার আর দুর্নীতিই প্রধান কারণ এই পর্ব ভাবনাতেই তিনি সম্পূর্ণ অবিচল ছিলেন। এই পর্বেই সর্বাত্মক বিপ্লবের (Total Revolution) যে ডাক তিনি দেন তা

প্রান্তলিপি : সর্বাত্মক বিপ্লব হল রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত, নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক—সর্বস্তরে শান্তিপূর্ণ ও ব্যাপক প্রতিরোধের এক ভাবনা। এটি হল রাজনীতির পাপচক্র থেকে উদ্ধার পেতে এক ব্যাপক গণজাগরণ এবং একই সঙ্গে জনশিক্ষা ও গঠনমূলক কার্যক্রমকে প্রচার ও সফল করার এক আহ্বান। সমবায়িক সমাজ, দলহীন গণতন্ত্র, গ্রামীণ পুনর্গঠনের ভাবনা ও শোষনহীন সমাজগঠনের ভাবনাকে মিলিতভাবে রূপ দেবার এক প্রচেষ্টা এই বিপ্লব। গুজরাট থেকে এই বিপ্লবের ভাবনা সঞ্চারিত হয়েছে বিহারে এবং সারা দেশে।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেই নয়, গ্রামের রাজনীতিতেও প্রভাবিত করেছিল।

বিনোবা ভাবে বা জয়প্রকাশের ভাবনার নৈতিক মূল্য স্বীকৃতি পেলেও পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে গ্রামের রাজনীতিকে তেমনভাবে প্রভাবিত করতে পারে নি। সত্তরের দশকে জয়প্রকাশের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠান বিরোধী যে আন্দোলন হয়েছিল তার প্রভাব অবশ্য কংগ্রেস দল ও নির্বাচনী রাজনীতির উপর পড়ে। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় (দীর্ঘ দশকের কংগ্রেস শাসনের অবসান) এবং জনতাদলের উত্থানের পেছনে জয়প্রকাশ নারায়নের প্রভাব প্রচেষ্টা এবং নেতৃত্বকে কোনভাবেই উপেক্ষা করা যায় না।

৭.৩.২ গ্রামীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া : কংগ্রেসের ভূমিকা

পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস দলেরই প্রভাব, প্রতিপত্তি ছিল। এই সময় গ্রামীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বলতে আমরা যা বুঝি তার গতি নির্ধারিত হয়েছে শাসক কংগ্রেস দলের নীতি ও নির্দেশ মত। বিনোবাজীর ভূদান আন্দোলন বা জয়প্রকাশের সর্বোদয় ও লোক সমাজের গণতন্ত্র কংগ্রেসের উপর কোন প্রভাব ফেলে নি। ৫০-এর দশকে গ্রাম পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করে রাজনীতি বা ক্ষমতার যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে তার প্রায় পুরো সুবিধাই ভোগ করেছে প্রদেশ কংগ্রেস ও তার কমিটিগুলি। কংগ্রেস অফিস (জেলা ব্লক স্তরে) ছিল ক্ষমতা, রাজনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা বিতরণের কেন্দ্র। নির্বাচনেও ছিল কংগ্রেসের একাধিপত্য। বলবন্ত রাই মেহতা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া (স্বশাসিত সংস্থা হিসাবে) ১৯৫৮ সাল থেকে শুরু হলেও, এই বিষয়ে অহিনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণে সাময়িক উদ্যোগ থাকলেও শেষ পর্যন্ত বিলম্ব হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা উত্থানের পর্যায় (১৯৫৯—৬৪) অতিক্রম করতে করতেই শুরু হয়ে যায় এর অচলাবস্থার যুগ। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে গবেষকগণ প্রাথমিকভাবে লক্ষ্য করেন শাসক দলের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাব। পঞ্চায়েত নিয়ে দলীয় স্তরে নানা দুর্নীতি এবং সরকারীভাবে প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও হস্তক্ষেপ পঞ্চায়েতের কাজকর্মে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে, পরবর্তী এক দশকে তা কাটানো সম্ভব হয় নি। সরকারি বা শাসক দল হিসাবে পঞ্চায়েতকে সফল করতে যে সব রাজনৈতিক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ছিল কংগ্রেস যে ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছে। কংগ্রেসের ব্যর্থতার কয়েকটি দিক হল : (১) পঞ্চায়েতের রাজনীতি করণে ব্যর্থতা। (২) পঞ্চায়েতের তাৎপর্য সম্পর্কে দলীয় কর্মীদের জ্ঞান বা চেতনা বাড়াতে দলীয় নেতাদের অনীহা ও অসামর্থ্য। (৩) গ্রামের মানুষের মধ্যে পঞ্চায়েত সম্পর্কে যে উৎসাহ জাগ্রত হয়েছিল শাসক দলের বাস্তব কাজকর্মে সে উৎসাহে ভাটা পড়েছে। (৪) গ্রামের উচ্চবিত্ত, রক্ষণশীল, সুবিধাভোগী মানুষের স্বার্থে পঞ্চায়েতকে ব্যবহার করা হল। (৫) গ্রামের পঞ্চায়েতের উপযুক্ত নেতৃত্ব গড়ে তোলার ব্যর্থতা ছিল প্রকট। (৬) আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্য ও হস্তক্ষেপ থেকে পঞ্চায়েতকে মুক্ত করার সামর্থ্যও শাসকদলের ছিল না। (৭) পঞ্চায়েতের রাজনীতিকরণ না হলেও প্রভাব খাটানো, দুর্নীতি আর স্বার্থের রাজনীতি এখানে সমানে চলেছে। (৮) ক্ষমতার লালসা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে গ্রামে ক্ষমতার উত্তেজনা এবং এর পরিণতি পঞ্চায়েতের কাজকর্মে অচলাবস্থা। (৯) পঞ্চায়েতে নারী, অনগ্রসর, গরীব মানুষের পছন্দ গুরুত্ব পায় নি। নব উদীয়মান প্রভাবশালী শ্রেণীর মানুষই সরকারি প্রকল্পগুলিতে প্রভাব খাটিয়েছে। (১০) পরিকল্পনার সঙ্গেও পঞ্চায়েতকে যুক্ত করা হয় নি। যদিও দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার লক্ষ্য কী হবে তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে, এই লক্ষ্য পরিপূরণের জন্য শাসক দলের প্রচেষ্টা তেমনভাবে ছিল না। গ্রাম স্তরে জলসরবরাহ, সেচ, শিক্ষা পরিবার পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও সমবায়, পরিষেবামূলক কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতকে তৎপর করে তোলা যায় নি প্রধানত শাসক দলের উদাসীনতার জন্য। ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতিকেও সক্রিয় ও সজীব করে তোলা যায় নি। সামাজিক সেবা ও অর্থ, রাজস্ব, প্রাথমিক শিক্ষা,

সামাজিক শিক্ষা, ত্রাণ, কৃষির উন্নয়ণ, গ্রামীণ ও কুটীর শিল্পের প্রসার কোন ক্ষেত্রেই পঞ্চায়েত সমিতি বা তার কমিটিগুলির কোন কার্যকর ভূমিকা ছিল না। পরিকল্পনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমন্বয়, পঞ্চায়েত সমিতির উপর তদারকী, সরকারী অনুদানের বন্টন,—এই সব নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে জেলা পরিষদের কোন দায় ছিল না। জেলা পরিষদকে কোন কার্যকর সংস্থা নয়, একটি পরামর্শদান সভার অতিরিক্ত কিছু ভাবা হয় নি।

শাসক দলের রাজনৈতিক কোন কর্মসূচী গ্রামের ছিল না। পঞ্চায়েতকে বিভিন্ন স্তরে দলের কমিটির 'এজেন্ট' হিসাবে দেখানো হয়েছে। কোন স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মসূচী বা সেবামূলক ও সংগঠিত কাজে পঞ্চায়েত যুক্ত ছিল না। তার মতাদর্শগত ও সামাজিক নমনীয়তার জন্য কংগ্রেস দল যে সর্বভারতীয় গ্রহণযোগ্যতা বা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল এবং গ্রামের রাজনীতিতে যে সহজ প্রবেশাধিকার পেয়েছিল তার সুবিধা এই দল ধরে রাখতে পারে নি। গ্রামীণ রাজনীতির সমর্থ ও যোগ্য সংগঠক এই দল হতে পারে নি। দলীয় সংগঠনের ক্রমবর্ধমান গতির সঙ্গে (শাখা, সদস্যপদ, আর্থিক শক্তি) দলের রাজনৈতিক কর্মসূচী ও গ্রামীণ ভিত্তির অসাদৃশ্যই ক্রমশই চোখে পড়েছে। সত্তরের দশক থেকে দলীয় সংহতিও ভেঙে পড়তে থাকে। নির্বাচনী রাজনীতিতে এর প্রতিকূল প্রভাব পড়ে। ১৯৫২ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কংগ্রেসের যে রাজনৈতিক উত্থান চোখে পড়ে, সত্তরের দশকে তা বাধাপ্রাপ্ত হয় প্রধানত নেতৃত্বের লড়াই, গ্রামীণ রাজনীতিতে এর ব্যর্থতা, জনমুখী আন্দোলনে এর অসাফল্য এবং সর্বোপরি নতুন সামাজিক-আর্থনীতিক প্রেক্ষাপট ও পরিবর্তনের সঙ্গে এর সাযুজ্য বিধানের অক্ষমতায়। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে হলে যে রাজনৈতিক প্রস্তুতি নিতে হয়, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যে শৃঙ্খলা, দায়িত্ব মান ও নীতি সঞ্চালিত করা দরকার শাসক দল হিসাবে কংগ্রেস তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। দলের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে নতুন ভাবনাকে প্রশস্ত করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা। পার্লামেন্টীয় মডেল, আইনের শাসন, নির্বাচন ও ভোটাধিকার, দায়িত্বশীল শাসন, ন্যায়বিচার এইসব নীতির প্রতি আনুগত্য দেখালেও—গণতান্ত্রিক শাসনের প্রতি মৌখিক শ্রদ্ধা (Lip -Service) প্রদর্শন করলেও, গণতান্ত্রিক শাসনের মৌল প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণকে সফল করতে যে সাংগঠনিক উদ্যোগ প্রয়োজন, সেই উদ্যোগ দলের ছিল না। গ্রাম শাসন ও সংগঠনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, রাজনৈতিকভাবে শাসক কংগ্রেস দলকে অনেকটা পেছনে ফেলে দিয়েছে।

৭.৪ গ্রামীণ রাজনীতির রূপান্তর : জনতা সরকার এবং কমিউনিষ্ট বামপন্থী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্যোগ

সত্তরের দশক থেকেই কংগ্রেসে যে ভাঙন দেখা যায়, সেই ভাঙনের মধ্য থেকে উঠে আসা একদল নেতা, পূর্বতন সমাজতন্ত্রী দলের কিছু নেতা, এবং অন্যান্য বিরোধী দলের নেতারা যৌথভাবে এক রাজনৈতিক সংগঠনে মিলিত হয়ে সর্বভারতীয় স্তরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি ফ্রন্ট তৈরি করে। নানা ক্ষেত্রে শাসক দলের ব্যর্থতা জরুরী অবস্থা ইত্যাদি কারণে কংগ্রেস ১৯৭৪-৭৫ সাল থেকেই তার রাজনৈতিক ভিত্তি ও জন সমর্থন হারাতে থাকে। ১৯৭৭ সালের সংসদীয় নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয়। জনতা দল শাসন ক্ষমতায় আসে। জনতা দলের সরকার মাত্র তিন বছর স্থায়ী ছিল। কিন্তু ওই অল্প সময়ের মধ্যে ভারতীয় রাজনীতিতে এক নতুন গতি সঞ্চারিত হল। কংগ্রেস দল রাজনীতির ঠিক যে ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে—গ্রামীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও সংগঠনে গতিশীলতা আনা—জনতা দল সেই শূন্যতাকেই পূরণ করতে অগ্রসর হল। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে জনতা দল অশোক মেহতার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে গ্রামের শাসন ও সংগঠন বিষয়ে এই কমিটির কাছে পরামর্শ চাইল। অশোক মেহতা কমিটি গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রেক্ষাপট ও সংকটকে বিবেচনা করে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে

তোলার সুপারিশ করে। ১৯৭৮-৭৯ সালে গ্রামীম উন্নয়নের এক বহুমুখী বহু উদ্দেশ্যসাধক ব্যবস্থা গ্রহণ করে কেন্দ্রের জনতা সরকার। গ্রামীণ উন্নয়নের নতুন প্রকল্পকে বলা হয়, 'a comprehensive, poor-oriented, growth strategy.' কেউ কেউ বলেন, এই প্রকল্প পূর্বের সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার এক সম্প্রসারিত রূপ। গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে কংগ্রেস সরকার যে এলোমেলো বিক্ষিপ্ত কর্মসূচী নিয়েছে, জনতা সরকার সেই উন্নয়ন, প্রকল্পের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করে, তার দুর্বলতাকে ভরাট করে গ্রহণ করে গ্রামীণ উন্নয়নের এক সংহত সমন্বিত কর্মসূচী। নতুন পঞ্চায়েত এই কর্মসূচীকে রূপ দেবে। কংগ্রেস সরকার পরিকল্পনায় ব্যক্ত পঞ্চায়েতের কাজগুলিকে সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়েছে, গ্রামকে আত্ম-নির্ভরশীল করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। জনতা সরকার তার অল্প স্থায়িত্বকালের মধ্যেই এক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবার উদ্যোগ নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে জনতা সরকারের সাফল্য আসেনি সরকারের পতন ঘটাতে।

তবে কেন্দ্রের জনতা সরকারের এই নব প্রজন্মের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও গ্রামে নতুন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করার প্রতিজ্ঞাকে সার্থক করার দায়িত্ব নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার। কেন্দ্রে রাজনৈতিক ক্ষমতায় নতুন বাতাবরণ সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গে সি.পি. আই, (এম) দলের নেতৃত্বে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকারে সি. পি. আই (এম) ছাড়াও সি. পি. আই, আর. এস. পি, ফরোয়ার্ড ব্লক ইত্যাদির সঙ্গে ডি. এস. পি, সোস্যালিষ্ট দল প্রভৃতি রাজনৈতিক দল সামিল হয়। অশোক মেহতা কমিটি পঞ্চায়েতকে বিকেন্দ্রিকরণের প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত করে এর উপর গ্রামোন্নয়ন পরিচালনার দায়িত্ব অপর্ণ করে। মার্কসবাদ- লেনিনবাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ভিত্তিতে কাজ শুরু করলেও, অচিরেই এই আইনের সংশোধনী এনে অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নতুন পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠার আয়োজন করে। নতুন পঞ্চায়েতের এই প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে বর্তমান এককের পরবর্তী অংশ আলোচনা করা হয়েছে।

এই অংশের প্রথমেই গ্রামীণ রাজনৈতিক ধারার দুটি দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ গান্ধীবাদী ও কংগ্রেস সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি বর্তমান আলোচনার দুটি পৃথক অংশে। বর্তমান আলোচনায় এ বিষয়ে কমিউনিষ্ট ভাবনা কী ছিল তার ওপরে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে। একথা ঠিক গ্রামীণ উন্নয়ন ও সংগঠন, প্রসঙ্গে কমিউনিষ্টদের অতীতের দৃষ্টিভঙ্গিই পঞ্চায়েত সম্পর্কে নতুন রাজনৈতিক ভাবনার প্রেক্ষাপট হিসাবে কাজ করেছে। ৫০ ও ৬০-এর দশক থেকেই গ্রামের ক্ষমতা কাঠামো নিয়ে এবং দেশের পরিকল্পিত উন্নয়নের কৌশল নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেছে কমিউনিষ্টরা। জমিদারী ব্যবস্থার অবসান হলেও, পঞ্চায়েতের ওপর নতুন আইন হলেও গ্রামের ভূমি সম্পর্ক ও ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বা কৃষকের জমির অধিকারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে নি। জনগণের গ্রহণযোগ্যতার বিচারে গ্রামের ক্ষমতার ভিত্তির গণতন্ত্রীকরণ ঘটে নি। কমিউনিষ্টরা সমাজতন্ত্রের নীতিকে সামনে রেখে ভূমি সংস্কার ও গ্রামীণ রাজনীতির গণতন্ত্রীকরণের পক্ষে দাবি জানায়। গ্রামীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কমিউনিষ্ট ভাবনার পেছনে যে সব শক্তিগুলি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে তার মধ্যে অন্যতম হল (১) গ্রামের রাজনৈতিক সংগঠন ও প্রক্রিয়া বিষয়ে কমিউনিষ্টদের শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গী ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদী মতবাদ। এই মতবাদ গ্রামের প্রচলিত সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন এনে ভূমি ও কৃষি সংস্কারের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের ও গ্রামীণ উন্নয়নের ভাবনাকে প্রচার করে। গান্ধীবাদী গ্রামীণ ভাবনার প্রতি এর আকর্ষণ নেই। কংগ্রেসের সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, কেন্দ্রিভূত পরিকল্পনা, নিবিড় কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, সবুজ বিপ্লব এসবের পরিবর্তে আমূল ভূমি সংস্কার ও বন্টনমূলক ন্যায়ের ধারণাকে প্রচার করে কমিউনিষ্টরা। পঞ্চায়েত, সমবায় ও কৃষক সংগঠনকে গ্রাম সংগঠনের তিনটি প্রধান স্তম্ভ হিসাবে মনে করে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি। (২) বাংলা দেশের তেভাগা আন্দোলন, ও অন্ধ্র প্রদেশের তেলেঙ্গানা আন্দোলন, পশ্চিমবঙ্গের নক্সালবাড়ী আন্দোলন থেকে কৃষি বিপ্লব গ্রাম সংগঠনের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা নিয়েছে কমিউনিষ্টরা। (৩) ১৯৫৭ সালের কেরালায় কমিউনিষ্ট সরকারের রাজনৈতিক ও

সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা গ্রহণ, বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী, শ্রমিক সংগঠন ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও মঞ্চের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময়, ১৯৫২ থেকে দেশের সংসদীয় ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধান সভার নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংসদীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা ও অভিজ্ঞতালাভ সবকিছুই গ্রাম শাসন বিষয়ে কমিউনিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিপুষ্ট করেছে। (৪) ১৯৬৭ ও ১৯৬৯-৭০ এই সময়কালে পশ্চিমবঙ্গের দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে যুক্ত থেকে গ্রামীণ রাজনীতি, ভূমি সংস্কার, গ্রামীণ উন্নয়ন সম্পর্কে একটি বিকল্প ধারা ও পন্থা সন্ধানের সুযোগ পেয়েছে সি. পি. আই (এম) ও বামপন্থী দলগুলি। গ্রামের প্রচলিত শ্রেণী কাঠামো, ভূমি ব্যবস্থা, পঞ্চায়েত সংগঠন, সমবায় ইত্যাদি বিষয়ে যেমন বিকল্প বামপন্থী ও কমিউনিষ্ট ধ্যান-ধারণাকে প্রচার করা সম্ভব হয়েছে, তেমনি রাজ্যের রাজনীতি ও শাসন-সংগঠনে নিজের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ এসেছে কমিউনিষ্ট ও বামপন্থী দলগুলির। ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ এর এই অভিজ্ঞতা নিয়েই আবার এক দশক পরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটি শক্তিশালী সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে কমিউনিষ্ট ও বামপন্থী দলগুলি ফিরে এসেছে। বামফ্রন্ট হিসাবে ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর গ্রামের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে আরো গভীরভাবে সংযুক্ত হয়েছে এই দল। গ্রামোন্নয়ন ও গ্রাম সংগঠন বিষয়ে, পঞ্চায়েত বিষয়ে একটি সুসংহত ও দায়িত্বশীল ভূমিকা নিয়েছে কমিউনিষ্টরা। রাজনৈতিক পঞ্চায়েতের প্রকৃত সূচনা এই পর্ব থেকেই।

৭.৫ গ্রামীণ রাজনীতির রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে পঞ্চায়েত ঃ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা

সত্তরের দশক থেকে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে কতকগুলি তাৎপর্যপূর্ন গতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের রাজনীতিতে একটি নতুন ক্ষমতা কাঠামোর সৃষ্টি হয় যা নেহরু পরবর্তী ভারতীয় রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে প্রকৃতিগতভাবে ভিন্নধর্মী। ইতিপূর্বে ১৯৬৭ সালের সংসদীয় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও কংগ্রেসের ভোট ও আসন পূর্বের তুলনায় কমেছে, কংগ্রেস দলে ভাঙন দেখা গেছে এবং ১৯৬৯-৭০ সাল নাগাদ রাজনৈতিক সাংগঠনিক ভাবে কংগ্রেস দলে বিপর্যয় ও বাঁক লক্ষ্য করা গেল। সংসদীয় নির্বাচনে ভোট কমার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যগুলিতেও কংগ্রেস নির্বাচক মণ্ডলীয় সমর্থন হারিয়েছে। পার্টির রাজনৈতিক দানপত্র এবং জনসমর্থনের ভিত্তিকে নিজের পক্ষে আনার প্রতিযোগিতায় ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের তরুণ গোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত সফল হলেও দলের নতুন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আর কেন্দ্রিভূত ও স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বের জেরে দলে সংকট ঘনীভূত হয়। দ্বিতীয়ত, সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে বিরোধী দলগুলি তেমন শক্তিশালী না হলেও, ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে নবগঠিত কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকারের বিরোধী দলগুলি সম্পর্কে এক ধরণের মনস্তাত্ত্বিক ভীতি সৃষ্টি হয়েছিল। এরই বহিপ্রকাশ ঘটেছে শাসক দলের রাজনৈতিক নীতি ও আইনী ব্যবস্থাপনায়। ১৯৭৫ সালের জরুরী অবস্থা ঘোষণা, বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার, সংবাদপত্র ও নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ—সব কিছুই কংগ্রেসকে বিরাট রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। এরই প্রতিফলন ঘটেছে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে। বিরোধী দলের মিলিত জোটের কাছে কংগ্রেসের পরাজয় ঘটেছে। রাজ্যগুলিতেও নির্বাচক মণ্ডলীর রায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গেছে। অন্ধ্রে তেলেগু দেশম, কর্ণাটকে জনতা দল, অসমে অসম গণপরিষদ, পঞ্জাবে আকালী দল, পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. আই (এম)-এর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট রাজ্য-রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ এনেছে। রাজনীতির এই নতুন সমীকরণ গ্রামের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যে রূপান্তর এনেছে রাজ্যে রাজ্যে নতুন পঞ্চায়েত গঠনের প্রক্রিয়া তারই ফলশ্রুতি। তৃণমূল

প্রান্তলিপি ঃ সংসদীয় নির্বাচনে কংগ্রেসের শতকরা প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ৪৪.৯৯ (১৯৫২), ৪৭.৭৮ (১৯৫৭), ৪৪.৭২ (১৯৬২) এবং ৪০.৭৮ (১৯৬৭)। বিহার, কেরল, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭সালের বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে।

স্তরে গণতন্ত্রকে পৌঁছে দেবার জন্য আইনী ও রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু হল যে সব রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ তাদের মধ্যে অগ্রণী। ১৯৭৩ সালের প্রচলিত আইন নিয়েই, ১৯৭৮ সাল থেকে শুরু হল পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েত বিষয়ক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কার্যক্রম।

১৯১৯ সালের গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন অনুসারে বাংলার গ্রাম শাসন ব্যবস্থা প্রসারিত হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনকালে। ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় ইউনিয়ন বোর্ড (Union Board)। ১৯৩৫ সালে প্রণীত বঙ্গীয় আইনে (Bengal Act VIII, 1935) এই আইনের সংশোধন হয়। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন প্রণয়নে বেশ কিছু বিলম্ব হয়। অবশেষে নানা টানাপোড়েন ও দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন। এই আইন মেনেই ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে একটি দ্বিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়—গ্রাম স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পূর্বতন ইউনিয়ন বোর্ড স্তরে অঞ্চল পঞ্চায়েত। ইতিমধ্যে ১৯৫৬ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকার সমাজ উন্নয়ন ও পল্লী উন্নয়নের গুরুত্ব অনুভব করে প্রচলিত সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের উপর সমীক্ষা চালানোর জন্য বলবন্ত রাও মেহতার নেতৃত্বে একটি সমীক্ষক দল নিয়োগ করে। ১৯৫৭ সালে এই সমীক্ষক দল পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে কতকগুলি মূল্যবান সুপারিশ করে। গ্রামগুলির পুনর্জীবন, গ্রামের জনগণের ব্যক্তিত্বের প্রসার ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতির স্বার্থে বলবন্ত রাই মেহতা কমিটি যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সুপারিশ করে ১৯৫৮ সালে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে তা গৃহীত হয়। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থার এই ব্যবস্থার প্যাটার্ন চালু হবার আগেই প্রতিষ্ঠিত হয় দ্বিস্তর পঞ্চায়েত। এর পাঁচ বছর পর ১৯৬৩ সালের জেলা পরিষদ আইন (West Bengal Zilla Parishad Act, 1963) প্রণয়ন করে ব্লক ও জেলা স্তরে আরো দুটি পঞ্চায়েতকে যুক্ত করে চার স্তরের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইনের ভিত্তিতে এতকাল জেলা প্রশাসনের যে শক্তিশালী সাংগঠনিক ব্যবস্থা ছিল তা বাতিল হল। জেলা বোর্ডের স্থান নিল স্থানীয় শাসনের নতুন সংস্থা জেলা পরিষদ।

> প্রাগুলিপি ঃ ইতিপূর্বেই কলকাতা গেজেটে (২৩.৮.৫৫) আধুনিক পঞ্চায়েত গঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে, গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করে স্বায়ত্ত শাসনের একক হিসাবে তার হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত করার প্রস্তাব হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে পল্লীবাসীদের স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য, ১৯৫৭ সালে অনেক দ্বিধা ও বিতর্ক অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা হয়। প্রাথমিকভাবে এটি ছিল দ্বিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা । পরে এটি চার স্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় উন্নীত।

নতুন পঞ্চায়েত আইন মেনে চার বছর অন্তর পঞ্চায়েতের নির্বাচন হবার কথা ছিল, উন্নয়নমূলক কাজে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরগুলি সক্রিয় হবে ভাবা হয়েছিল, গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের এক মজবুত ভিত তৈরী হবে প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু ১৯৫৭ থেকে ১৯৭২ এই দীর্ঘ ১৫ বছর পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের নির্বাচনও হয় নি, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও প্রশাসনিক টালবাহানার জন্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কার্যকারিতাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পঞ্চায়েত নিচের স্তর ও উপরের স্তরের মধ্যে কার্যগত কোন যোগাযোগ বা সমন্বয় ছিল না। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের এই অচলাবস্থা ও স্থবিরত্বের জন্য রাজ্যের শাসক কংগ্রেস দলের দুর্বল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গিই দায়ী। ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে বামপন্থী দলগুলিও কংগ্রেসের ভাঙন থেকে সৃষ্টি হওয়া বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে কংগ্রেস বিরোধী যে নির্বাচনী জোট হয় অল্পকালের জন্য এই জোট পর্যায়ক্রমে দুবার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভূমি ব্যবস্থা ও পল্লী সংগঠনের কাজে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিলেও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারে নি। সারা পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭-১৯৭০ এই সময়কালে জমি-দখলের লড়াই (Land grab movement) ও ভূমি সংস্কারের প্রশ্নে এক তীব্র রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টির হয়েছিল। জমির লড়াই আর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার আমূল পরিবর্তনের দাবিকে সামনে রেখেই এইসময় শুরু হয়েছিল উত্তর বঙ্গের তিনটি

গ্রামাঞ্চলকে কেন্দ্র করে (নকশালবাড়ী, হলদিবাড়ী ও ঘড়িবাড়ী) কমিউনিষ্ট বিপ্লবী আন্দোলন। ভূমি সংস্কার ও গ্রাম সংগঠন যে গ্রাম বাংলা তথা সারা দেশেই আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরের প্রয়োজনে অপরিহার্য এই প্রত্যাশাই জাগিয়ে তুলেছিল এই বিপ্লবী আন্দোলন। রাজ্যের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও পঞ্চায়েত প্রশাসনের এই অচলাবস্থা কটাতেই ১৯৭২ সালে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে কংগ্রেস সরকার পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে এবং এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক আইন তৈরি করে। এই আইনই পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ (West Bengal Panchayet Act 1973) নামে পরিচিত। আইনে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের ধারণাকে ফিরিয়ে আনা হয়। এই তিনটি স্তর হল গ্রাম স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক ও অঞ্চল স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা স্তরে জেলা পরিষদ। তবে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস সরকার এই আইনকে বাস্তবায়িত করতে সফল হয় নি। পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও সরকার আগের মতই উদাসীন থেকেছে। ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই বামফ্রন্ট নির্বাচনী ইস্তাহারে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যবস্থা করা এবং নির্বাচিত পঞ্চায়েতের হাতে গ্রাম শাসনের ভার তুলে দেবার সদিচ্ছা ঘোষণা করে। নির্বাচনে জয় লাভ করার পর নির্বাচনী ইস্তাহারের প্রতিশ্রুতিকে কার্যে পরিণত করা হল। ১৯৭৮ সালের জুন মাসে ত্রিস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েতের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল এবং নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিরা বিভিন্ন স্তরে পঞ্চায়েত শাসনের দায়িত্ব পেলেন। এর পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের অগ্রগতি বজায় থেকেছে। আজ পর্যন্ত (সর্বশেষ ১১ মে, ২০০৩) ছবার পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে। ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইন আরও সংহত হয়েছে ১৯৮৩ ও ১৯৯২ সালের পঞ্চায়েত আইনের দ্বারা এবং এই আইন বাস্তবায়িত হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের বলিষ্ঠ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে। পরবর্তী আলোচনায় তিনটি ভাগে একে একে উপস্থিত করা হয়েছে, এই তিনটি পর্বের পঞ্চায়েতী আইন এবং প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কথা।

৭.৫.১ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত: ১৯৭৩ সালের আইন ও সরকারি ব্যবস্থা

১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনের (পরবর্তীকালের সংশোধন ও সংযোজনসহ) ধারা অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের সাংগঠনিক ও কার্যগত যে সব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তাকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থিত করা হল ঃ

ক. গ্রাম পঞ্চায়েত ঃ (১) গ্রাম হল কয়েকটি মৌজা, মৌজার অংশবিশেষ বা সংলগ্ন কয়েকটি মৌজার সমষ্টি। গ্রামের নাম ও স্থানীয় সীমানা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। গ্রামের এলাকা, ভাগ বা সংযুক্তির প্রশ্নটি রাজ্য সরকারের বিবেচনামত ঠিক হবে।

(২) প্রতিটি গ্রামের জন্য রাজ্য সরকার ঐ গ্রামের নামে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করবেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার সীমা ন্যূনতম ৫ এবং সর্বাধিক ৩০। গ্রামে বিধানসভার ভোটদাতা হিসাবে যারা তালিকাভুক্ত তারাই গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচন করবেন। তপসীলি জাতি ও উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে এবং এই সংরক্ষিত আসনের এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের (মোট আসনের) ব্যবস্থা থাকবে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যও গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য বলে বিবেচিত হবেন।

(৩) ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইন গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ছিল চার বছর। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ে কিছু বলা হয় নি। তবে তাদের অযোগ্যতা বিষয়ে বলা হয়েছে। পরপর তিনটি বৈঠকে হাজির না থাকা, কর বা ফি না দেওয়া, ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ার কারণে

মহকুমা শাসক তাদের অপসারণ করতে পারেন। অপসারণের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ অবশ্য তারা পাবেন।

(৪) গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম সভায় সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে প্রধান ও অন্য একজনকে উপ-প্রধান পদে নিযুক্ত করা যাবে। প্রধান ও উপ-প্রধানের কাজ হল পঞ্চায়েতের নথিপত্র সংরক্ষণ, আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী হিসাবে প্রশাসন পরিচালনা, গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারী ও পঞ্চায়েতের জন্য রাজ্য সরকারের নিযুক্ত কর্মচারীর কাজকর্মের তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ, রাজ্য সরকার বা বা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রদত্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পাদন প্রভৃতি।

(৫) প্রতি মাস অন্তর একবার পঞ্চায়েতের সভা আহ্বান করতে হবে। এছাড়া পঞ্চায়েতের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য চাইলে পঞ্চায়েত প্রধান সভা আহ্বান করতে পারেন।

(৬) পঞ্চায়েতের কর্মসচিব, কর্ম-সহায়ক এবং অন্যান্য কর্মচারী (দফাদার, চৌকিদার) নিয়োগের ব্যবস্থায় পঞ্চায়েত আইনে আছে। কর্মসচিব (Secretary) তার সম্পাদিত কাজ কর্মের জন্য রাজ্য সরকারের কাজে দায়িত্বশীল থাকেন। রাজ্য সরকারের নিয়মানুসারে তিনি বেতন ও ভাতা পান।

(৭) ১৯৭৩ সালের আইনে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজগুলিকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য, অন্যান্য কর্তব্য ও স্বেচ্ছাধীন কর্তব্য এই তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের মধ্যে কতকগুলি হল জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, পানীয় জল সরবরাহ, ময়লা ও জল নিষ্কাসন, জলপথ ও জনপথ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি সংরক্ষণ, পুষ্করিণী ও শ্মশানঘাট ইত্যাদি পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান, জেলা শাসক, জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা ইত্যাদি গ্রাম পঞ্চায়েতে অন্যান্য কর্তব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রাথমিক সামাজিক, প্রযুক্তিগত, বৃত্তিমূলক ও বয়স্ক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, গ্রামীণ ঔষধালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র স্থাপন, খেয়াঘাট পরিচালনা, চাষবাসের সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র সেচ, জলসেচ ও জল পরিকল্পনা, বাস্তুহারার পুনর্বাসন, জমির উন্নতি সাধন, সামাজিক বনসৃজন, রাজ্য সরকার গৃহীত উন্নয়নমূলক ও জনহিতকর কার্যাদির পরিচালনা, গ্রামীণ গৃহনির্মাণ কর্মসূচী গ্রহণ ইত্যাদি। গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বেচ্ছাধীন কর্তব্যের মধ্যে পড়ে রাস্তার আলোর ব্যবস্থা কূপ ও পুষ্করিণী খনন, সমবায়মূলক কৃষি-বিপণি ও বাণিজ্য, সার মজুতের ব্যবস্থা, বাড়ীর স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ, মৎস্য চাষের বিকাশ, দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী, গ্রন্থাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, গণবন্টন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও অন্যান্য করণীয় জনকল্যাণকর কার্য।

(৮) গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল আছে। এই তহবিলের উৎস রাজ্য সরকারের অনুদান, জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির অনুদান, রাজ্য সরকার প্রদত্ত ঋণ, পঞ্চায়েত কর্তৃক আরোপিত কর, শুল্ক ও মাসুল, গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায় অবস্থিত ও পঞ্চায়েত নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ঘরবাড়ি, কলকারখানা ইত্যাদি থেকে আয়।

(৯) ১৯৭৩ সালের আইনে ৫জন সদস্য নিয়ে সরকারি অনুমোদনে গ্রামের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য ন্যায় পঞ্চায়েত গঠনের ব্যবস্থা ছিল। ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্যরা গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারা নির্বাচিত হবেন এবং তাদের দেওয়ানী ও ফৌজদারী এক্তিয়ার থাকবে। ন্যায় পঞ্চায়েতের দেওয়ানী এক্তিয়ার হল ২৫০টাকা বা তার কম অর্থ জড়িত আছে এমন সব মামলা। চুক্তি বাবদ পাওনা অর্থের জন্য মামলা বা অস্থাবর সম্পত্তি ফিরে পাবার মামলা দেওয়ান এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। ফৌজদারী এক্তিয়ার হল ৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে এমন অপরাধের জন্য মামলা যেরা-আইন বিষয়ক মামলা ইত্যাদি।

খ. পঞ্চায়েত সমিতি ঃ (১) প্রতিটি ব্লকে একটি করে পঞ্চায়েত সমিতি থাকে। রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারী করে নির্দিষ্ট সংখ্যক সংলগ্ন গ্রাম নিয়ে একটি জেলাকে কয়েকটি ব্লকে বিভক্ত করতে পারেন। প্রতিটি ব্লকের নাম ও স্থানীয় সীমা নির্দিষ্ট থাকবে।

(২) পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হবেন ব্লকের অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান (পদাধিকার বলে) ব্লকের অন্তর্গত প্রতিটি গ্রাম থেকে নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা অনধিক ৩ জন সদস্য, ৩ ব্লক থেকে নির্বাচিত লোকসভা বিধানসভা সদস্যগণ (মন্ত্রীবাদে), ব্লকের অন্তর্গত রাজ্যসভায় সদস্য ও প্রতিটি ব্লক থেকে নির্বাচিত জেলা পরিষদের সদস্যগণ (সভাধিপতি ও সহ-সভাধিপতি বাদে)

(৩) গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন সদস্য, ন্যায় পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ ও পৌরসভার সদস্য পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হতে পারবেন না। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হবার অযোগ্য ব্যক্তিও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হিসাবে অযোগ্য বিবেচিত হন।

(৪) চার বছরের মেয়াদ, ৩ মাস অন্তর সভা আহ্বান, পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন, তফশিলী জাতি, উপজাতি ও মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রাম পঞ্চায়েতের মত পঞ্চায়েত সমিতিতেও আছে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের মত পঞ্চায়েত সমিতির আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যাদি পালন করেন, পঞ্চায়েত সমিতির নথিপত্র সংরক্ষণ করেন, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মচারী ও রাজ্য সরকার নিযুক্ত পঞ্চায়েত সমিতির কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করেন।

(৫) গ্রাম পঞ্চায়েতের মত পঞ্চায়েত সমিতির জন্যও সচিব ও কর্মচারী আছেন। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক পদাধিকার বলে পঞ্চায়েত সমিতির কার্য নির্বাহী আধিকারিক। পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক পদাধিকার বলে পঞ্চায়েত সমিতির সচিব হন।

(৬) উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়নের জন্য পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতি,অন্যান্য সদস্যদের মধ্য থেকে কমপক্ষে ৩ জন ও সর্বাধিক ৫ জন এবং রাজ্য সরকার মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সদস্য নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির কিছু স্থায়ী সমিতি গঠনের কথা বলা হয়েছে। স্থায়ী সমিতির সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত করবেন। সমিতির চেয়ারম্যানকে কর্মাধ্যক্ষ বলা হয়। সমিতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য অর্থ, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা জনস্বাস্থ্য, কৃষি, সেচ ও সমবায়, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, খাদ্য ও খাদ্য সরবরাহ ইত্যাদি। অর্থ, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিষয়ক স্থায়ী সমিতির চেয়ারম্যান হবেন পদাধিকার বলে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি।

(৭) ১৯৭৩ সালের আইন অনুসারে পঞ্চায়েত সমিতির কাজ হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা। উন্নয়নের ও ন্যায় বিচারের এই সব কাজের মধ্যে পড়ে কৃষি, মৎস চাষ, খাদি, কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প, সমবায় আন্দোলন, সব ধরনের শিক্ষা, নারী ও শিশু উন্নয়ন, সামাজিক বনসৃজন সমাজ কল্যাণ ও অন্যান্য লোক হিতকর প্রকল্প গ্রহণ। রাজ্য সরকার বা অন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বও পঞ্চায়েত সমিতি পালন করে। ব্লকের অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহের রচিত উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সমন্বয় ও সংহতি সাধনও পঞ্চায়েত সমিতির কাজ। এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা, গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর তদারকি হাটবাজারের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুরীর ক্ষমতা পঞ্চায়েত সমিতির অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে পড়ে।

(৮) পঞ্চায়েত সমিতিরও নিজস্ব তহবিল আছে। তহবিলের জন্য সম্পত্তি অর্জন, তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ, তহবিল থেকে বিলি ব্যবস্থা করার ক্ষমতা পঞ্চায়েতের আছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অনুদান ও মঞ্জুরী, রাজ্য সরকার

সংগৃহীত ভূমি রাজস্বের একটি অংশ, জেলা পরিষদ প্রদত্ত কোন দান ও মঞ্জুরী, টোল, যানবাহন, পশুর উপর শুল্ক ধার্য, যানবাহন রেজিষ্ট্রেশন ফি, জলকর, উপশুল্ক, ঋণ প্রভৃতি পঞ্চায়েত সমিতির আয়ের উৎস।

গ. জেলা পরিষদ ঃ (১) দার্জিলিং বাদে প্রতিটি জেলার জন্য রাজ্য সরকার ঐ নামে জেলা পরিষদ গঠন করবে।

(২) জেলা পরিষদ গঠিত হবে জেলার অন্তর্ভুক্ত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি (পদাধিকার বলে), জেলার অভ্যন্তরে প্রত্যেক ব্লক থেকে ভোটদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত অনধিক ৩ জন সদস্য, মন্ত্রী ছাড়া জেলা থেকে নির্বাচিত লোকসভা, বিধান সভা ও রাজ্যসভার সদস্যগণকে নিয়ে। এখানেও তপসিলী জাতি, উপজাতি ও নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। পৌর কর্তৃপক্ষের সদস্য, কেন্দ্রীয়, রাজ্য পঞ্চায়েত বা জেলা পরিষদের চাকুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তি, অসদাচরণ, বিকৃত মস্তিষ্ক ও দেউলিয়া ব্যক্তিদের জেলা পরিষদের সদস্য হবার যোগ্যতা নেই। গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের ক্ষেত্রে অপসারণের যে সব কারণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে জেলা পরিষদের সদস্যদের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য।

(৩) জেলা পরিষদের প্রথম বৈধ সভায় সদস্য বা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে সভাধিপতি ও অন্য একজনকে সহ-সভাধিপতি হিসাবে নির্বাচন করবেন। নথিপত্র সংরক্ষণ, আর্থিক ও প্রশাসনিক পরিচালনা, কর্মচারীদের উপর তদারকী সভাধিপতির কাজ। এ ছাড়াও জেলা পরিষদ বা রাজ্য সরকার প্রদত্ত দায়িত্ব তিনি পালন করবেন।

(৪) জেলা পরিষদের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক, অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মচারী থাকবেন।

(৫) পঞ্চায়েত সমিতির মত জেলা পরিষদেরও অর্থ, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিশু ও নারী উন্নয়ন, বন ও ভূমি সংস্কার, খাদ্য ও সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে স্থায়ী সমিতি আছে। এখানেও স্থায়ী সমিতিতে সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা পঞ্চায়েত সমিতির মত।

(৬) জেলা পরিষদের ক্ষমতায় যে বিস্তারিত সূচী ১৯৭৩ সালের আইনে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য (ক) কৃষি, মৎস্যচাষ, জনস্বাস্থ্য, কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প, নারী ও শিশুকল্যাণ এবং অন্যান্য জনহিতকর উদ্দেশ্যে প্রকল্প গ্রহণ (খ) জনহিতকর কার্য পরিচালনা বা এই কাজে সহায়তা, (গ) জনকল্যাণকর সংগঠনের জন্য অনুদান, (ঘ) হাট বাজারের মালিকানা অধিগ্রহণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, (ঙ) পঞ্চায়েত সমিতির জন্য অনুদান প্রদান ও পঞ্চায়েত সমিতির বাজেট অনুমোদন, (চ) উন্নয়নের কাজে রাজ্য সরকারকে পরামর্শদান, (ছ) রাজ্য সরকার প্রদত্ত ক্ষমতা সম্পাদন, (জ) পঞ্চায়েত সমিতির কাজের তত্ত্বাবধান ইত্যাদি।

(৭) জেলা পরিষদের তহবিলের উৎস রাজ্য সরকার প্রদত্ত অনুদান, রাজ্য সরকার সংগৃহীত ভূমি রাজস্বের অংশ, রাজ্য সরকার প্রদত্ত ঋণ, জেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়, হাসপাতাল, ঔষধালয়, ঘরবাড়ি, প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা থেকে প্রাপ্ত আয়, কর, শুল্ক, ফি ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত আয়, জরিমানা ইত্যাদি থেকে আয় এবং বিভিন্ন দান ও সাহায্য হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ।

১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন আইনগত মূল্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু এই আইনকে দীর্ঘকাল কাজে পরিণত করা যায় নি। স্বায়ত্ত শাসনের প্রশ্নে কংগ্রেস সরকার কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। প্রায় পাঁচ বছর পর বামফ্রন্ট সরকার আশু যে সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছে তা হল (১) পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছে, (২) নির্বাচিত পঞ্চায়েতের হাতে আইন মত কাজের দায়িত্ব দিয়েছে, (৩) পঞ্চায়েতকে অন্যান্য

কাজগুলির সঙ্গে সঙ্গে সরকারী প্রকল্প রূপায়নের ও সম্পদ সংগ্রহের কাজে সামিল করেছে, (৪) গ্রামীণ পুনর্গঠন ও সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজে অগ্রসর হয়েছে এবং (৫) ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনও যে স্বায়ত্তশাসনের মূল লক্ষ্যকে অর্জন করার পক্ষে যথেষ্ট নয় একথা ভেবে এই আইনের সংশোধন ও পরিমার্জনার কাজে অগ্রসর হয়েছে।

৭.৫.২ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা : আশির দশক

পশ্চিমবঙ্গে দায়িত্বশীল পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সংগঠিত করার প্রকৃত তৎপরতা লক্ষ্য করা গেল আশীর দশক থেকে। ১৯৭৮ সালের ৪ জুন পঞ্চায়েত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পঞ্চায়েত গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেলেও পঞ্চায়েতের গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়ায় গতি আনতে আরো সময় ও প্রস্তুতির দরকার ছিল। পঞ্চায়েতে এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সচল করতে প্রথমেই প্রয়োজন ছিল এর প্রতিবন্ধকতাকে দূর করার ব্যবস্থা। গ্রামে আর্থ-সামাজিক সাম্য আনতে একদিকে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং অন্যদিকে জাতপাত ও বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠন ও শক্তিকে সমবেত এবং সঞ্চালিত করা দরকার। একই সঙ্গে প্রয়োজন হল প্রতিকূল আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোকে প্রবল রাজনৈতিক ইচ্ছা আর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অস্ত্র দিয়ে অতিক্রম করার। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সফল করতে পঞ্চায়েতের প্রচলিত আইনী ব্যবস্থার পরিবর্তন আনার সঙ্গে গ্রামে নাগরিক শিক্ষা ও প্রচারের ও প্রয়োজন ছিল এবং পাশাপাশি দারিদ্র দূরীকরণ ও গ্রামীণ উন্নয়নের জন্যও প্রয়োজন ছিল বলিষ্ঠ উদ্যোগের। ওই উদ্যোগটিই বলিষ্ঠভাবে শুরু হয়েছে আশীর দশকের প্রথম থেকে। এক্ষেত্রে প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হল ১৯৮৩ সালের পঞ্চায়েত আইনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতকে পূর্ণাবয়ব ও আরো জনমুখী করে তোলার কাজ।

১৯৭৩ সালের আইনের সংশোধিত ও সংযোজিত রূপটিকেই এর আগে আমরা তুলে ধরেছি। বর্তমানে ১৯৮৩ সালের সংযোজনগুলির আলাদাভাবে দেখানো হল। ১৯৮৩ সালের সংশোধিত পঞ্চায়েতী আইনের বৈশিষ্ট্য হল ঃ

(১) পঞ্চায়েতের গঠন পদ্ধতিতে আরো পরিবর্তন আনা। পঞ্চায়েতের কার্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়ে ৪ বছর থেকে ৫ বছর হল। পৌরসভার সদস্যদের গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হবার ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত বিবেচনা করা হল। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্ধারিত হল। একইভাবে পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতাও নির্ধারিত হল।

(২) জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহ-সভাধিপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হল।

(৩) পঞ্চায়েতের উপর সরকারের উন্নয়নমুখী কাজের দায়িত্ব আরোপ করে পঞ্চায়েতকে আরো বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হল।

(৪) নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতকে প্রতিটি স্তরেই আরো স্বাধীনতা দেওয়া হল।

(৫) উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে পঞ্চায়েতকে সক্রিয় করতে কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেবার কথা বলা হল।

(৬) পঞ্চায়েতকে জনমুখী করার জন্য বছরে দুবার পঞ্চায়েতকে জনসাধারণের সামনে হাজির করার কথা বলা হল। আয়-ব্যয় হিসাব-পত্র সম্পর্কে পঞ্চায়েতকে নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে আরো দায়বদ্ধ করার ব্যবস্থা হল।

আশীর দশকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সংগঠনে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের সচেতনতা ও কর্মতৎপরতা রীতিমত নজর কেড়েছে। এইসব তৎপরতাগুলির মধ্যে কয়েকটি বিষয় ছিল রীতিমত

তাৎপর্যপূর্ণ: (১) ১৯৮৩ ও ১৯৮৮ সালে রীতিমত সাড়া জাগিয়ে অনুষ্ঠিত হল পঞ্চায়েতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় নির্বাচন। ১৯৮৩ ও ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ও আসন সংখ্যা ছিল এইরকম :

	১৯৮৩		১৯৮৮	
	সংখ্যা	আসন সংখ্যা	সংখ্যা	আসন সংখ্যা
জেলা পরিষদ	১৫	৬৭৮	১৫	৬৫৮
পঞ্চায়েত সমিতি	৩৩৯	৮,৬৬৪	৩২৯	৯,১২৮
গ্রাম পঞ্চায়েত	৩৩০৫	৪৬,১৫৩	৩২২৯	৫২,৫২০

পঞ্চায়েতের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উদ্দীপনা, প্রচার, সমাবেশ সব কিছুই গ্রামের রাজনীতিতে সৃষ্টি করেছে এক অভূতপূর্ব গণতান্ত্রিক চেতনা। গণতন্ত্রের পথেই যে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণ সম্ভব এই দুটি নির্বাচনে তা আবার নতুন করে প্রমাণিত হল।

(২) পঞ্চায়েতকে নেতৃত্বে রেখেই পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ শাসন ও উন্নয়নের পরিকাঠামো গড়ে তোলার ব্যবস্থা হল। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মানুষের মূল চাহিদা (খাদ্য, পানীয় জল, গৃহ নির্মাণ, দুর্বল ও অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য ব্যবস্থা) মেটাবার দায়িত্ব দেওয়া হল সরাসরি পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের হাতে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই এই সময় থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সুসংহত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী (জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প, গ্রামীণ ভূমিহীনদের কর্মসংস্থান প্রকল্প, জওহর রোজগার যোজনা প্রভৃতি) রূপায়নের ব্যবস্থা শুরু হয়ে যায় কার্যকরভাবে। এইসব কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিতে গ্রামের মানুষের উৎসাহ, অংশগ্রহণ ও পারদর্শিতা পঞ্চায়েত সম্পর্কে বিদেশী গবেষকদের নজর কেড়েছে।

(৩) গ্রাম ও শহরের মধ্যে ভারসাম্য বিধানের প্রশ্নটি গুরুত্ব পেল এই সময় থেকেই আরো বেশি করে। বিদ্যুৎ, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রসারের মধ্য দিয়ে এটা সম্ভব—ওই ধারণাটি গুরুত্ব পেল সরকারি নীতি ও কাজকর্মের মাধ্যমে—

(৪) এই সময় থেকেই পরিকল্পনার বিকেন্দ্রিকরণের সাংগঠনিক প্রয়াস কার্যকরভাবে শুরু হল। ১৯৭২ সালে রাজ্য যোজনা পর্ষদ গঠিত হলেও ১৯৮২ সালের আগে তাকে সক্রিয় করা যায় নি। এই সময় থেকেই রাজ্য যোজনা পর্ষদ, পরিকল্পিত উন্নয়নের অগ্রাধিকার স্থির করে কৃষি, ত্রাণ, গ্রামোন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আর্থিক সংস্থান ও পরিকাঠামোগত ব্যবস্থার বিষয়টি বিবেচনা করেছে এবং একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পরিকল্পনার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার কাজ শুরু করেছে। ১৯৮৫ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে জেলা ও ব্লক স্তরে পরিকল্পনায় কর্মসূচী রূপায়নের জন্য পঞ্চায়েতের সঙ্গে জেলা পরিকল্পনা সংস্থা ও জেলা পরিকল্পনা কমিটিকে যুক্ত করে এবং এই কাজকে প্রসারিত করার জন্য ব্লক পরিকল্পনা সংস্থা ও জেলা পরিকল্পনা কমিটিকে যুক্ত করে এবং এই কাজকে প্রসারিত করার জন্য ব্লক পরিকল্পনা কমিটি গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে।

(৫) আশীর দশকে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার একটি অভিনব দিক ছিল প্রশাসনকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা এবং গ্রামীণ উন্নয়ন ও সংগঠনের ক্ষেত্রে রাজনীতি ও প্রশাসনের এতকালের বিরোধ ও দূরত্বের ধারাকে অতিক্রম করে প্রশাসনকে যত বেশি সম্ভব গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের প্রক্রিয়ায় মানুষের সহযোগী ও বন্ধু করে তোলা। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও মত-বিনিময়ের ব্যবস্থাও নেওয়া হল।

৭.৫.৩ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত : ১৯৯২ সালের আইন

পঞ্চায়েতের পূর্ববর্তী আইনগুলির সংযোজন ও বর্জনের মধ্য দিয়ে পরিমার্জনার মধ্য দিয়েই এল আরেকটি নতুন পঞ্চায়েতী আইন, আরো সংহত ও গণতান্ত্রিক আইন, ১৯৯২ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন। ১৯৯২ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন সব অর্থেই নতুন। এই আইন পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সংগঠনে ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। পরিবর্তনের এই ক্ষেত্রগুলি একান্তভাবেই বিশিষ্টতার দাবি করতে পারে।

প্রান্তলিপি : এতকাল (১৯৭৩, ১৯৮৪ সালের আইনমত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানই ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েত আর পঞ্চায়েত সমিতির সংযোগচিহ্ন। বর্তমান আইনে (১৯৯২) এই সংযোগ সেতু আরো দৃঢ় হল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হিসাবে নিয়ে এসে।

গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের ক্ষেত্রে দলত্যাগ বিরোধী আইন প্রয়োগের জন্য রাজ্য সরকার ১৯৯৪ সালে একটি আইন প্রণয়ন করেছে। ১৯৯৪ সালে প্রণীত সংশোধনী পঞ্চায়েত আইনে পঞ্চায়েত গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভা গঠনের কথা বলা হয়েছে। গ্রাম সভা হল নির্বাচকদের সভা, গ্রাম বাসীর নাগরিক সভার মত গ্রাম সভা হল গণসমাবেশের কার্যকরী মঞ্চ, জনস্বার্থ ও সামাজিক বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা হল গ্রাম সভা। গ্রাম সংসদ গ্রামের উন্নয়ন পরিকল্পনায় গ্রামের মানুষকে সামিল করার কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতকে পরামর্শে দেবার সংস্থা।

১। গ্রাম পঞ্চায়েত : গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলি হলঃ

(ক) প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট জনসংখ্যার অনুপাতে তফসিলী জাতি ও উপজাতি এবং নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা। সংরক্ষিত আসনের অন্তত এক তৃতীয়াংশ তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসনের অন্তর এক-তৃতীয়াংশ (তফসিলী জাতি ও উপজাতির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সহ) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

(খ) পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতি ছাড়া কোন গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য বলে বিবেচিত হবেন। অবশ্য পঞ্চায়েত সমিতির কোন সদস্য গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বা উপপ্রধান হতে পারবেন না।

(গ) নতুন সংশোধন আইন অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতের পুনর্গঠনের জন্য সাধারণ নির্বাচন করতে হবে মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই। তবে যেক্ষেত্রে তা সম্ভব নয় গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যকালের মেয়াদ ৬ মাস বাড়াতে পারেন রাজ্য সরকার। মেয়াদ এর পরেও বৃদ্ধি করতে হলে সরকারকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগে রাজ্য সরকারের কাছে অনুমতি নিতে হবে।

(ঘ) একবার নির্বাচিত হলে গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন সদস্যকে অপসারণ করার ক্ষমতা ভোটদাতাদের নেই। তবে মহকুমা শাসক নৈতিক অধঃপতনের জন্য কারাদণ্ড হয়েছে বা গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় একাদিক্রমে তিনবার অনুপস্থিত থাকা, কর বাকী থাকা ইত্যাদি কারণে কোন সদস্যকে অপসারণ করতে পারেন। অবশ্য কার্যকাল শেষ হবার আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের যে কোন সদস্য ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের (BDO) কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করতে পারেন। প্রধান বা উপপ্রধানের নির্বাচন বা কার্যকাল সম্পর্কে একই নিয়ম প্রযোজ্য।

(ঙ) বিশেষ পরিস্থিতিতে তলবী সভা আহ্বানের ব্যবস্থা আছে। এক তৃতীয়াংশ সদস্য লিখিত অনুরোধের পরও প্রধান সভা না ডাকলে ৩৫ দিনের মধ্যে একটি সভা আহ্বান করতে পারেন। মোট সদস্য সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ উপস্থিত থাকলে সভার কোরাম হয়।

(চ) গ্রাম সভা ও গ্রাম সংসদ পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দুটি অভিনব সংস্থা। প্রতিটি গ্রাম এলাকার নির্বাচিত ভোটি দাতাদের নিয়ে গঠিত হয় গ্রাম সভা। গ্রাম সংসদ হল গ্রামের প্রতিটি নির্বাচন এলাকার ভোটদাতাদের নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্র আইনসভার মত প্রতিষ্ঠান। গ্রাম পঞ্চায়েত (গ্রামের কার্যনির্বাহী সংস্থা যা নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে

গঠিত) ৭দিনের নোটিশ দিয়ে গ্রাম সংগ্রহের সভা ডাকতে পারে। গ্রাম সভার সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান ও তার অনুপস্থিতিতে উপপ্রধান। গ্রামসভা বসে বছরে একবার, ডিসেম্বর মাসে। গ্রাম সংসদ বসে বছরে দুবার—মে ও নভেম্বর মাসে। গ্রাম সংসদ নিজ এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প, সামাজিক ন্যায়, গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নতির অগ্রাধিকার, দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী, বয়স্ক শিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, শিশুকল্যাণ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া নীতি নির্ধারণ ও পরামর্শ দেওয়ার কাজ করে। পঞ্চায়েতের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দায়বদ্ধতার উপর গ্রাম সংসদ আলোচনা করে। গ্রাম সংসদের সিদ্ধান্তই গ্রাম পঞ্চায়েতের মতামত সহ গ্রাম সভায় পেশ করা হয় এবং সভা ও বাপারে বিচার বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত নেয়।

(ছ) নতুন আইনে গ্রাম পঞ্চায়েতের আগেকার কাজের দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে একে আরও স্বাধীন ও স্বনির্ভর হবার ব্যবস্থা রেখেছে। আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু অবশ্য পালনীয় (জনস্বাস্থ্য, সংরক্ষণ, রাস্তাঘাট নির্মাণ পানীয় জল সরবরাহ, নিষ্কাশন, কর, ধার্য ইত্যাদি) এবং স্বেচ্ছাধীন দায়িত্ব (রাস্তা আলোকিত করা, বাজার স্থাপন, কুটীর শিল্পের প্রসার, গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপন, আদমসুমারি ইত্যাদি এবং রাজ্য সরকার আরোপিত কিছু দায়িত্ব (যেমন প্রাথমিক, সামাজিক, কারিগরী, বৃত্তিশিক্ষা, পল্লী মঙ্গল, পুনর্বাসন ইত্যাদি) ছিল। এই সব দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েতকে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের তদারকী, বাড়ি নির্মাণের অনুমোদন, পরিকল্পনা গ্রহণ এসব ক্ষেত্রে স্বাধীন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

(জ) নতুন পঞ্চায়েত আইনে পঞ্চায়েতের হিসাব পরীক্ষা ও অডিটের ব্যবস্থা ডেবিকার করা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের আলাদাভাবে বা মিলিতভাবে ক্ষমতা প্রদান, গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে মাসুল, আয়কর ধার্যের ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে বা ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এই আইনে।

২। পঞ্চায়েত সমিতি ঃ ১৯৯২ সালের সংশোধিত পঞ্চায়েত আইনে পঞ্চায়েতের মধ্যবর্তী স্তর পঞ্চায়েত সমিতি বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ওই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম হল—

(ক) তফসিল জাতি ও উপজাতি ও মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ। এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের মত একই নিয়ম বা বিধি প্রযোজ্য।

(খ) পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতিকে পূর্ণ সময়ের কৃত্যকারী (Functionary) হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এবং পঞ্চায়েত তহবিল থেকে তাঁদের বেতন দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

(গ) পঞ্চায়েত সমিতিকে পূর্বেকার কাজগুলি (কৃষি, জল সরবরাহ, সেচ জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি) ছাড়াও সুসংহত নগরায়ন পরিকল্পনা রচনা ও তাকে কার্যকর করার জন্য আইনগত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ১১৪ক ধারা এনে এক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হল জমির বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের জন্য, জমির উন্নয়নের জন্য জনস্বার্থে একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত সমিতির এলাকার জন্য পেশ করতে পারেন। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত এই পরিকল্পনা অনুসারে পঞ্চায়েত সমিতির অনুমতি ছাড়া ঐ এলাকায় কোন বাড়ী নির্মাণ করা যাবে না।

(ঘ) জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ, পূর্ত ও পরিবহন শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য, ক্রীড়া এইসব স্থায়ী সমিতির সঙ্গে বন ও ভূমি সংস্কার, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ, খাদ্য ও সরবরাহ, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তিযুক্ত পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতির সংখ্যা ও পরিধি বাড়ানো হয়েছে এবং সমিতির কর্মাধ্যক্ষদের আইনগত ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট হয়েছে নতুন সংশোধনী আইনে।

(ঙ) নতুন আইনে গ্রাম পঞ্চায়েতের মত পঞ্চায়েত সমিতিকে সম্পদ সংগ্রহের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

(চ) পঞ্চায়েত সমিতির হিসাব পরীক্ষার বিষয়টিতেও নতুন আইনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সতর্ক নজরদারীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জেলা পরিষদকে।

৩. জেলা পরিষদ ঃ নতুন পঞ্চায়েত আইনে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর জেলা পরিষদকেও নবরূপ দান করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও

(ক) তপসিল জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহ সভাধিপতিকে পুরো সময়ের কৃত্যকারী হিসাবে গণ্য করা, ইত্যাদি নতুন সংশোধনী আইনের বৈশিষ্ট্য।

(খ) ১৯৯২ সালের আইনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য জেলা পরিষদের উপর গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি কাজের তদারকী ও প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণভার অর্পণ। এক্ষেত্রে জেলা পরিষদের দায়িত্বের কথা বিস্তারিত বলা হয়েছে এবং দায়িত্বে নতুন মাত্রা আনা হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতকে করণীয় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার ব্যাপারে আপত্তি জানানো বা নির্দিষ্ট সময়ে ও দায়িত্ব পালনের বিষয় বিবেচনা করার জন্য জেলা পরিষদ বলতে পারে। বর্তমান আইনে বিধান জেনে কাজ করতে ব্যর্থ হলে জেলা পরিষদ গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতিকে এই আইন মেনে কাজ করার নির্দেশ দিতে পারে। আবার জেলা পরিষদ এই কাজ করার জন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করতে পারে। জেলা পরিষদ এমন নির্দেশও দিতে পারে যে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েত ঐ কাজ বাবদ খরচের অর্থ জেলা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মিটিয়ে দেবে। একইভাবে পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েত যদি কর, মাশুল শুল্ক ধার্য করতে ব্যর্থ হয় বা পঞ্চায়েত সমিতি ও তার স্থায়ী সমিতি যদি সভা, আহ্বান করতে ব্যর্থ হয় বা পঞ্চায়েত সমিতি ও তার স্থায়ী সমিতি যদি সভা, আহ্বান করতে ব্যর্থ হয় তবে জেলা পরিষদ এক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয় নির্দেশ জানাবে।

(গ) পঞ্চায়েত সমিতির মত জেলা পরিষদেরও এর কাজের মান বাড়াতে স্থায়ী সমিতি গঠন করে ও ওদের সাহায্য নেয়। পঞ্চায়েত সমিতির মতই এখানে স্থায়ী সমিতির সংখ্যা ও নামের পরিবর্তন হয়েছে। সমিতিগুলির কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্ব, কর্তব্য ও পারিশ্রমিক, ছুটি ইত্যাদিও নির্ধারিত হয়েছে এই আইনে। জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতিগুলিতে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদাধিকার বলে সদস্য হবেন।

প্রাক্তলিপি ঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের মতই পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের সদস্যদের ক্ষেত্রে দলত্যাগ বিরোধী আইন প্রযুক্ত হবে ১৯৯৪ সালে পঞ্চায়েত সংশোধন আইনে একথা বলা হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতিও জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতিগুলি হবে রাজ্য সরকারের বা কোন বিধিবদ্ধ সংস্থার বা কোনও কর্পোরেশনের আধিকারিক বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্য থেকে। সমিতির সদস্যদের সংখ্যা নির্ধারণ করবে রাজ্য সরকার।

৪. পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত সংশোধন আইনের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল অর্থ কমিশন গঠন। নতুন আইনের ২০৬ক ধারায় অর্থকমিশন সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা হল ঃ

(ক) আইনবিদ, অর্থনীতিবিদ, প্রশাসক এবং বিশিষ্ট সমাজকর্মী বা রাজনৈতিক কর্মীর মধ্য থেকে সভাপতি সমেত অনধিক ৫ জনকে নিয়ে রাজ্য সরকার সময়ে সময়ে একটি অর্থ কমিশন গঠন করবে।

(খ) কমিশনের মেয়াদ ১ বছর। তবে প্রয়োজন হলে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এর মেয়াদ আরও ৬ মাস বাড়াতে পারেন।

(গ) কমিশনের কোন সদস্য বা সভাপতি পদত্যাগ করলে মুখ্য সচিবের (Chief Secretary) কাছে লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র পেশ করতে হবে। যতদিন এই পদত্যাগ পত্র গৃহীত না হবে ততদিন স্বপদে থেকে তাঁকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

(ঘ) অর্থ কমিশনের প্রধান কাজ হল গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত বিষয়ে সুপারিশ করা (১) যে সব নীতির ভিত্তিতে রাজ্য এবং গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের মধ্যে কর, শুল্ক, পথকর ফি বাবদ নীট আয় বন্টিত হবে, সেই সব নীতি নির্ধারণ ও নির্ধারিত নীতির ভিত্তিতে সেগুলি বন্টন করা। (২) কোন কোন কর, শুল্ক, পথকর বা ফি থেকে সংগৃহীত অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদকে দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করা এবং (৩) রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল থেকে কোন কোন নীতির ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদকে অনুদান (Grant) দেওয়া হবে তা স্থির করা। পশ্চিমবঙ্গের অর্থ কমিশনের অন্য একটি কাজ হল গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের আর্থিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করতে রাজ্য সরকার কর্তৃক অর্থ কমিশনের নিকট প্রেরিত যে কোন বিষয়ে সুপারিশ করা।

৭.৬ পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ঃ বাস্তব ও সাম্প্রতিক চিত্র

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ১৯৭৮ সালের পর থেকেই একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়েছে। পূর্বেকার কেন্দ্রিভূত, আমলাতান্ত্রিক নির্ভর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণ নীতির বাস্তব রূপায়ন ঘটেছে একথা অনেকেই বলেন। সন্দেহ নেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমেই গ্রামের মানুষ স্ব-নির্ভর হয়েছে গ্রামোন্নয়নের কাজে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত করার সুযোগ পেয়েছে। ১৯৮৪ ও ১৯৯২ সালের আইনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরো সুসংবদ্ধ, আরো দায়বদ্ধ করা হয়েছে। তপসিলি জাতি ও জনজাতির জন্য বা মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে, পঞ্চায়েতের নির্বাচন নিয়মিত করে, গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের আর্থিক ও প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা প্রকাশ করে, পঞ্চায়েতের হিসাব ও অডিটের ব্যবস্থাকে জোরদার করে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আজ সারা দেশে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এটাই বাস্তব চিত্র। গ্রামে স্বাক্ষরতার বিস্তার, জনস্বাস্থ্যের তদারকি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও যোজনাকে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে সফল করার কাজে আণবিকভাবে দায়িত্ব পালন, পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থার গঠনমূলক চরিত্রকে প্রকাশ করে।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে প্রকৃত অর্থেই রাজনৈতিক চরিত্র দান করা হয়েছে। প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীকে সফল করার অনেকটা দায়িত্বই পঞ্চায়েতের উপর পড়েছে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকারের ৭৩তম সংবিধান সংশোধন আইনের প্রকৃত পরিপূরক হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে ১৯৯২ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত সংশোধনী আইনকে। এই আইন পঞ্চায়েত নির্বাচন, গ্রামের স্বায়ত্তশাসনকে প্রকৃতই মর্যাদাসম্পন্ন করেছে। স্থানীয় কাজে গ্রামের মানুষের অংশগ্রহণ পশ্চিমবঙ্গে আজ আর তত্ত্বকথা নয়। কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রশাসন বা মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভরতা কমেছে, নির্ভরতা বেড়েছে গ্রামের স্বাস্থ্যকর্মী, আধিকারিক, সমিতি, সভা আর গ্রাম সংসদের উপর। উন্নয়ন কর্মসূচীকে সার্থক করতে এরাই প্রকৃত দায়িত্ব নেয়। তৃতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে দেশের ও বিদেশের সমীক্ষক দল, গবেষকরা বিশেষভাবে উৎসাহ দেখিয়েছেন ও আলোকপাত করেছেন। কোন কোন লেখক মনে করেন। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত সম্পর্কে গঠনমূলক ব্যবস্থা এক্ষেত্রে ভারত সরকারের দৃষ্টি ফেরাতে অনুপ্রেরণা ও দৃষ্টান্ত হিসাবে কাজ করেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ আজ প্রকৃতই উন্নয়ন কর্মসূচীর কেন্দ্র। এদের পরিচালন পদ্ধতি ও কাজকর্ম নানাভাবেই অভিনবত্বের দাবি করতে পারে।

তবে পঞ্চায়েতের কাজকর্মে সব ক্ষেত্রেই আশার সঞ্চার হয়েছে এমন দাবি করা যায় না। সম্পদ সৃষ্টির কাজে বা অর্থ সংগ্রহের কাজে বা কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়নের কাজে পশ্চিমবঙ্গের, পঞ্চায়েত আজও বড় বেশি সরকার নির্ভর, এলাকার প্রধান রাজনৈতিক দলের উপর নির্ভর করে থাকে। পরিকল্পনা কার্যকর করার চেয়ে বিশেষ রাজনৈতিক দলের নীতিকে কার্যকর করার দিকে ঝোঁক স্পষ্ট। দ্বিতীয়ত, সমালোচক ও গবেষকরা পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতের প্রথম দশ বছরের (১৯৭৮-১৯৮৮) কাজকর্মে যতটা তৎপরতা লক্ষ্য করেছেন, পরবর্তীকালে সেই একই তৎপরতার অভাব লক্ষ্য করেছেন। কর্মসূচী আজ তেমন গঠনমূলক নয়, স্থির লক্ষ্যমাত্রা নেই, ভূমি সংস্কারেও পঞ্চায়েত তেমনভাবে সক্রিয় নয়। তৃতীয়ত, পঞ্চায়েতকে কর্মতৎপর করতে চাই গ্রামের মানুষদের জন্য প্রকৃত নাগরিক শিক্ষা। অনেকেই অভিযোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত হয়ে উঠেছে দলীয় ক্ষমতার কেন্দ্র। উন্নয়নের জন্য নয়, পঞ্চায়েতের সদস্য বা দলীয় স্বার্থ রক্ষার কাজেই নিবেদিত। পঞ্চায়েতের নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আরো উন্নত হবে, পরিশীলিত হবে গ্রামের মানুষের মধ্যে দল-মত, জাতি-ধর্ম, নারী-পুরুষে নির্বিশেষে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ সহজ ও সুনিশ্চিত হবে এটা বলা হলেও কার্যত পঞ্চায়েত হয়েছে স্থানীয় ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর ক্ষমতা বৃদ্ধির আর সুযোগ-সুবিধা বিতরণের কেন্দ্র। বিগত তিনটি পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক কাজিয়া হিংসা আর দলীয় কোন্দল বেশী করে। চোখে পড়েছে। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে শাসক দলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টি বিরোধী প্রার্থীকে প্রচারে বাধা দেওয়া ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থী নির্বাচনের অভিযোগ উঠেছে। আবার শাসক দলের পক্ষ থেকে এসব অভিযোগ বিরোধীদের ঘৃণ্য প্রচার, প্রতিক্রিয়াশীলতা ও নৈরাশ্যবাদের প্রকাশ বলে মন্তব্য করা হয়েছে। শাসক বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে রাজ্যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও পঞ্চায়েতের ভিত্তি আরো দৃঢ় হয়েছে। পঞ্চায়েতের কাজকর্ম এবং পরবর্তী তিনটি পঞ্চায়েত নির্বাচন (১৯৯৩, ১৯৯৮, ২০০৩) পশ্চিমবঙ্গের বিকেন্দ্রিকরণের কর্মধারার প্রতি মানুষের আস্থাকে প্রমাণ করে।

পঞ্চায়েত সম্পর্কে আরো কিছু প্রশ্ন আছে। এগুলি হল (১) পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের কাজে আরো দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বাড়ানো প্রয়োজন। (২) পঞ্চায়েতের মহিলা এবং অনগ্রসর মানুষের প্রতিনিধিরা এলেও এদের কাজে দায়িত্ববোধ ততটা স্পষ্ট নয়। এঁদের আমলা ও কর্মচারীদের উপর নির্ভরশীলতা বড় বেশি। (৩) বিভিন্ন স্তরের পঞ্চায়েত প্রতিনিধি কর্মী ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব আছে। (৪) পঞ্চায়েতে কেন্দ্রীয় অর্থের সদ্ব্যবহার হয় না। পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে অর্থের অপচয় ও নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টির অসামর্থ্য নিয়েও অভিযোগ আছে। (৫) সবচেয়ে বড় প্রশ্ন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রকৃতই গ্রামের গরীব মানুষের কাছে যাচ্ছে কিনা। পঞ্চায়েত সম্পর্কে কিছু গঠনমূলক পরামর্শও আছে-পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। পঞ্চায়েতের কাজে গ্রামের মহিলা, আদিবাসী ও অনগ্রসর শ্রেণীকে এগিয়ে আনার জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনকে আরো উদ্যোগী হতে হবে। পঞ্চায়েত নিয়ে আরো গবেষণা ও সমীক্ষা প্রয়োজন। পঞ্চায়েতকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন ও প্রচারও চাই। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের বিশেষ দায়িত্ব আছে। কেন্দ্রীয় সরকারকেও পঞ্চায়েত সংগঠনের কাজে অভিভাবকের মত দায়িত্ব পালন করতে হবে। দায়বদ্ধ পঞ্চায়েত গড়ে তুলতে হলে নির্বাচন কমিশন অর্থ কমিশনকে আরো সচল করতে হবে। পার্লামেন্ট বা রাজ্য বিধানসভার মত, গ্রাম সভা ও গ্রাম সংসদকে সরকারের তৃতীয় স্তর পঞ্চায়েতের প্রকৃত দায়িত্বশীল মঞ্চ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন স্বেচ্ছামূলক সংগঠনের মধ্যে সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গি চাই। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের সাফল্যের এটাই অন্যতম পথ।

৭.৭ পঞ্চায়েত : সাম্প্রতিক সর্বভারতীয় রাজনৈতিক চিত্র

নব্বই-এর দশক থেকে পঞ্চায়েত সম্পর্কে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেই একটা কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। কৌতূহলের প্রধান কারণ পঞ্চায়েত সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন। এই পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আমরা পাই পঞ্চায়েতকে শাসনতান্ত্রিক মর্যাদায় উন্নীত করার মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পঞ্চায়েতকে প্রকৃত অর্থেই রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক ও উন্নত করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মধ্য দিয়ে পঞ্চায়েত পেল সংবিধানগত গুরুত্ব। এর ফলে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণ ও পঞ্চায়েতে স্ব-শাসিত চরিত্র ও মর্যাদা আরো বেড়ে গেল। পঞ্চায়েতের সাংবিধানিক মর্যাদা নিতে পরের এককে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এতকাল পঞ্চায়েত সম্পর্কে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারগুলির দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট ছিল না। শিক্ষার্থী পাঠক আগেই জেনেছেন ১৯৫২ থেকে ১৯৭৭ এই পর্বে পঞ্চায়েত সম্পর্কে স্পষ্ট কোন রাজনৈতিক দৃষ্টি ছিল না। বিনোবা ভাবে বা জয়প্রকাশের চিন্তাধারায়, সাংগঠনিক কাজকর্ম ও প্রচারে প্রাধান্য পায় গান্ধীজির দলহীন গণতন্ত্রের প্রেরণা। এই কারণে তাঁরা পঞ্চায়েত সংগঠনের দলীয় প্রচার বা উদ্যোগের বদলে নিয়ে এসেছেন সর্বোদয়ের ভাবনা। অন্যদিকে গ্রামশাসন ও সংগঠনের প্রশ্নে শাসক কংগ্রেস দলের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোন সঙ্গতি ছিল না। প্রাথমিকভাবে বিকেন্দ্রিকরণ আর পঞ্চায়েত সংগঠনের ব্যাপারে সাংগঠনিক উদ্যোগ বা রাজনৈতিক ইচ্ছার প্রকাশ পেলেও সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর বাইরে এ বিষয়ে কংগ্রেস দলের কোন মতাদর্শগত উৎসাহ ছিল না। স্বভাবতঃই পঞ্চায়েত সম্পর্কে কংগ্রেস দলের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সংকীর্ণ, উদাসীন দৃষ্টির ফলেই পঞ্চায়েত সংগঠনের কাজ থেমে থেকেছে। এই উদাসীনতার ফলেই একসময় দলের রাজনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হতে থাকে। গ্রামীণ ভারতে তার রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে কংগ্রেস পিছিয়ে পড়ে। পঞ্চায়েত সংগঠনের প্রশ্নে জনতা সরকারের আগ্রহ ও অশোক মেহতা কমিটির রিপোর্ট সরাসরি না হলেও প্রচ্ছন্নভাবে গ্রামীণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে কংগ্রেসকে প্রভাবিত করেছে। পরিকল্পিত অর্থনীতির বাইরে না গেলেও আশীর দশক থেকে গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের সদিচ্ছা প্রকাশ পেল। পঞ্চায়েত সম্পর্কেও দলের আগ্রহ সৃষ্টি হল। এই উৎসাহ ও আগ্রহের পরিণতি হিসাবেই পঞ্চায়েতের অবস্থান বিষয়ে সংবিধানগতভাবে সরকারের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

১৯৯৬ সাল থেকে ২০০০ এই পর্বে পঞ্চায়েত সংগঠন বা সংস্কার বিষয়ে রাজনৈতিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে তেমন কোন প্রস্তুতি বা উদ্যোগ ছিল না। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে ইতিপূর্বেই রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির উত্থান হয়েছে। কংগ্রেস ও ভারতীয় জনতা পার্টি এই দুই প্রধান রাজনৈতিক শক্তির মাঝামাঝি তৃতীয় ফ্রন্ট হিসাবে আর্বিভূত হয়েছে জনতা দল, সমাজবাদী পার্টি ও বাম দলগুলির মোর্চা। নবম লোকসভা নির্বাচনের (১৯৮৯) পর জনতা দলের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় মোর্চা ক্ষমতায় এলেও স্থায়ী হয় নি। দশম লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস (আই) সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধন বিল এনে পঞ্চায়েতকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেয়। ১৯৯৬ সালে একাদশ লোকসভার নির্বাচনে কোন দলই সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায় নি। এই পর্বে বি. জে. পি.র সমর্থনে যুক্তফ্রন্ট কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ১৯৯৬ সালে কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে বাম-গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (যুক্তফ্রন্ট, তৃতীয় ফ্রন্ট) বি. জে. পি. কে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়। যুক্তফ্রন্টও ক্ষমতায় বেশিদিন টিকে থাকেনি সরকার থেকে কংগ্রেস সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়াতে। ১৯৯৮ সালে দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচনের পর বি. জে. পি. আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে জোট করে ক্ষমতায় এলেও আবার এই সরকারের পতন ঘটে। এই পর্বে জোট ভাঙা গড়ার বিন্যাসে ডি.এম.কে. সমাজবাদী পার্টি, এ. আই. ডি. এম. কে. তেলেগু দেশম প্রভৃতি আঞ্চলিক দল কখনও ভিন্নতা আবার কখনও অভিন্নতার শক্তি (Cermutation and Combination) হিসাবে কাজ করেছিল। ১৯৯৯ সালের ত্রয়োদশ নির্বাচনে বি. জে. পি'র নেতৃত্বে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট ক্ষমতায় আসে। এই জোটই এখনও কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন

দল হিসাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছে। এই পর্বে আঞ্চলিক রাজনীতিতেও দলীয় আধিপত্যের ক্ষেত্রে এবং সরকার গঠনের ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, অন্ধ্র এবং বিহার ছাড়া প্রায় সব রাজ্যেই রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে। কেন্দ্রের বি.জে.পি. সরকার পঞ্চায়েত সংগঠন বা সংস্কারের প্রশ্নে নির্বাচনী ইস্তাহারে গভীর আগ্রহ দেখালেও এ ব্যাপারে কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয় নি। গ্রামোন্নয়নের কিছু কর্মসূচী রূপায়নের প্রস্তাব অবশ্য এই সরকার নিয়েছে। গ্রাম সংগঠনের ব্যাপারে যুক্তফ্রন্ট সরকারের (দেবেগৌড়া/আই. কে. গুজরালের নের্তৃত্বে সরকার) পূর্বের জনতা পার্টির কর্মসূচী এবং বামফ্রন্ট সরকারের রাজনৈতিক পঞ্চায়েতের ধারণাকে সমর্থন করেই তার দায়িত্ব সেরেছে। অল্পকালের স্থায়িত্বে খুব বিশেষ কিছু করাও এর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

নব্বইয়ের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে রাজ্যে রাজ্যে স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে উৎসাহ এলেও, এক দলীয় আধিপত্যের ফলে, দলীয় চাপের আবর্তে পরে পঞ্চায়েত রাজনীতিতে যেন ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বাতাস রুদ্ধ হতে থাকল। কর্ণাটক, অন্ধ্র, গুজরাট, কেরল, বিহার, সর্বত্রই আঞ্চলিক দলীয় আধিপত্যের জোয়ারে ভেসে গেল স্থানীয় গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ন্যূনতম প্রত্যাশা। অনেক রাজ্যেই নির্বাচন এড়িয়ে সহমত তৈরির প্রচেষ্টা হয়েছে। কর্ণাটকে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কোথাও কোথাও অ-রাজনৈতিক ভিত্তিতে নির্বাচন হয়েছে এবং মাত্র কিছু আসনে নির্দল প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। স্থানীয় সংস্থায় প্রার্থী পছন্দের ক্ষেত্রে কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মানা হয় নি। প্রার্থী পছন্দের ক্ষেত্রে দলের বিধায়ক বা সাংসদরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ধারকের ভূমিকা পালন করেছেন, দলের স্থানীয় নের্তৃত্বের মতামত অনেক ক্ষেত্রেই নেওয়া হয় নি। প্রাথী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনেক রাজ্যে কোন আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বা জনমত যাচাই করার ব্যবস্থা ছিল না। পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানে পদাধিকার বলে সাংসদ বা বিধায়কদের সদস্য করার ব্যবস্থাও স্থানীয় উদ্যোগ বা উৎসাহ সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল নয়। এখনও নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ছাতার তলায় চলেছে ভূস্বামী, বিত্তশালী আর উঁচু জাতের মানুষকে ক্ষমতা পাইয়ে দেবার খেলা। রাজনৈতিক পঞ্চায়েতকে অস্বীকার করে ভূমি সংস্কার ও ন্যায্য বন্টনের কাজকেও এড়িয়ে যাবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে অনেক পঞ্চায়েতেই। অনেক রাজ্যে স্থানীয় শাসন কাঠামো বিষয়ে, সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাবকেও পঞ্চায়েতের গঠন প্রণালী ও কাজকর্মে মানা হচ্ছে না। ব্লক ও জেলা স্তরে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানে সদস্য ও সভাপতি নির্বাচনে স্থানীয় উৎসাহ ও মতামতকে উপেক্ষা করে, গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে খাটো করে রাজনৈতিক দলগুলি যেভাবে নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে চলেছে তা কখনই সুস্থ রাজনীতির নজির নয়। এ যেন নতুন মোড়কে পুরো পুরোনো পঞ্চায়েতকেই ফিরিয়ে আনা হল। পঞ্চায়েতে জাতি-বর্ণ-গোষ্ঠী মেরুকরণও কর্ণাটক, অন্ধ্র, তামিলনাড়ুর মত দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে। উত্তরের রাজ্যগুলিও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই।

৭.৮ সারাংশ

ভারতে গ্রামীণ রাজনীতির দুটি গতি ছিল শাসন সংগঠনে গান্ধীজির ভাবনাকে প্রয়োগ ও এ বিষয়ে শাসক কংগ্রেসের প্রচলিত ও গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গী। গান্ধীজির ভাবনাকে এদেশে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন বিনোবা ভাবে ও জয়প্রকাশ নারায়ন। প্রধানত অরাজনৈতিক দৃষ্টি নিয়ে গ্রাম সংগঠনে লোকশক্তিকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন বিনোবা ভাবে ও জয়প্রকাশ নারায়ন। কংগ্রেসের দৃষ্টি আইনগত ও প্রশাসনিক পথে পরিচালিত হলেও পঞ্চায়েতের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পন্থা অবহেলিত হয়েছে। ১৯৭৭ সালের আগে ভারতবর্ষে পঞ্চায়েত সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। যদিও বলবন্ত রাই মেহতা কমিটি এ বিষয়ে কিছু ধারণা দিয়েছে এই ধারণাকে কার্যে পরিণত করার উদ্যোগ শাসক কংগ্রেস দল নেয় নি। ১৯৭৭ সালে অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশ মেনে জনতা সরকার দ্বিতীয় প্রজন্মের (পঞ্চায়েতের প্রথম প্রজন্মটি কংগ্রেস শাসনে কেটেছে অনেক অবহেলার মধ্য দিয়ে) জন্য

এক পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সুপারিশ করে। এই সুপারিশের ভিত্তিতে আশির দশক থেকেই পঞ্চায়েত সংগঠনের ব্যাপারে রাজ্যে রাজ্যে উৎসাহ সৃষ্টি হলেও পশ্চিমবঙ্গই প্রথম একটি সুবিন্যস্ত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করে ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে। কংগ্রেস সরকার কর্তৃক বিধিবদ্ধ ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনকেই পঞ্চায়েত সংগঠনে প্রয়োগ করে বামফ্রন্ট সরকার। বামফ্রন্ট সরকারের রাজনৈতিক পঞ্চায়েতের ভাবনার পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎসাহ যুগিয়েছে ১৯৭৭ সালের আগের দশ বছরের কিছু অভিজ্ঞতা এবং কিছু ঐতিহাসিক আমূল সংস্কারবাদী ভাবনা, তেভাগা, তেলেঙ্গানা ও নকশালবানীর কৃষি বিপ্লবের অভিজ্ঞতা, কেরালার প্রথম কমিউনিষ্ট সরকারের শাসন-অভিজ্ঞতা, পশ্চিমবঙ্গের দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের নীতি এবং অবশ্যই কেন্দ্রের জনতা দলের শাসন ও পঞ্চায়েত সম্পর্কে অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশ পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পঞ্চায়েত গঠনের ক্ষেত্রে প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। এর সঙ্গে ছিল কমিউনিষ্ট ও বামপন্থী দলগুলির মতাদর্শগত ভাবনা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ।

বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতকে রাজনীতির অঙ্গনে এনে নির্বাচিত পঞ্চায়েতের যে রূপরেখা তৈরী করে ১৯৭৮ সালে তাকে সামনে রেখেই ১৯৭৮ থেকে ২০০৩ এই সময়কালের মধ্যে ৬টি নির্বাচন হয়েছে। ১৯৭৩ সালের আইন স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে যথোপযুক্ত নয় ভেবেই ১৯৮৪, ১৯৯২ সালে দুটি আইনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতকে আরো শক্তিশালী, সংহত ও গণতান্ত্রিকভাবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেছে। নতুন পঞ্চায়েত আইনে পঞ্চায়েতে তফসিলী জাতি-উপজাতিদের জন্য, আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা, নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ, বাধ্যতামূলক পঞ্চায়েত নির্বাচন, পঞ্চায়েতের আর্থিক স্বয়ংভরতা, আর্থিক ও প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে অতিরিক্ত দায়িত্ব—নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের অভূতপূর্ব গতির কথা মাথায় রেখে বলা যায়, পঞ্চায়েত পশ্চিমবঙ্গের এক বিরাট প্রাপ্তি, কিন্তু এর কাজকর্ম আরো গঠনমূলক, আরো সংযত এবং আরো গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হওয়া দরকার।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নব্বই-এর দশক থেকে পঞ্চায়েতের কাজকর্মে উৎসাহ এলেও নব্বই দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এই উৎসাহ স্তিমিত হয়ে পড়ে অতিরিক্ত দলীয় অনুপ্রবেশ আর পঞ্চায়েতের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে খর্ব করার প্রচেষ্টায়। গুজরাট, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু—সব রাজ্যেই পঞ্চায়েতের এই অধঃগতি লক্ষ্যণীয়।

৭.৯ অনুশীলনী

১। একটি বা দুটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

(ক) ভারতবর্ষে গ্রামীণ সংগঠনে গান্ধীজির ভাবনাকে কারা প্রয়োগ করেন?

(খ) সর্বোদয় আন্দোলনের আসল কথা কী?

(গ) ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে জয়প্রকাশ কোন্ পথে পুনর্গঠন করতে চেয়েছেন?

(ঘ) পঞ্চায়েত সংগঠনে কংগ্রেসের ব্যর্থতার দুটি কারণ উল্লেখ করুন।

(ঙ) নব প্রজন্মের পঞ্চায়েতের প্রবক্তা কে?

(চ) গ্রাম পঞ্চায়েতের দুটি আবশ্যিক কাজ কী কী?

(ছ) গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের উৎস কী?

(জ) গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কে?

(ঝ) জেলা পরিষদের প্রধানকে কী বলা হয়?

(ঞ) রাজনৈতিক পঞ্চায়েত কী?

২। অনধিক ৫০ শব্দের মধ্যে উত্তর করুন ঃ

(ক) বিনোবা ভাবের গ্রাম সংগঠনের ধারণা কী লিখুন।

(খ) পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পঞ্চায়েত সংগঠনে শাসক দলের ব্যর্থতার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করুন।

(গ) ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের অভিনবত্ব কী?

(ঘ) ১৯৯২ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের চারটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত সম্পর্কে কয়েকটি পরামর্শ দিন।

৩। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন (অনধিক ১৫০ শব্দে) ঃ

(ক) পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩, সম্পর্কে টীকা লিখুন।

(খ) পঞ্চায়েত সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

(গ) ১৯৯২ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন বিষয়ে সংক্ষেপে লিখুন।

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যায়ন করুন।

(ঙ) ভারতবর্ষে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি নিয়ে মন্তব্য করুন।

৭.১০ উদ্দেশ্য

১। A. R. Desai : **Rural Sociology in India (1978).**

২। A. K. Mehra, D.D. Khanna, G.W. Kueck (eds) : **Political Parties and Party Systems.**

৩। Niladri Bhattacharya "Rural Government in India", Rakharani Chatterji (ed). **Politics India : The State-Society Interface (2001).**

৪। দেবাশিস চক্রবর্তী ঃ গণপ্রশাসন, পরিচালন ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা (১৯৯৫)।

একক ৮ □ গ্রামীণ শাসন-ব্যবস্থা : নব সাংবিধানিক মর্যাদা

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য
৮.২ প্রস্তাবনা
৮.৩ গ্রামীণ শাসনের সাংবিধানিক তাৎপর্য : তুলনামূলক আলোচনা
৮.৪ ভারতের গ্রামশাসনের নতুন গতি : পঞ্চায়েতের সাংবিধানিক মর্যাদা
৮.৫ সংবিধান সংশোধন আইনের পটভূমি
৮.৬ সংবিধানের ৭৩তম সংশোধন : প্রধান বৈশিষ্ট্য
৮.৭ নতুন সংবিধান সংশোধন আইনের তাৎপর্য
৮.৮ বিভিন্ন রাজ্যে পঞ্চায়েত : সংবিধান সংশোধনের প্রভাব ও সাম্প্রতিক গতি
৮.৯ সারাংশ
৮.১০ অনুশীলনী
৮.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে শিক্ষার্থী পাঠক —

- তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে ভারতে গ্রামীণ শাসন ও সরকারি ব্যবস্থাপনার সাধারণ ও সাংবিধানিক তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।
- পঞ্চায়েতকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেবার জন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যে সব প্রস্তুতি ও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে ধারণা লাভ করতে পারবেন। গ্রামীণ শাসন সম্পর্কিত নতুন সংবিধান সংশোধন আইনের পটভূমি, বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে ধারণা পাবেন এবং এ বিষয়ে নিজের মতামত গঠন করতে পারবেন।
- রাজ্যে রাজ্যে সংবিধান সংশোধনের প্রভাব কী পড়েছে এবং এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক গতিটি কী তা চিহ্নিত করতে পারবেন।

৮.২ প্রস্তাবনা

গ্রামের স্বায়ত্তশাসনমূলক ব্যবস্থা স্থানীয় শাসন তথা গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তিকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করে। প্রায় সব দেশেই গণতান্ত্রিক শাসনের এই ধারাকে স্বীকার করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনী ও সরকারি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। ভারতেও গ্রামীণ শাসনের এই ধারাটি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনকালে এই ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ঘটেছে প্রশাসনিক ও আইনগতভাবে। স্বাধীন ভারতবর্ষে গ্রাম শাসনের উদ্ভব ও বিকাশে প্রাথমিকভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার বাইরে গিয়ে

নতুনভাবে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা ভাবা হয় নি। পরবর্তীকালে অবশ্য দেশের বাস্তব পরিস্থিতি ও চাহিদা এবং গ্রামীণ উন্নয়ন ও সংগঠনের ব্যবহারিক কার্যকারিতার বিষয়টি উপলব্ধি করে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক দৃষ্টি দেওয়া হয়। ১৯৯২ সালে ৭৩ তম সংবিধান সংশোধন আইন এনে কেন্দ্রীয় সরকার এক্ষেত্রে তার রাজনৈতিক সদিচ্ছার পরিচয় দেয়। পঞ্চায়েতকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেবার ফলে বিভিন্ন রাজ্যে পঞ্চায়েত সংগঠন ব্যাপারে আইনী ও প্রশাসনিক তৎপরতা নব্বইয়ের দশক থেকে বিশেষভাবে বেড়ে যায়। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার অবশ্য এ ব্যাপারে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে এবং রাজনৈতিক পঞ্চায়েতের ভাবনাকে প্রয়োগ করেছে। ১৯৯২ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত সংশোধন বিল (যা আইনে পরিণত হয়েছে ১৯৯৪ সালে) নতুন এই সংবিধান সংশোধন আইনের পরিপূরক হিসাবেই রচিত সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে পূর্বেই এককে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান এককে পঞ্চায়েতের সাংবিধানিক মর্যাদাই আলোচনার মূল বিষয়বস্তু।

বর্তমান এককের প্রথম অংশে, প্রথম শাসনের সাংবিধানিক তাৎপর্য নিয়ে একটি তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরবর্তী অংশে সংবিধান সংশোধন আইনের পটভূমি ও ৭৩তম সংবিধান সংশোধন আইনের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে সংবিধান সংশোধনের প্রভাব কী পড়েছে শিক্ষার্থী পাঠকের কাছে তার একটি রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

৮.৩ গ্রামীণ শাসনের সাংবিধানিক তাৎপর্য : তুলনামূলক আলোচনা

গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের ধারণাকে শুধুমাত্র পশ্চিমী তাত্ত্বিক ভাবনা দিয়ে বিচার করলে চলে না। বিভিন্ন দেশের সংবিধানে বা শাসন ব্যবস্থায় এই ধারণার বাস্তব প্রয়োগ কী ঘটেছে প্রসঙ্গত সে বিষয়ে শিক্ষার্থী পাঠকের কাছে কিছু ধারণা পেশ করা দরকার। সরাসরি গ্রাম শাসন সম্পর্কে কিছু না বলা হলেও, অধিকাংশ রাষ্ট্রই স্থানীয় শাসনকে রূপ দেবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে তাদের সংবিধানে বা শাসন ব্যবস্থায়। কাজ করার আইনী শক্তি না পেলে, স্ব-শাসনের পেছনে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমর্থন বা অনুমোদন না থাকলে কোন স্থানীয় সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানই কার্যকর হতে পারে না। গণতান্ত্রিক শাসনকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার ('right use') তাগিদ থেকেই স্থানীয় শাসনের সংগঠনের কথা ভেবেছে অধিকাংশ রাষ্ট্র। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইউরোপের উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে 'বৃহৎ ও কার্যকর সরকারের (Big and Active Government) ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় কার্যাবলীর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বায়ত্তশাসন যে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অধ্যাপক কে.সি. হোম্যারের (K. C. Wheare) মত সংবিধান বিশেষজ্ঞ সে কথা স্বীকার করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সুইটজারল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া সব দেশেই আঞ্চলিক ও স্থানীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করে জাতীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের আইনী ক্ষমতার উপর সাংবিধানিক বা প্রথাগত সীমা আরোপ করা হয় অধ্যাপক কে.সি. হোয়্যারের 'Federal Government' বইটির সূত্রে আমরা একথা জানতে পারি। আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে, বিশেষত কর ব্যবস্থা, শিক্ষা, নাগরিক পরিষেবা, তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় আঞ্চলিক ও স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন ও সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক একথা ভেবেই অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক সরকারের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় শাসনেও প্রয়োজনীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা দেবার কথা

প্রান্তলিপি : ফ্রান্স এখনও স্থানীয় সংস্থা হিসাবে কমিউন তাঁর স্থায়িত্ব রক্ষা করে চলেছে। এখনও এদেশে প্রায় ৩৬,০০০ কমিউন নগর ও গ্রামে সক্রিয়। ব্রিটেনে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব স্থানীয় শাসন-কর্তৃপক্ষের হাতে। রাশিয়ার সংবিধানে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মাধ্যমে সমাধানের স্বাধীন সুযোগ দেওয়া হয়েছে এলাকার মানুষকে।

ভাবা হয়েছে। সামাজিক সংহতি (Social Cohesion) আর ভারসাম্যের প্রক্রিয়াকে মাথায় রেখেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংগঠিত করার ভাবনা প্রাধান্য পাচ্ছে কম বেশি প্রায় সব রাজনৈতিক ব্যবস্থায়। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান না গড়ে তুলে, প্রতিটি নাগরিককে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত না করে কোন গণতান্ত্রিক সংবিধানকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয় এই শিক্ষা মাথায় রেখে প্রায় সব দেশের সংবিধানেই স্থানীয় শাসনকে গণতন্ত্রের কার্যকরী শর্ত (Working Condition) হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্রিটেন বা ফ্রান্সের মত এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার নজির আছে। ফ্রান্সের মত কেন্দ্রিভূত ব্যবস্থায় শাসন পরিচালনার সুবিধার্থে 'কমিউনের (Commune) মত নির্বাচিত, বিধিবদ্ধ স্থানীয় সংস্থা আছে। ব্রিটেনে কাউন্টি, জেলা, গ্রামীণ কাউন্সিলের হাতে স্থানীয় পরিকল্পনা, পরিষেবা, পরিবহন, গৃহ নির্মাণ, পুলিশ ও জন-নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেমন সংবিধানগতভাবে কেন্দ্র এবং আঞ্চলিক বা স্থানীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন, সহযোগিতা বা সমন্বয়ের ব্যবস্থা আছে, ফ্রান্স, ব্রিটেন বা ওয়েলসে আঞ্চলিক বা স্থানীয় শাসনের ব্যাপারটি সেভাবে সুনিশ্চিত করা হয় নি। এখানে সংবিধান নয়, কেন্দ্রীয় সরকারই আঞ্চলিক বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করে প্রশাসনিক সুবিধার্থে ক্ষমতা এদের হাতে প্রত্যর্পণ বা হস্তান্তরিত করে (Delegation or Devolution) কানাডায়ও যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি মেনে, ক্ষমতার কঠোর বিকেন্দ্রিকরণ ঘটেনি। তবে বিংশ শতকের রাজনৈতিক বিকাশের ধারাটি অন্যরকম। ঊনবিংশ শতকের মত সরকারি ব্যবস্থাপনা আজ সীমিত রাষ্ট্রের রাতের প্রহরীর (Night Watchman State) মডেলে পরিচালিত নয়। সরকার আজ জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞের পুরোহিত হিসাবে নিয়োজিত ও নিবেদিত। নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বিধানের সাথে সাথে সরকারকে আজ সমাজ ও সমষ্টির স্বার্থে ও জাতি গঠনের কাজে গুরুদায়িত্ব বহন করতে হয়। সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দুর্বল ও অনগ্রসর মানুষের কথা ভেবেই সরকারের কাজ আজ প্রসারিত হয়েছে। গভীরে, তৃণমূল স্তরে।

শুধুমাত্র উদার গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেই নয়, স্থানীয় শাসনের ভাবনা গুরুত্ব পেয়েছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও। সোভিয়েত ইউনিয়নে (পূর্বতন) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নীতি গভীর ও বিস্তৃত করার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছিলেন লেনিন ও ষ্ট্যালিন (পূর্বতন)। সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে প্রশাসন ও পরিচালনার গণ অংশগ্রহণের ভাবনাকে কার্যকর রূপ দেবার প্রচেষ্টা ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে স্থানীয় ভিত্তিতে সংগঠিত করার মাধ্যমে। গণসংগঠন, কর্মগোষ্ঠী, সমবায়, অখন্ড জনশিক্ষা ব্যবস্থা, জন-নিয়ন্ত্রিত সংস্থার মাধ্যমে সোভিয়েত গণতন্ত্রকে কার্যকর করার ব্যবস্থা সংবিধানে ছিল। চিন দেশেও গণতান্ত্রিক পরিচালনায় মাও জে দং বৃহৎ গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্ত। চিনের সংবিধানে (১৯৮২) রাষ্ট্রের প্রশাসনিক বিভাগ হিসাবে প্রদেশ স্বয়ংশাসিত অঞ্চল, স্বয়ংশাসিত সংরক্ষিত এলাকা (Prefecture), কাউন্টি ইত্যাদি গুরুত্ব পেয়েছে। যুগোশ্লাভিয়ায় পঞ্চাশের দশকে কঠোর কেন্দ্রিভূত প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে আর্থিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের এক অভিনব ব্যবস্থার স্বপক্ষে মানুষকে সংগঠিত করার পরিকল্পনা হয়। উন্নয়নের এই নতুন সমাজতান্ত্রিক মডেলটি হল ঃ স্বাধীন স্ব-নির্ভরশীল পরিচালনা। শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য সামাজিক পরিষেবা, আর্থিক বিকাশ—সব ক্ষেত্রেই সমবায়, কমিউন শ্রম গোষ্ঠীর মাধ্যমে নাগরিক প্রত্যক্ষভাবে শাসনেও সমাজ-সংগঠনের কাজে অংশ নেবে এ কথা যুগোশ্লাভিয়ার ১৯৭৪ সালের সংবিধানে গুরুত্ব পায়। এর ফলে রাষ্ট্রের একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটানো হল। শাসন পরিচালনার দায়িত্বে এল স্থানীয় মানুষের স্ব-পরিচালিত সংস্থা।

ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণ তথা স্থানীয় গণতন্ত্রকে কেমনভাবে উজ্জীবিত করা সম্ভব তা নিয়ে সরকারীভাবে বা সাংবিধানিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার প্রয়াস শুরু হয়েছে

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলারক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রকে যে জনকল্যাণ, সামাজিক ন্যায় আর গণতন্ত্রের সুযোগ সুবিধাকে সমাজের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেবার চ্যালেঞ্জ সরকারকে নিতে হবে একথা এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতেও প্রচার পেল। সন্দেহ নেই এইসব রাষ্ট্রগুলিতে উন্নত উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মত মূল চ্যালেঞ্জ শুধুমাত্র দক্ষ নীতি-নির্ধারণ বা আর্থিক উন্নয়ন ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা নয়, এইসব দেশের কাছে মূল সমস্যা হল নাগরিক সমাজের গরিষ্ঠ অংশের পরিচয় ও তাদের সমষ্টি চেতনাকে চিহ্নিত ও জাগ্রত করার। গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে গ্রামে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমেই এটা সম্ভব। আর এটা করা দরকার রাষ্ট্রিক তথা সাংবিধানিক বিধান আর ব্যবস্থা ও তার কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে।

ভারতবর্ষে গ্রাম শাসন সংগঠনের প্রশ্নে সমাজতান্ত্রিক দেশের গণতান্ত্রিক মডেলকে যেমন গ্রহণ করা হয় নি, আবার সরাসরি পাশ্চাত্যের উদার গণতান্ত্রিক দেশগুলির স্থানীয় শাসনের অভিজ্ঞতাকেও গ্রহণ করা হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ক্ষমতা বন্টনের কোন কঠোর নীতি ও এখানে গ্রহণ করা হয় নি। গান্ধীজির রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্রের ভাবনাও এদেশের রাষ্ট্র নেতাদের কাছে কোন কালেই আকর্ষক ছিল না। স্বভাবতঃই স্থানীয় গণতন্ত্রের প্রশ্নে স্বাধীনতার পর প্রথম তিনদশক পর্যন্ত এদেশে কোন সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রিক নীতিই ছিল না। কেন্দ্রপ্রবণ এক যুক্তরাষ্ট্রীয় পার্লামেন্টীয় ধাঁচের ব্যবস্থায় মৌখিক উচ্চারণ থাকলেও গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনার (Democratic Governance) প্রশ্নে যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ততা ছিল। বিগত শতাব্দীর শেষ দুই দশকে বিগত তিন দশকের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এদেশের গ্রাম শাসন তথা পঞ্চায়েতকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দিতে চেয়েছে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে। সাংবিধানিক মর্যাদা দান করে ভারতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে নতুন গতি দান করা হল।

৮.৪ ভারতে গ্রাম শাসনের নতুন গতি : পঞ্চায়েতের সাংবিধানিক মর্যাদা

দেরী করে হলেও ভারতবর্ষে গ্রাম শাসনের ক্ষেত্রে একটি নতুন গতি এল পঞ্চায়েতকে সাংবিধানিক মর্যাদা দানের মধ্য দিয়ে। সন্দেহ নেই পরিবর্তিত সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও চাহিদা মেনেই গ্রাম শাসনে রূপান্তর ঘটানো হল। স্বাধীন ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের এই সাংবিধানিক অগ্রগতির কারণ কী? দেশী ও বিদেশী পর্যবেক্ষকেরা স্বাধীন ভারতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে নিরাশা ব্যক্ত করেছিলেন তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এদেশে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণ সম্পর্কে সরকারের উদাসীনতা ও নেতিবাচক মনোভাব। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণকে সফল করার জন্য প্রয়োজন ছিল বর্তমান সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে স্থানীয় তথা গ্রামের শাসন সংগঠনের পক্ষে প্রয়োজনমত সংশোধন এবং ধীরে ধীরে সারা ভারতবর্ষের গ্রাম সমাজে এক নতুন আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার রাজনৈতিক প্রয়াস। সন্দেহ নেই প্রথম ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও সাফল্য এসেছে। সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতায় বিকেন্দ্রিকরণ ঘটেছে গ্রামে। পঞ্চায়েতকে নতুন করে সংগঠিত করার এবং পঞ্চায়েতের জন্য স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগতি আসে নি। পশ্চিমী সংসদীয় পদ্ধতি এবং সাংবিধানিক গণতন্ত্রের বাইরে আমরা আর বেশীদূর এগোতে পারি নি। যে রাষ্ট্রিক ও সরকারি ব্যবস্থাকে ব্রিটিশ শাসক ছেড়ে গেছে তাকেই আমরা আগলে রেখেছি। নেহরু পরিকল্পনার বাইরে আর গণতন্ত্র নিয়ে তেমনভাবে ভাবেন নি। ইন্দিরা গান্ধী স্থানীয় শাসনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেয়ে দলের ক্ষমতার কাঠামোকে শক্তিশালী করতে উৎসাহী ছিলেন। রাজীব গান্ধী স্থানীয় শাসনের রসায়নকে বুঝেছিলেন এবং গ্রামে সমর্থন সমাবেশের লক্ষ্যে পঞ্চায়েত সংগঠন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন। এ ব্যাপারে প্রাথমিক ভাবে তিনি যে সংগঠিত উদ্যোগ এবং সাংবিধানিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন পরবর্তীকালে সেই প্রয়াসই কার্যকর রূপ নেয় সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনের মাধ্যমে।

কিছুকাল আগেও পঞ্চায়েত সম্পর্কে রাজ্যে রাজ্যে যে বিরাগ জন্মেছিল বা পঞ্চায়েতের যে স্থবিরত্ব ঘটেছিল তা কেটে গিয়ে পঞ্চায়েত সংগঠন বিষয়ে আবার ব্যাপক উৎসাহ দেখা দিল। পঞ্চায়েত সম্পর্কে এতকাল যে সংবিধান এতটাই নীরবতা পালন করেছে বা সামান্য কথা বলেই থেমে গেছে সেই সংবিধানকে সংশোধন করে পঞ্চায়েত সম্পর্কে ব্যাপক সংস্কারের ব্যবস্থা নেওয়া হল। সংবিধানে পঞ্চায়েত সম্পর্কে নতুন ধারা যুক্ত হল, নতুন সংযোজনী এল। সংবিধানে তৃতীয় সরকারের গুরুত্ব পেল পঞ্চায়েত। এর জন্য পৃথক কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত হল। পঞ্চায়েতকে নবরূপ দানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে রাজ্যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে বার্তা পৌঁছে গেল। আশীর দশক দু-চারটি রাজ্য ছাড়া (মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম ইত্যাদি) প্রায় সব রাজ্যেই পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পঞ্চায়েত কম-বেশি তার কাজও শুরু করেছে। ১৯৮৪ এবং ১৯৮৬ সালে দুটি কমিটি গড়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য প্রস্তাব ও সুপারিশ নেওয়া হল। পরিকল্পনা কমিশনের সৌজন্যে ১৯৮৪ সালে গঠিত জি. ভি. কে. রাও কমিটি (G.V. K. Rao Committee) গ্রামোন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী প্রক্রিয়ার রূপায়নে পঞ্চায়েতকে যুক্ত করার কথা বলে। এই কমিটির প্রস্তাবে পঞ্চায়েতের নির্বাচন, করে (যা সময়মত হয়নি) দায়িত্বশীল জনমত গঠন করা, পরিকল্পনা রচনায় ও ভূমিসংস্কার প্রক্রিয়ায় পঞ্চায়েতকে যুক্ত করার কথা বলা হল। জেলা স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধিত্ব, জেলা পরিষদের সদস্য ও সভাপতি নির্বাচন, জেলার উন্নয়নে জেলা পরিষদকে যুক্ত করা, ব্লক ব্যবস্থাকে নবরূপ দেওয়া মহিলাদের সংরক্ষণ, মণ্ডল পঞ্চায়েত গঠন এবং আরও নানা বিষয়ে প্রস্তাব করেছে কমিটি।

১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এল. এম সিংভি কমিটি (L.M. Singhvi Committee) কিভাবে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রকৃত কার্যকারিতা সম্ভব সে বিষয়ে মতামত দিয়েছে। কমিটি চেয়েছে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পৃথক সাংবিধানিক স্বীকৃতি। সংবিধানে ওর জন্য পৃথক পরিচ্ছেদ যুক্ত করা ও একে সরকারের তৃতীয় স্তর হিসাবে মর্যাদা দেবার প্রস্তাব করে কমিটি। পঞ্চায়েতের নির্বাচন, অর্থসংস্থান, পঞ্চায়েত সংক্রান্ত বিবাদ মেটানোর জন্য বিচারবিভাগীয় ট্রাই রিউন্যাল গঠন, স্বায়ত্তশাসন চরিত্র বজায় রাখার জন্য গ্রামের পুনর্বিন্যাস ঘটানো, পঞ্চায়েতের আর্থিক ও মানবিক সম্পদের বিকাশ ওসব বিষয়েও প্রস্তাব করেছে সিংভী কমিটি। রাজনৈতিক দলগুলির গঠনমূলক ভূমিকা ও ন্যায় পঞ্চায়েত গঠনের ব্যাপারেও কমিটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

৮.৫ সংবিধান সংশোধন আইনের পটভূমি

সংবিধান সংশোধন করে পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেবার দাবি বহুদিনের হলেও ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যমে রাজ্যের হাতে ক্ষমতা দেবার জন্য যতটা শোরগোল উঠেছে বা আন্দোলন হয়েছে পঞ্চায়েতের জন্য তেমনভাবে কোন সোচ্চার দাবি ছিল না। গ্রাম স্বরাজের লক্ষ্যে স্বাধীন দেশের সরকার অবিচল থাকবে, কংগ্রেস সাংগঠনিক ভাবে নিবেদিত হবে। গান্ধীজি আন্তরিকভাবে চাইলেও সংবিধানের প্রবক্তা ও প্রণেতারা এ ব্যাপারে উদ্যোগী হন নি, কংগ্রেসের তরফ থেকেও সরকারীভাবে সংগঠিত প্রচেষ্টা তেমন ছিল না। সংবিধান চালু হবার দীর্ঘ তিরিশ বছর পরে এ ব্যাপারে সরকারীভাবে প্রচেষ্টা শুরু হল। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েতকে সাংবিধানিক (মর্যাদা) দেবার জন্য ব্যবস্থা নেবার উদ্যোগ শুরু হল রাজীব গান্ধীর (Rajib Gandhi) নের্তৃত্বে কংগ্রেস সরকারের পক্ষ থেকে। সরকারের পক্ষ থেকে একটি সংবিধান সংশোধনী বিল (৬৪ তম সংবিধান সংশোধন বিল) আনার প্রস্তাব হল। এর আগে, বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনার জন্য কালেক্টর, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত আধিকারিক, ব্লক আধিকারিক প্রমুখের সঙ্গে সরকার বার বার বসেছে এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় হয়েছে। গ্রামে গ্রামে বিষয়টি নিয়ে প্রচার চলেছে, নানা স্তরে কর্মশালার (workshop) আয়োজন

হয়েছে। ১৯৮৭ থেকে ১৯৮৮ এই দুবছরে ভূপাল হায়দ্রাবাদ, ইম্ফল, জয়পুর ও কোয়েম্বাটোরে পাঁচটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এতকাল অ-কংগ্রেসী দল ও রাজ্যগুলিতে পঞ্চায়েত বিষয়ে তৎপরতা ছিল। রাজীব গান্ধী চাইলেন কংগ্রেস সংগঠন ও রাজ্যেও গ্রাম শাসন বিষয়ে তৎপরতা চলুক এবং সারা দেশেই পঞ্চায়েতের সংগঠন ও মর্যাদা বিষয়ে এক নব বাতাবরণ সৃষ্টি হোক।

১৯৮৯ সালের জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলির পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এক সম্মেলনে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বের কথা জানিয়ে এ বিষয়ে সংবিধান সংশোধনী বিল আনার প্রস্তাব করেন রাজীব গান্ধী। ১৯৮৯ সালের বাজেট অধিবেশনেই এই বিল আনার কথা বলা হলেও, বিলটি পেশ হয়েছিল এপ্রিল-মে মাসে। লোকসভায় ১৫মে এক ভাষণে রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতের সাংবিধানিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে জানান ঃ

ভারতের বিবর্তনে সবচেয়ে বড় ঘটনা হল সংবিধান রচনার মাধ্যমে পার্লামেন্ট ও রাজ্য আইন সভার সৃষ্টি। এই মহান ঘটনার সাথে যুক্ত হল ঐতিহাসিক বিপ্লবী পঞ্চায়েত রাজ বিল। এই বিলে আছে মাটির কাছাকাছি গণতন্ত্রকে পৌঁছে দেবার এক আন্তরিক সংকল্প। ৮০ কোটি মানুষের দেশে মাত্র পাঁচ-ছয় হাজারের মত জন প্রতিনিধি—এই সংখ্যাটি মোটেই যথেষ্ট নয়। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সঠিকভাবে চালু হলে শুধুমাত্র জন প্রতিনিধির সংখ্যাই বাড়বে না বাড়বে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জন-প্রতিনিধিদের সরাসরি যোগাযোগ। আর এর মাধ্যমে ক্ষমতার দালাল, কায়েমী স্বার্থের খেলা বন্ধ হবে।

সংবিধানের ৬৪তম সংশোধনে পঞ্চায়েত সম্পর্কে যে সব আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছে তার মধ্যে অন্যতম হল ঃ

● নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে প্রতি পাঁচ বছর সার্বিক প্রাপ্ত বয়স্কের ভিত্তিতে পঞ্চায়েত নির্বাচন বাধ্যতামূলক হবে।

● সংবিধানের নবম অংশ ও একাদশ তফসিলে (Schedule) পঞ্চায়েত সম্পর্কিত ব্যবস্থা থাকবে।

● ত্রি স্তরের পঞ্চায়েত কাঠামো প্রবর্তিত হবে এবং প্রতিটি স্তরে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকবে।

● পঞ্চায়েতের হাতে আর্থিক ক্ষমতাদান ও প্রয়োজনীয় আর্থিক-সমীক্ষার উদ্দেশ্যে রাজ্যের রাজ্যপালগণ অর্থ কমিশন (Finance Commission) গঠন করবেন।

● ভারতের কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

● দুর্নীতি, অযোগ্যতা ইত্যাদির অভিযোগে রাজ্যপালকে পঞ্চায়েত ভেঙে দেবার ক্ষমতা দেওয়া হবে।

● সংবিধানের ৬৪ তম বিল শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত হয় নি। এই বিলে রাজ্যসভার প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়া যায় নি। রাজ্যগুলির তরফেও বিল নিয়ে বিতর্ক ছিল। ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণের নামে রাজ্যের এক্তিয়ার সংকুচিত করা হবে এমন অভিযোগ উঠেছে। বিকেন্দ্রীকরণের শক্তিশালী প্রবক্তা অ-কংগ্রেসী রাজ্যগুলি বিলটির সংস্কার ও গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রশ্ন না তুললেও, প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্যে ও গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতা প্রসার ও নির্বাচনী লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসাবে বিলটিকে ব্যবহার করার ক্ষতিকর প্রবণতা নিয়ে। বিরোধীরা বিলটির বিপক্ষে জনমত সংগঠিত করেছে।

ইতিপূর্বে ১৯৮৮ সালে সারকারিয়া কমিশন (Sarkaria Commisssion) গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের বিষয়ে বেশ কিছু সুপারিশ করেছে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির অকার্যকারিতা সংশোধন করার জন্য কিছু কিছু সংবিধানগত ব্যবস্থা নেবার পরামর্শ দিয়েছে। সংবিধানের ১৭২ ও ১৭৪ ধারায় রাজ্য আইনসভার কার্যকাল ও রাজ্য আইন সভার অধিবেশন আহ্বান স্থগিত বা ভেঙে দেবার ব্যাপারে যে সুস্পষ্ট বিধি-বিধান আছে তার সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে গ্রামীণ ও পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচন, অধিবেশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ, নিয়মত কোন আইনী ব্যবস্থা করা যায় কিনা এ ব্যাপারে কমিশন ভাবতে বলেছে। পঞ্চায়েত বা শহরের বিকেন্দ্রিকৃত সংস্থাকে দীর্ঘদিন অচল করে রাখা বা বাতিল করার বিপক্ষে কমিশন সুস্পষ্ট অভিমত দিয়েছে এবং এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট রাজ্য আইন সভা এবং গ্রাম ও শহরের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের জন্য একরূপ (uniform) আইন আনা যায় কিনা কমিশন সে ব্যাপারে সুপারিশ করেছে। কমিশন ঐ ব্যাপারে ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি মডেল বিল তৈরি করা যেতে পারে বা রাজ্য আইনসভায় সম্মতির ভিত্তিতে পার্লামেন্টে এ বিষয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে এরকম একটি একধরণের আইন আনা যেতে পারে বলে পরামর্শ দিয়েছে।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারী প্রশাসনিক ব্যবস্থা বা পশ্চিমী সংসদীয় পদ্ধতি, ঔপনিবেশিক শাসন নীতি প্রয়োগ করে পঞ্চায়েতের মত প্রতিষ্ঠানকে নবরূপ দেওয়া সম্ভব নয়। ভারতের প্রেক্ষাপটে গ্রামের আশু ও জরুরী আর্থসামাজিক সমস্যার সমাধান করতে হবে দ্রুত এবং একান্তভাবেই ভারতীয় কাঠামো ও পদ্ধতি মেনে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলে। এ জন্য বর্তমান ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন, পুনর্নির্মাণ জরুরী। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সাংবিধানিক মর্যাদা দিয়ে পঞ্চায়েতকে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের এক নতুন আইনগত প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব দিতে হবে। সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনের মধ্যে পঞ্চায়েতকে এই নব আইনগত/প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করার সংকল্প স্পষ্ট।

৮.৬ সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধন : প্রধান বৈশিষ্ট্য

গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের বিকাশে সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধন এক ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। সন্দেহ নেই রাজীব গান্ধী আনিত ৬৪ তম সংবিধান বিল যা শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত হতে পারেনি সেটিই মাত্র তিন বছরের সময়ের মধ্যে ফিলে এল, পরিণতি পেল সংবিধানের ৭৩তম সংশোধন আইনে সম্পূর্ণ নতুন উদ্যোগ আর প্রাণশক্তি নিয়ে। আইনী ব্যক্তিত্ব আর সাংবিধানিক মর্যাদায় ভূষিত হল পঞ্চায়েত এই নতুন সাংবিধানিক উদ্যোগের মধ্য দিয়ে, আর দেশের গণতন্ত্র ফিরে পেল তার প্রকৃত অর্থ ও মর্যাদা। এই পর্বে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের কেন্দ্রীয় প্রচেষ্টায় আর কোন বাধা এল না। সংবিধানের নির্দেশ মত রাজ্য সরকারগুলিও পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে একরকম বাধ্য হল। ৭৩ তম সংশোধন আইন তাত্ত্বিক, সামাজিক রাজনৈতিক, আইনী সব দিক থেকেই বিশিষ্টতার দাবি করতে পারে। বিলটির বৈশিষ্ট্যের প্রতি এবার নজর দেওয়া যেতে পারে :

বিলটির প্রথম বৈশিষ্ট্য হল পঞ্চায়েতকে প্রকৃত সাংবিধানিক মর্যাদা দান। দীর্ঘদিন দেশে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকলেও পঞ্চায়েতকে জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা হয় নি। সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়ে পঞ্চায়েতকে স্থায়িত্ব ও নিশ্চয়তা দেওয়া হল পঞ্চায়েতের সামর্থ্য ও সক্রিয়তাকে গুরুত্ব দেওয়া হল। সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাওয়াতে রাজ্যগুলির উপরও এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে

প্রান্তলিপি : বিলটি সম্পর্কে নরসিমা রাও সরকার আইনী উদ্যোগ নেয় ১৯৯১ সালে, ১৯৯২ সালের ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর বিলটি অনুমোদন পায় যথাক্রমে লোকসভা ও রাজ্যসভায়, রাজ্যগুলির সম্পত্তি ও রাষ্ট্রপতির অনুমতি পেয়ে ১৯৯৩ সালের ২৪ এপ্রিল বিলটি আইনে পরিণত হয়।

কার্যকর করার দায় এসে পড়ে। প্রায় সব রাজ্যেই এই দায় গ্রহণ করে। পঞ্চায়েতের ব্যাপারে রাজ্যগুলি রাজনৈতিক সুবিধাবাদের নীতি পরিত্যাগ করে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে পেরেছে পঞ্চায়েতের এই সাংবিধানিক স্বীকৃতির বলে।

বিলটির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এর সামাজিক ভিত্তি। সব শ্রেণীর মানুষকে পঞ্চায়েতে না আনতে পারলে গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব নয়। অনগ্রসর জাতি ও মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করে সংবিধান পঞ্চায়েতকে সামাজিক ভিত্তি দান করেছে।

তৃতীয়ত, আইনটির মাধ্যমে গ্রামীণ প্রশাসনে একটি একরূপতা এসেছে। একই সাংবিধানিক নীতিকে সামনে রেখে পঞ্চায়েত সংগঠনের ব্যাপারে দেশের সব রাজ্যগুলিই সক্রিয় হয়েছে। গঠন প্রণালী ও কার্যের ব্যাপারে সব রাজ্যে পঞ্চায়েতের একই সাংবিধানিক নীতি কার্যকর হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর, মিজোরাম, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড এবং তফশিলভুক্ত কিছু অঞ্চল ছাড়া সব রাজ্যেই পঞ্চায়েত আইন সমানভাবে প্রযোজ্য।

চতুর্থত, পঞ্চায়েত সম্পর্কে সংবিধানের আইন অত্যন্ত স্পষ্ট। সংবিধানের নবম অংশের ২৪৩ এবং ২৪৩ক থেকে ণ (Part IX Art 243, 243A—O) এবং সংবিধানের একাদশ তপশিলে (XI Schedule) পঞ্চায়েতের এই নব ও আধুনিক রূপের পরিচয় আছে। সাংবিধানিক আইনের এই স্পষ্টতার ছাপ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

(১) গ্রামসভা ঃ ৭৩ তম সংবিধান সংশোধন আইনে জনগণের, অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করতে গ্রাম সভাকে প্রকৃত অর্থেই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া হল। সংবিধানের (243 (b)) ধারায় গ্রাম সভা বলতে বোঝানো হয়েছে পঞ্চায়েত এলাকার গ্রাম স্তরের যোগ্য ভোটারদের নিয়ে গঠিত সভা। সংক্ষেপে বলা যায় গ্রাম সভা হল গ্রামের নির্বাচকমণ্ডলীকে নিয়ে গঠিত সভা। সংবিধানের (243A) ধারায় বলা হয়েছে, একটি গ্রামসভা গ্রামস্তরে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে যা রাজ্যের আইনসভা আইনের মাধ্যমে স্থির করবে।

(২) পঞ্চায়েতের অর্থ ও গঠন ঃ সংবিধানের এই সংশোধনে সংবিধানগত ভাবে পঞ্চায়েতের অর্থ ও মর্যাদা নির্দেশ করে বলা হয়েছে পঞ্চায়েত হল সংবিধান অনুসারে গঠিত একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা (২৪৩ ধারা)। পঞ্চায়েতের তিনটি স্তর ঃ গ্রাম স্তর, মধ্যবর্তী স্তর ও জেলা স্তর। মধ্যবর্তী স্তর হল রাজ্যপালের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে গঠিত গ্রাম ও জেলার মাঝামাঝি স্তর। ২০ লক্ষ জনসংখ্যার কম হলে সেখানে মধ্যবর্তী স্তর গড়ার প্রয়োজন নেই। [Art 243B (1), (2)]

রাজ্যের আইনসভা আইন প্রণয়ন করে পঞ্চায়েতের গঠন বিধি স্থির করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হল যে কোন স্তরের পঞ্চায়েত অঞ্চলের জনসংখ্যা আর পঞ্চায়েত স্তরের আসন সংখ্যার মধ্যে সারা রাজ্যে যতটা সম্ভব সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে (Art 243C (1)) । পঞ্চায়েতের সব আসনই পঞ্চায়েতের ভৌগলিক এলাকার নির্বাচন ক্ষেত্রগুলিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণ হবে। এক্ষেত্রেও আসন সংখ্যা বন্টনের ব্যাপারে প্রত্যেক নির্বাচন ক্ষেত্রের আসন সংখ্যা ও জনসংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে [Art 243C (2)]

রাজ্যের আইনসভা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এবং ঐ আইনে উল্লিখিত প্রণালী ও শর্ত অনুসারে গ্রাম স্তরের, মধ্যবর্তী স্তরের (যদি আদৌ থাকে) এবং জেলাস্তরের সভাপতিদের প্রতিনিধিত্ব, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে লোকসভা ও বিধানসভার সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব রাজ্যসভা ও বিধান পরিষদের সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব স্থির করবে। পঞ্চায়েত এলাকা থেকে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হোন বা না হোন পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের সভাপতি ও সদস্যদের পঞ্চায়েতের সভায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। রাজ্য আইনসভার প্রণীত আইন মতই পঞ্চায়েতের গ্রামস্তরের সভাপতিরা নির্বাচিত হবেন। পঞ্চায়েতের মধ্যবর্তী ও জেলা স্তরের সভাপতিরা ঐ স্তরে নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন [Art 243c (3)]

নতুন পঞ্চায়েতের গঠন প্রণালীর সবচেয়ে অভিনব দিক হল প্রত্যেক স্তরের পঞ্চায়েতে তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য (Scheduled Custes and Tribes) এবং মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা। তফসিলী জাতি বা উপজাতিদের আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত এলাকায় ঐ শ্রেণীর জনসংখ্যার সাথে আসন সংখ্যার অনুপাত সমানুপাতিক হবে। আসনগুলির বন্টনে পর্যায়ক্রমিক আবর্তন করতে হবে [Art 243D(1)] সংরক্ষিত এই জনগণগুলির (তপসিলীজাতি ও উপজাতির) মধ্যে আবার এক-তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হবে [Art 243(2)]।

নতুন পঞ্চায়েতে মহিলাদের জন্যও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ নির্বাচন দ্বারা পূর্ণ হবেএ এমন আসনগুলির কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ (তফসিলী জাতি ও উপজাতি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সহ) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হবে এবং পর্যায়ক্রমিক আবর্তন নীতি প্রযোজ্য হবে ||Art 243(3)]।

পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের সভাপতির পদগুলিতে তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হবে রাজ্য আইনসভা প্রণীত আইন দ্বারা। এক্ষেত্রেও সর্ত হল রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের সভাপতির মোট পদসংখ্যা এবং সংরক্ষিত সভাপতির পদ সংখ্যা তফসিলী জাতি ও উপজাতির জনসংখ্যার সমানুপাতিক হবে। এখানেও আবর্তনের নীতি, প্রযোজ্য [Art 243D(4)] । এখানেও মহিলাদের জন্য মোট আসনের এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত থাকবে। সংবিধানের ৩৩৪ ধারায় নির্দেশিত ব্যবস্থা মত একটি সময়ের পর পূর্ব-উল্লিখিত আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা (মহিলাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাদে) কার্যকর হবে না। [243D(5)]।

প্রান্তলিপি ঃ সংবিধানের ৩৩৪ ধারায় বলা হয়েছে জনপ্রতিনিধি সভাগুলিতে (লোকসভা ও বিধান সভা) সংবিধান চালু হবার ৫০ বছর পর আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আর থাকবে না। তবে এই সময় অতিক্রান্ত হলেও যদি লোকসভা বিধানসভা বজায় থাকে তবে এই আইন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না।

পঞ্চায়েতের গঠন সংক্রান্ত অন্য আর একটি বৈশিষ্ট্য হল রাজ্য বিধান সভা বা লোকসভার মত এর কার্যকাল পাঁচ বছর। প্রত্যেক পঞ্চায়েত ঐ পঞ্চায়েতের প্রথম সভার দিন থেকে পাঁচ বছর স্থায়ী হবে। কোন ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের মেয়াদ আগে ভঙ্গ হলে, ছমাস উত্তীর্ণ হবার আগেই তার নির্বাচন করতে হবে। পঞ্চায়েতের সদস্য হবার অক্ষমতাও সংবিধান দ্বারা। নির্ধারিত ভারতের নাগরিক না হলে, উন্মাদ বা দেউলিয়া হলে, কোন লাভজনক পদে যুক্ত থাকলে, রাজ্য আইনসভার সদস্য হলে পঞ্চায়েতের সদস্য হিসাবে যোগ্য হবেন না। [Art 243(E) (F)]।

(৩) পঞ্চায়েতের নির্বাচন ও নির্বাচন কমিশন ঃ পঞ্চায়েতের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সাংবিধানিক বৈশিষ্ট্য হল পঞ্চায়েতের নির্বাচন প্রণালী ও পঞ্চায়েত নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন। নিয়মিত নির্বাচন পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের এক আদর্শ ব্যবস্থা একথা ভেবেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনের হাতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের তদারকী, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যপাল একজন রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাজ পরিচালনার জন্য নিয়োগ করবেন। রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের কার্যকাল ও যোগ্যতা রাজ্যপাল আইন দ্বারা নির্ধারণ করবেন। (Art 243K)।

(৪) পঞ্চায়েতের আয় ও অর্থ কমিশন ঃ বর্তমান সংবিধান সংশোধনে পঞ্চায়েতের আয়ের সূত্র নির্ধারণ করা হয়েছে সম্ভবত, এই প্রতিষ্ঠানকে অর্থনৈতিক স্বয়ংম্ভব করার জন্য। সন্দেহ নেই পূর্বে পঞ্চায়েতের স্থবিরত্ব বা পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দুর্বলতার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল অর্থের অভাব। একথা ভেবেই বর্তমানে পঞ্চায়েতের হাতে কর, শুল্ক, টোল এবং পঞ্চায়েতকে দেয় অর্থ আদায়ের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তবে রাজ্য আইনসভার নির্বাচিত আইনমতই পঞ্চায়েত এই ক্ষমতা পাবে (Art 243H)। পঞ্চায়েত সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক আরেকটি সাংবিধানিক বিষয় হল, পঞ্চায়েতের আর্থিক অবস্থা সমীক্ষার জন্য অর্থ কমিশন গঠনের ব্যবস্থা। বলা হয়েছে, বর্তমান সংশোধন আইন চালু হবার পর থেকে এক বছরের মধ্যে এবং প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অর্থ কমিশন (Finance Commission) গঠন করতে হবে। কমিশনের গঠন ও সদস্যদের সংখ্যা ইত্যাদি নির্ধারিত হবে আইনসভায় আইন অনুসারে।

পঞ্চায়েতের সম্পদ, তহবিল, পঞ্চায়েতকে দেয় রাজ্য সরকারের অনুদান সব ব্যাপারেই সমীক্ষার ক্ষমতা এই অর্থ কমিশনের থাকবে। (Art 243-I)। পঞ্চায়েতের হিসাবপত্র সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সংবিধানে বলা হয়েছে (Art 243-J)। পঞ্চায়েতের অর্থ অপব্যবহার রোধেই এই ব্যবস্থা।

(৫) পঞ্চায়েতের নব রূপায়নে সংবিধানের একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হল পঞ্চায়েতের হাতে সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব প্রদান। সংবিধান পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মতই একটি দায়বদ্ধ সরকার হিসাবে দেখতে চেয়েছে। সংবিধানের ভাষায়, রাজ্য আইনসভা আইনমত পঞ্চায়েতের হাতে সেই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করবে যা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে ওকে কাজ করতে সাহায্য করবে। কাজের দুটি এলাকা চিহ্নিত করে সংবিধানে বলা হয়েছে, পঞ্চায়েতের কাজ হল ঃ (ক) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় বিচার সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রস্তুতি। (খ) একাদশ তফসিলে বর্ণিত বিষয়গুলি সহ, পঞ্চায়েতের উপর অর্পিত, অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও সামাজিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত পরিকল্পনার রূপায়ন। [Art 243-G]

একাদশ তফসিলে বর্ণিত পঞ্চায়েতের ২৯টি ক্ষেত্র হল ঃ

(১) কৃষির প্রসারণ সহ, (২) ভূমি উন্নয়ন ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ, (৩) ক্ষুদ্র সেচ, জল সরবরাহ বিষয়ক ব্যবস্থাপনা, আচ্ছাদন উন্নয়ন, (৪) পশুপালন, দুগ্ধজাত এবং হাঁস মুরগী পালন, (৫) মৎস্য চাষ (৬) সামাজিক বনসৃজন ও খামার ভিত্তিক বনসৃজন, (৭) অপ্রধান বনজ দ্রব্য, (৮) ক্ষুদ্র শিল্প, ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, (৯) খাদি, গ্রামোদ্যোগ ও কুটীর শিল্প, (১০) গ্রামীণ গৃহনির্মাণ, (১১) পানীয় জল, (১২) জ্বালানী ও পশুখাদ্য, (১৩) রাস্তা, কালভার্ট, সেতু, ফেরী ও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, (১৪) গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, (১৫) অপ্রচলিত শক্তির উৎস, (১৬) দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প, (১৭) শিক্ষা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ, (১৮) প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (১৯) বয়স্ক ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা, (২০) গ্রন্থাগার সমূহ, (২১) সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ, (২২) বাজার ও মেলা, (২৩) স্বাস্থ্য, আবর্জনা দূরীকরণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতাল (২৪)পারিবারিক হিতসাধন, (২৫) মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, (২৬) সামাজিক হিতসাধন, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের হিতসাধন সহ, (২৭) দুর্বলতর শ্রেণীর, বিশেষত তপসিল জাতি ও উপজাতিদের হিতসাধন,(২৮) গণবন্টন ব্যবস্থা, (২৯) সামাজিক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ।

৮.৭ নতুন সংবিধান সংশোধন আইনের তাৎপর্য

৭৩ তম সংবিধান সংশোধন আইনের তাৎপর্য নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। পঞ্চায়েতকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে এই আইনের তাৎপর্য অপরীসীম। মৃতপ্রায় পঞ্চায়েতকে বাঁচিয়ে তোলার ক্ষেত্রে এই সাংবিধানিক ব্যবস্থা অবশ্যই এক সঞ্জিবনী ব্যবস্থাপত্র। এই ব্যবস্থার আগে পঞ্চায়েতের কোন সাংবিধানিক মর্যাদা ছিল না। গ্রাম সভা গঠনের ব্যবস্থা গ্রামের নির্বাচক মণ্ডলীর প্রতি পরিপূর্ণ আস্থার প্রকাশ। তফশিলী জাতি ও উপজাতির সংরক্ষণ ও মহিলাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা, হিসাবপত্ররক্ষার ব্যবস্থা, নির্বাচন ও নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থা, পঞ্চায়েতের সম্পদবৃদ্ধি ও তহবিল সংরক্ষণ ব্যবস্থা, অর্থ কমিশন গঠন করে আর্থিক সমস্যার সমীক্ষা সব কিছুই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নবীকরণের ও গণতন্ত্রীকরণের আদর্শব্যবস্থা। আগেকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার তুলনায় এগুলি অভূতপূর্ব। তবে সংবিধান সংশোধন করে পঞ্চায়েতকে নবরূপ দেবার প্রচেষ্টা হলেও, এই প্রচেষ্টায় কিছু তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ত্রুটি আছে বলে সমালোচকেরা অভিযোগ করেন। বিধানসভার সদস্য ও সাংসদের পঞ্চায়েতে ভোটাধিকার না দেবার প্রস্তাবের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে সভাপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা ভারতের মত বহুদলীয়

ব্যবস্থায় সংকট সৃষ্টি করতে পারে বলে কেউ কেউ মনে করেন। তৃতীয়ত, সংবিধান সংশোধন হলেও, সংশোধনের মাধ্যমে কাঠামোগত সংস্কার বা কার্যগত বাধ্যবাধকতাই যথেষ্ট নয়। পঞ্চায়েতকে সফল করার জন্য চাই প্রকৃত রাজনৈতিক সদিচ্ছা। পঞ্চায়েতের অনিয়মিত নির্বাচন, পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার, পঞ্চায়েতের আর্থিক স্বাতন্ত্র বা স্বাধীনতা নিয়ে সংশোধনেও পরেও প্রশ্ন উঠেছে। গ্রামীণ রাজনীতি এখনও সাংবিধানিক নীতির ভারতে প্রভাবশীল। দলীয় রাজনীতির নাগপাশ থেকে পঞ্চায়েত এখনও মুক্ত নয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনও অবাধে হয় না। জনগণ এখনও রাজনীতি সচেতন নয়। ভূমি সংস্কারের কাজে পঞ্চায়েতকে এখনও তেমনভাবে সারাদেশে সচল করা যায় নি। রাজনৈতিক অসাম্য এবং জাতপাত এখনও পঞ্চায়েতের সফল রূপায়নে বা গ্রামীণ উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। সমালোচকেরা মনে করেন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি না হলে সংবিধান সংশোধন সত্ত্বেও আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা বা সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে পঞ্চায়েতকে মুক্ত করা যাবে না। বৃহৎ জমির মালিক, একচেটিয়া পুঁজিপতির আধিপত্য ও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থাকে অতিক্রম করে বিকেন্দ্রিকরণের স্বার্থে নিবেদিত প্রকৃত গ্রামীণ নেতৃত্ব গড়ে ওঠে নি।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য ভারতের মত দেশে সংবিধান সংশোধনই শেষ কথা নয়। চাই প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও রাজ্যের হাতে ক্ষমতা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদলে রাজ্যগুলিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে, এবং রাজ্যের শক্তিই পঞ্চায়েতের শক্তির ভিত্তি। তবে পশ্চিমী পার্লামেন্টীয় পদ্ধতি মেনে নয়, পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করতে হবে দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যস্ত করে। গান্ধীজির গ্রাম স্বরাজের ভারতীয় ভাবনাকেও সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন আছে বলে পঞ্চায়েত গবেষকেরা মনে করেন। পঞ্চায়েতের জন্য চাই প্রকৃত সংগঠিত মানব সম্পদ, উপযুক্ত নেতৃত্ব, নতুন সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো, গ্রামীণ সমন্বয়ের ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক স্বয়ংভর গ্রাম।

৮.৮ বিভিন্ন রাজ্যে পঞ্চায়েত : সংবিধান সংশোধনের প্রভাব ও সাম্প্রতিক গতি

সংবিধানের ৭৩তম সংশোধন আইন প্রণয়নের পরে বিভিন্ন রাজ্যে পঞ্চায়েতের সংগঠনে ও কাজে নব উদ্যম এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ইতিপূর্বেই এ সম্পর্কে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে এবং সফল পঞ্চায়েত ব্যবস্থার একটি মডেল স্থাপন করেছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুনর্গঠিত হয়েছে সম্পূর্ণ নবরূপে অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা ও কর্ণাটকে। মধ্যপ্রদেশ , পঞ্জাব ও রাজস্থানে নতুন সংবিধান সংশোধনী মেনেই পঞ্চায়েতের বিধি বিধান নির্ধারিত হয়েছে এবং পঞ্চায়েতের নির্বাচন হয়েছে। অসম, বিহার, হিমাচল প্রদেশ, উড়িষ্যা, সিকিম, ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশ প্রায় সব রাজ্যেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় বিধিবদ্ধ আইন ও ধারাবাহিক পরিবর্তন লক্ষ্যনীয়। এর আগে একেক রাজ্যে একেক রকম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চলছিল। কোথাও গ্রামস্তরে (যেমন কেরালায়) কোথাও গ্রাম ও মহকুমা স্তরে (যেমন আসাম), কোথাও গ্রাম ও ব্লক স্তরে (যেমন হরিয়ানা) আবার কোথাও ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত (যেমন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট) ব্যবস্থা ছিল। পঞ্চায়েত সমিতিও সব রাজ্যে ব্যবহৃত হয় নি। কোথাও গ্রাম পঞ্চায়েত, কোথাও নগর পঞ্চায়েত আবার কোথাও বা তালুক উন্নয়ন পর্ষদ বা উন্নয়ন পর্ষদ—বিভিন্ন স্তরে পঞ্চায়েত বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। নতুন আইন অনুসারে (১) পঞ্চায়েত গঠনে রাজ্যগুলির মধ্যে যথাসম্ভব একরূপতা এল (২) পঞ্চায়েত নির্বাচন ৫ বছর অন্তর বাধ্যতামূলক হল। ও পঞ্চায়েতকে বাতিল করার পূর্বের ব্যবস্থা রদ হল। (৩) তফসিলী জাতি, উপজাতি ও নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হল। (৪) গ্রাম সভা ডেকে বছরে দু'বার বিধানসভার মত বিতর্কের ব্যবস্থা, খসড়া প্রস্তাব, খসড়া বাজেট, হিসাব প্রভৃতি অনুমোদনের ব্যবস্থা হল। (৫) পঞ্চায়েতের জন্য কর্মী, পঞ্চায়েত কর্মীদের জন্য বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা হল। (৬) পঞ্চায়েত প্রতিনিধি আর

সরকারি আমলাদের মধ্যে পূর্বেকার অবিশ্বাস কাটাতে ব্যবস্থা নেওয়া হল। (৭) ভেঙে যাওয়া বা বাতিল হয়ে যাওয়া পঞ্চায়েতগুলির নতুন করে গড়া বা পুনর্গঠনের সুযোগ এল। (৮) পঞ্চায়েতগুলির হাতে পরিকল্পনা ও উন্নয়নের নতুন প্রস্তাব গ্রহণ ও কার্যকর করার দায়িত্ব এল।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নব রূপায়নে সব রাজ্যেই নতুন পঞ্চায়েত আইন হয়েছে ও বিধিনিষেধের কড়াকড়ি হয়েছে। কোথাও দুটির বেশি সন্তান হলে পঞ্চায়েতে নির্বাচন প্রার্থী হওয়া যাবে না বলে আইন হয়েছে (রাজস্থান ও হরিয়ানা), কোথাও পঞ্চায়েত আইনে মদ বিক্রি বন্ধ করার ক্ষমতা পেয়েছে পঞ্চায়েত (পাঞ্জাব)। হিমাচল প্রদেশে হিসাব নিকাশ সংস্থা ও ভিজিল্যান্স কমিটি হয়েছে। কেরালায়, কর্ণাটকে, পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি এসেছে। কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন কমিটির একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে বর্তমানে সারা দেশে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩৪ লক্ষ। রাজ্যে রাজ্যে পঞ্চায়েতের ব্যর্থতা অবশ্যই প্রকট। মহিলাদের আসন সংরক্ষণ ও মহিলা কর্মকর্তার পদ সংরক্ষণ নিয়ে সর্বস্তরেই অভূতপূর্ব জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত গঠনেই অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পঞ্চায়েত নিয়ে পক্ষপাতিত্ব, দুর্নীতি ও অনিয়ম এখনও বহু রাজ্যে অব্যাহত। সম্পদ সৃষ্টি বা আর্থিক স্বনির্ভরতা সৃষ্টিতে বহু রাজ্যেই পঞ্চায়েতের খতিয়ান অনুজ্জ্বল। জাতপাত, ধর্মান্ধতা ও নানা কুসংস্কারের চাপে উত্তর প্রদেশ, কর্ণাটক ও দক্ষিণের রাজ্যগুলি, পঞ্জাব, হরিয়ানা সব রাজ্যই জর্জরিত। শিক্ষা সচেতনতা, সেবা বা উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে পঞ্চায়েতকে আজও তেমনভাবে সক্রিয় করা সম্ভব হচ্ছে না বহু রাজ্যে। সংবিধান সংশোধনের পর পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজ্যের স্থানীয় রাজনীতিতে ক্ষমতার রাজনীতির যে দুষ্ট চক্র বাসা বেধেছে তার দৃষ্টান্ত আগের এককের আলোচনায় আপনারা পাবেন। পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে অশুভ প্রতিযোগিতা, বিবাদ ও হিংসার প্রকাশ ঘটেছে তা দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির অধোগতিরই প্রকাশ।

নব্বইয়ের দশকে পঞ্চায়েতকে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে উঠে আসতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে পঞ্চায়েতের সাংবিধানিক মর্যাদা। কর্ণাটক, কেরালা বা অন্ধ্রের মত দক্ষিণের রাজ্যগুলি এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, একথা স্বীকার করেও বলা যায় পশ্চিমবঙ্গ এক্ষেত্রে সবচেয়ে কর্মতৎপর ও সচেতন রাজ্য হিসাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। নতুন সংবিধান, সংশোধন আইন এবং পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৯২—এই দুটি আইনকে সফলভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে বামফ্রন্ট শুধুমাত্র তার সমর্থনের ভিত্তিকে মজবুত করেনি, গ্রামের মানুষকে রাজনৈতিকভাবে আরো সচেতন ও সচল করেছে। ৭৩ তম সংবিধান, সংশোধন আইনের পথ ধরেই অন্ধ্রে ১৯৬৪ সালের গ্রাম পঞ্চায়েত আইন এবং ১৯৮৬ সালের আইনের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে ১৯৯৪ সালে যে আইন আনা হয় তা সব দিক থেকেই উন্নত ছিল সন্দেহ নেই। গ্রাম পঞ্চায়েত, মণ্ডল পরিষদ ও জেলা পরিষদ—তিনটি স্তরেই নতুন সংবিধান সংশোধন আইনের পথ অনুসরণ করে অন্ধ্রপ্রদেশ পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নতুন গতি এনেছে নির্বাচন, অনগ্রসর ও মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ, নির্বাচন কমিশনের তদারকী—সব ক্ষেত্রেই এই আইন নতুনত্বের দাবি করতে পারে। কর্ণাটকে নতুন সংবিধান সংশোধন আইনকে সামনে রেখে, জেলার পরিচালনায় ব্যাপক সংস্কার আনা হয়। তবে কর্ণাটকে পঞ্চায়েতে যে এখনও নির্বাচনেও নেতৃত্বে প্রভাবশালী বর্ণগোষ্ঠীর প্রাধান্য অটুট আছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল তার প্রমাণ দেয়। কেরালায়ও ১৯৯৩ সালের সংবিধান সংশোধন আইনের প্রেক্ষাপটে পঞ্চায়েত আইনের পরিবর্তন ঘটেছে এবং বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে এই পরিবর্তনের মাধ্যমে নির্বাচনে গণভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। তবে কেরালায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আমলাতান্ত্রিক কঠোর নিয়ন্ত্রণের জাল থেকে পঞ্চায়েতকে মুক্ত করতে সফল হয়নি। তবে সব রাজ্যেই যে স্থানীয় রাজনীতি নিয়ে ক্ষমতার বিরোধ ও লড়াই সমানে চলেছে এবং এর ফলে সাংবিধানিক মর্যাদা পেলেও পঞ্চায়েতের গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া যে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সারণী ১ ও সারণী ২ থেকে শিক্ষার্থী পাঠক বিগত এক দশকে (১৯৯৩—২০০৩) পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে নির্বাচন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি বিষয়ে কিছু ধারণা পেতে পারেন।

সারণী — ১

পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সংখ্যা ও আসনসংখ্যা

(১৯৯৩—১৯৯৮)*

পঞ্চায়েতের	১৯৯৩		১৯৯৮	
বিভিন্ন স্তর	সংখ্যা	আসন সংখ্যা	সংখ্যা	আসন সংখ্যা
জেলা পরিষদ	১৬	৬৫৬	১৬	৭১৬
পঞ্চায়েত সমিতি	৩২৮	৯,৪৫৫	৩২৯	৮,৫২০
গ্রাম পঞ্চায়েত	৩,২২৩	৬১,০১১	৩,৩০০	৪৯,২২৪

* ১৯৭৮, ১৯৮৩, ১৯৮৮ এবং ২০০৩ সালে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে সংখ্যা ও আসন সংখ্যার হিসাব এই পর্যায়ের আগের এককগুলির আলোচনায় দেওয়া হয়েছে।

সরণী — ২

পশ্চিমবঙ্গে ২০০৩ সালের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল*

(মোট আসন সংখ্যা ৫৮,৩৫৭)

	জেলা পরিষদ	পঞ্চায়েত সমিতি	গ্রাম পঞ্চায়েত
মোট আস	৭১৩	৮,৫০০	৪৯,১৪৪
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিষ্পত্তি	৩২	৮৭২	৫,৩৭৯
ঘোষিত আসন	৭১২	৮,৪৯৭	৪২,৬৪৫
বামফ্রন্ট	৬১৮(১)	৬,৩১৩(২)	২৭,৮৪৩(৩)
তৃণমূল কংগ্রেস-বিজেপি জোট	১৭	৯৭১	৭,০৬৩
কংগ্রেস	৬৮	১,০৪৮	৫,৬৩৯
অন্যান্য	৯	১৬৫	২,১০০

(১) জেলা পরিষদে একক ভাবে সি.পি.আই (এম) ৫৪৬, সি.পি. আই ১৯, ফরওয়ার্ড ব্লক ২৮, আর. এস. পি. ২০, বামফ্রন্টের অন্যান্য দল পেয়েছে ৫টি আসন।

(২) পঞ্চায়েত সমিতিতে বামফ্রন্টের মোট আসনের মধ্যে সি.পি. আই (এম)-এর প্রাপ্ত আসনসংখ্যা ৫৭৩০।

(৩) গ্রাম পঞ্চায়েতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত আসনসহ সি.পি. আই (এম) এর মোট আসন সংখ্যা ২৮,৭৩৫।

* সংবাদপত্রে প্রাপ্ত ১৫/৫ ও ১৬/৫/২০০৩) তথ্যের ভিত্তিতে সংকলিত।

২০০৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা যায় জেলা পরিষদের মোট ১৭ টির মধ্যে বামফ্রন্ট ১৫ ও কংগ্রেস ২টি দখল করেছে। পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট ৩২৯ টির মধ্যে বামফ্রন্টের ২৮৩, কংগ্রেসের ২৪, বি. জে. পি-র ১, তৃণমূল কংগ্রেসের ৫, অন্যান্য ৩ এবং অমিমাংসিত রয়েছে ১৪টি। মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদে কংগ্রেস প্রাধান্য পেলেও, পঞ্চায়েত সমিতিতে এই দুটি জেলায় কংগ্রেসের প্রাধান্য জেলা পরিষদের মত নয়। মুর্শিদাবাদে মোট ২৬টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে ১২টি এবং মালদহে ১৫টির মধ্যে ৫টি পঞ্চায়েত সমিতি কংগ্রেসের দখলে এসেছে। গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৯৯৮ সালের চেয়ে বামফ্রন্টের প্রাপ্ত আসনের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫৬.০৯ শতাংশ থেকে ৬৫.৫ শতাংশ। পঞ্চায়েত সমিতি প্রাপ্ত আসনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭.০৮ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭৪.২৫ শতাংশ।

৭৩ তম সংবিধান সংশোধন আইন পাশ হবার পর ১৯৯৫ সালে কেরালায় যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল সেখানে জেলাস্তরে ১৪টি সংস্থার সি.পি. আই (এম)-এর নেতৃত্বে এল. ডি. এফ (Left Democratic Front) ১০টি, ইউ. ডি. এফ (United Democratic Front) পেয়েছিল ৩টি এবং অন্যদল ১টি। ব্লক পঞ্চায়েতে এই সংখ্যা ছিল : মোট সংস্থা ১৫২, এল. ডি. এফ. ৯০, ইউ. ডি. ওফ ৪৫, বি. জে. পি. ১ ও অন্যদল ১৬। গ্রাম পঞ্চায়েতে সংখ্যাটি ছিল ঃ

মোট সংস্থা	এল ডি. এফ	ইউ. ডি. এফ.	বি. জে. পি.	অন্যদল
৯৯০	৫৩০	৩৪২	৩	১১৫

শুধুমাত্র আসনভিত্তিক বা দলভিত্তিক নির্বাচন বা সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে নয় উত্তর-সংবিধান সংশোধন যুগে নির্বাচনের চিত্রটিকে বুঝতে হবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, পঞ্চায়েতে নারীদের অংশগ্রহণ এবং পঞ্চায়েতে নের্তৃত্বের ক্ষেত্রে শ্রেণী, জাতি-গোষ্ঠী বা কোন পেশার মানুষ বেশী গুরুত্ব পেয়েছে এসবের বিচারে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রশ্নে বলা যায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিগত এক দশকে প্রতিনিধি নির্বাচন, প্রতিনিধি হওয়া এসব ক্ষেত্রে প্রায়, সব শ্রেণীর মানুষই উৎসাহ দেখিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, কেরল অন্ধ্রপ্রদেশ এই উৎসাহ ছিল তুলনামূলকভাবে বেশী। নারীদের অংশগ্রহণের প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গ বা কেরালায় চিত্র ভাল হলেও কর্ণাটক, অন্ধ্র, মহারষ্ট্র বিহার প্রভৃতি রাজ্যের চিত্রটি একেবারেই স্পষ্ট নয়। পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি প্রথম দুটি নির্বাচনে তেমনভাবে না হলেও, পরবর্তীকালের নির্বাচনে নতুন নের্তৃত্ব উঠে এসেছিল। এর মধ্যে বর্গাদার, শিক্ষক, বেকার, ছাত্র মৎস্যজীবি ও কারুজীবি সব পেশার মানুষই ছিলেন। ১৯৯৩, ১৯৯৮ ও ২০০৩ সালের নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীরা মোট আসনের ৩০ ভাগের বেশী আসনে প্রার্থী হয়েছেন। অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষও অধিক সংখ্যায় প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পেয়েছেন। তবে এখনও চিত্রটি খুব স্পষ্ট হয়েছে তা বলা যাবে না। কর্ণাটকে অবশ্য একটি বিপরীত ধর্মী চিত্রই পাওয়া যায়। এখানে রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনে (১৯৯৪-১৯৯৫) বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে লিঙ্গায়ত (Lingayats) ভোগালিকা (Vokkaligas) দুটি প্রভাবশালী বর্ণগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরাই ছিলেন সংখ্যায় অনেক বেশী।

রাজনৈতিক বা সাংবিধানিক মর্যাদা দিলেই যে পঞ্চায়েত এক কার্যকরী প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে না, ওর জন্য প্রয়োজন যে অতিরিক্ত উদ্যোগ এ কথা রাজনীতি বিশেষজ্ঞ ও সমাজগবেষকেরা বার বার বলেন। উপসংহারে বিশেষজ্ঞ ও সমাজ গবেষকদের সেই পরামর্শকেই শিক্ষার্থী পাঠকের কাছে উপস্থিত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। প্রথমত, সংবিধান সংশোধনের অনুসরণে সময়মত পঞ্চায়েতের নির্বাচনের ব্যবস্থা বা পঞ্চায়েতে মহিলা ও অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের জন্য আসন সংরক্ষণ করেই স্থানীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। পঞ্চায়েতকে স্থানীয় উন্নয়নের কাজে সক্রিয় ও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে হবে। নির্বাচনের ফলাফল দিয়ে নয়, পঞ্চায়েতের ভূমিকা নির্ধারিত হবে তার কাজের ইতিবাচক ফলাফল দিয়ে। দ্বিতীয়ত, সংবিধান সংশোধন করেই পঞ্চায়েতের

মর্যাদা বৃদ্ধি হয় না। গ্রাম সমাজের সামাজিক-আর্থিক রূপান্তরের জন্য চাই শিক্ষা, আন্দোলন আর উপযুক্ত নেতৃত্ব। তৃতীয়ত, সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত কাঠামোর পরিবর্তন আনলেই স্থানীয় শাসনে অগ্রগতি হবে একথা ঠিক নয়। বর্তমান সাংবিধানিক গণতন্ত্রের কাঠামোটির পুনর্বিন্যাস ঘটানো দরকার। কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক ও প্রশাসনিক কাঠামোর স্থায়ী পরিবর্তন না এলে সংবিধান সংশোধন করে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মর্যাদা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা সফল হবে না।

৮.৯ সারাংশ

গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের ধারণাকে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক দৃষ্টি নয়, ব্যবহারিক দিক থেকেও বিবেচনা করতে হবে। বিভিন্ন দেশের সংবিধানে বা রাষ্ট্রশাসনে বিষয়টি কিভাবে এসেছে এই আলোচনা দিয়েই বর্তমান এককের পাঠ শুরু হয়েছে। উদার-গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক এমনকি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেও কিভাবে স্থানীয় শাসনকে সংগঠিত করা যায়, স্থানীয় শাসনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের নীতিকে প্রসারিত করা যায়, বাস্তবায়িত করা যায় তার প্রচেষ্টা চলেছে। সীমিত নয়, বৃহৎ এবং কার্যকরী সরকারের কথা মাথায় রেখেই প্রায় সব দেশে স্থানীয় শাসন সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ভারতবর্ষে গ্রাম শাসন সংগঠন নিয়ে কোন সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রিক নীতি ছিল না। আশির দশক থেকে এ ব্যাপারে যে সংগঠিত প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে শুরু হল তারই পরিণতি গ্রাম শাসনের সাংবিধানিক মর্যাদা। পঞ্চায়েতকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেবার ব্যাপারটি নিয়ে প্রাথমিকভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধনের মধ্য দিয়ে বিষয়টি কার্যকর রূপ লাভ করে ১৯৯২ সালে।

সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধন আইন বলে সারা দেশের জন্য এক অখন্ড পঞ্চায়েত কাঠামো তৈরী হয়। পঞ্চায়েতকে তৃতীয় সরকারের মর্যাদা দেওয়া হয়। বলা হয় পরিকল্পনা রচনা আর তাকে বাস্তবায়িত করাই পঞ্চায়েতের প্রধান দায়িত্ব। পঞ্চায়েত নির্বাচন বাধ্যতামূলক হয়। জনসংখ্যার অনুপাতে তফসিলী জাতি, উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণ ও মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। গ্রাম সভার মাধ্যমে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম, বাজেট অনুমোদনের ব্যবস্থা হয়। পঞ্চায়েতের অর্থ সমীক্ষার জন্য অর্থ কমিশন গঠিত হয়। রাজ্য নির্বাচন কমিশন, জেলা পরিকল্পনা কমিটি গঠনের মাধ্যমে, নতুন নতুন বিধিনিষেধ ও ব্যবস্থা রেখে পঞ্চায়েতকে নব আঙ্গিক দেওয়া হয়েছে।

সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতকে নতুন মর্যাদা দানের ব্যবস্থা ১৯৯০-এর দশক থেকে রাজ্যে রাজ্যে পঞ্চায়েত সংগঠনের ব্যাপারে আরো বেশী করে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এক্ষেত্রে বলিষ্ঠ উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে। আশির দশক থেকে কর্ণাটক, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুনর্গঠিত হয়েছে। নতুন সংবিধান সংশোধন আইন এক্ষেত্রে নব উদ্যম সঞ্চার করেছে। শুধু দক্ষিণের রাজ্যগুলিতেই নয়, প্রায় সব রাজ্যেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নব রূপায়নের তাগিদ দেখা গেছে। তবে সাংবিধানিক মর্যাদা পেলেও, সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে যেমন জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তেমনি পঞ্চায়েত নিয়ে স্থানীয় ক্ষমতার চক্র, রাজনৈতিক বিরোধ ও হিংসা, দুর্নীতি প্রভৃতি বাসা বেঁধেছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সফল রূপায়নে ও গণতন্ত্রীকরণের পক্ষে এগুলি ক্ষতিকর।

৮.১০ অনুশীলনী

১। একটি বা দুটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) ফ্রান্সে স্থানীয় সরকার কী নামে পরিচিত ?

(খ) ব্রিটেনে স্থানীয় শাসন সংস্থার নাম কী ?

(গ) চিনদেশে স্থানীয় সংস্থার নাম কী ?

(ঘ) যুগোশ্লাভিয়ায় স্ব-পরিচালনার ধারণাটি কী ?

(ঙ) পঞ্চায়েতের সাংবিধানিক মর্যাদা নিয়ে ভেবেছে এমন দুটি বিশেষজ্ঞ কমিটির নাম করুন।

(চ) সংবিধানে ৬৪ তম সংশোধন বিলের একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

(ছ) পঞ্চায়েতকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে কোন্ সংবিধান সংশোধন আইনে ?

(জ) নতুন সংবিধান সংশোধন আইনের (১৯৭৩) একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

(ঝ) পঞ্চায়েতের সাংবিধানিক মর্যাদার তাৎপর্য কী ?

(ঞ) রাজ্যস্তরে পঞ্চায়েতের নব রূপায়নের ব্যবস্থা হয়েছে এমন দুটি রাজ্যের নাম করুন।

২। টীকা লিখুন (অনধিক ৫০ শব্দে) ঃ

(ক) পঞ্চায়েত বিষয়ে সিংভি কমিটি ও রাও কমিটি।

(খ) পঞ্চায়েত সম্পর্কে সারকারিয়া কমিশনের রিপোর্ট।

(গ) পঞ্চায়েত বিষয়ে ৬৪ তম সংবিধান সংশোধন বিল।

৩। অনধিক ৫০ শব্দে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন ঃ

(ক) পঞ্চায়েতের সাংবিধানিক মর্যাদা বলতে কী বোঝায় ? পঞ্চায়েতকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেবার কারণ কী ?

(খ) ৭৩ তম সংবিধান সংশোধন আইনের চারটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

(গ) সংবিধান সংশোধনের পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজ্যে পঞ্চায়েতের নব রূপায়নের জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

(ঘ) ৬৪ তম সংবিধান সংশোধন বিলের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

৪। অনধিক ১৫০শব্দে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন ঃ

(ক) ভারতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাংবিধানিক মর্যাদা সম্পর্কে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।

(খ) ভারতে ৭৩তম সংবিধান সংশোধন আইনে পঞ্চায়েত সংগঠনের কী কী বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে সংক্ষেপে লিখুন।

(গ) ৭৩তম সংবিধান সংশোধন আইনের তাৎপর্য উল্লেখ করুন।

(ঘ) বিভিন্ন রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উপর সংবিধান সংশোধন আইনের প্রভাব কী পড়েছে তা আলোচনা করুন।

৮.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১. Subhash C. Kashyap (ed) **Perspectives on the constitution of India (1993).**

২. **The Constitution of India (2000),** Govt. of India.

৩. A. Avasthi and A. P. Avasthi : **Indian Administration (1998).**

একক ৯ □ নগর প্রশাসনের বিবর্তন

গঠন

৯.০ উদ্দেশ্য

৯.১ প্রস্তাবনা

৯.২ নগরায়ণ কী ?

৯.৩ ভারতে নগরায়ণের ইতিহাস

৯.৪ ভারতে নগরায়ণের প্রকৃতি

৯.৫ স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নগরায়ণ প্রক্রিয়া

৯.৬ নগরায়ণের বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা

৯.৭ নগর প্রশাসন ব্যবস্থার বিবর্তন

৯.৮ বঙ্গীয় পুরশাসনের বিবর্তন

৯.৯ বঙ্গীয় পুর আইন : ১৯৩২

৯.৯.১ বঙ্গীয় পুর আইন, ১৯৩২ এর গঠনগত বৈশিষ্ট্য : পরিচালন কাঠামো

৯.৯.২ পুর বোর্ড

৯.৯.৩ চেয়ারম্যান

৯.৯.৪ কমিটি ব্যবস্থা

৯.৯.৫ পুর কর্মচারী

৯.১০ স্বাধীন ভারতে পৌর প্রশাসনের বিবর্তন

৯.১১ সারাংশ

৯.১২ অনুশীলনী

৯.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

৯.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- ভারতবর্ষে শহর বা নগর কাকে বলে ?
- ভারতবর্ষে নগরায়ণের প্রক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্য।
- নগরায়ণ সম্পর্কিত কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা।

- কোলকাতা মহানগরীর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংস্থা।
- ভারতবর্ষে নগর প্রশাসনের বিবর্তন
- বঙ্গীয় পুর প্রশাসনের বিবর্তন।
- ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় পুর আইন ও তার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য।
- স্বাধীন ভারতে পৌর প্রশাসনের বিবর্তন।

৯.১ প্রস্তাবনা

সমাজ বিজ্ঞানের শৃঙ্খলা-কাঠামোর মধ্যে ভারতবর্ষে নগর-বিকাশ সংক্রান্ত বিদ্যা ও পর্যালোচনা শুরু হয়েছে ১৯১৫ সালে ; সেই সময় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে একদল ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞানী ভারতবর্ষে নগর ও শহর সম্পর্কিত অধ্যয়নে উৎসাহিত হন। বস্তুতপক্ষে স্বাধীনতার পরেই সমাজ বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় নগর সমস্যা সংক্রান্ত বিস্তৃত গবেষণা শুরু হয়। ভূগোল, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি এবং গণ প্রশাসনের এলাকায় পৃথকভাবে নগর ও নগরায়ণ সম্পর্কিত সমস্যার প্রভাব ও প্রকরণ নিয়ে একটি গবেষণামূলক সমীক্ষা ভারতীয় সমাজ-বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের (Indian Council of Social Science Research) সৌজন্যে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া নগর-সমীক্ষক ও পরিকল্পনা-কারীগণও ষাটের দশক থেকেই এই বিষয়ে তাঁর মৌলিক অবদান রাখেন। এর পরেই সমাজ বিজ্ঞানের শাখা হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে নগর বিদ্যার (Urban Study)-র পঠন পাঠন শুরু হয়। এই বিদ্যার পঠন পাঠনের উৎস ও পদ্ধতিগুলো হলো—(ক) জনগণনা চিত্র (খ) ক্ষেত্রজ পর্যবেক্ষণ (গ) অত্যন্ত বলিষ্ঠ নমুনা সমীক্ষা (ঘ) পরিসংখ্যান ও গাণিতিক পদ্ধতি।

৯.২ নগরায়ণ কী ?

কতগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় অ-কৃষি গত বৃত্তিতে জনগণের অধিক সংখ্যায় কেন্দ্রীকরণের নামই নগরায়ণ ; অর্থাৎ নগর বা শহর বলতে বোঝায় এমন একটি বিশেষ এলাকা যেখানে জমির অ-কৃষিগত ব্যবহার হয় এবং বসবাসকারী জনগণেরও বৃত্তিগত পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ নগরায়ণে তিনটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

(১) কৃষি নিবিড় গ্রাম এলাকার চেয়ে বেশি জনঘনত্ব।

(২) গ্রাম থেকে শহরে অধিক সংখ্যায় জনগণের স্থানান্তর।

(৩) কৃষি থেকে অ-কৃষিগত বৃত্তিতে শ্রম-পরিবর্তন।

৯.৩ ভারতে নগরায়ণের ইতিহাস

ভারতবর্ষে নগরায়ণের ইতিহাস প্রায় ৫০০০ বছরের পুরানো। সেই অর্থে মেসোপটেমিয় এবং নীল নদ সন্নিহিত

এলাকায় সভ্যতার সমসাময়িক। ভারতবর্ষে নগরায়ণের প্রথম পর্যায়টি হলো অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই পর্যায়টির সূচনা ঘটে ২৩৫০ খ্রিঃ পূর্বাব্দের হরপ্পা সভ্যতায়। তারপর প্রায় ৬০০ বছর ধরে অর্থাৎ ১৭০০ খ্রিঃ পূর্ব পর্যন্ত এই নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটতে থাকে। তারপর প্রায় ১০০০ বছর পরে ভারতবর্ষের ইতিহাসে উত্তরে আর্য্যসভ্যতার অধীন ও দক্ষিণে দ্রাবিড় সভ্যতাধীনে শহর ও নগরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এর পরের ২৫০০ বছরে নগর সভ্যতা বিকাশ যেমন উপেক্ষিত হয়, তেমনই ৮০০খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে দক্ষিণ ভারতে নগর-সভ্যতা গৌরবের সু-উচ্চ শিখরে আরোহন করে। মুঘল যুগে ঘটে নগরায়ণের চরম পরিণতি। ব্রিটিশ আবির্ভাবের আগেই ভারতবর্ষ পৃথিবীর নগর সভ্যতাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম অবস্থায় নগরায়ণে শিথিলতা দেখা গেলেও ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্যায়ের অনেকগুলো নূতন নূতন শহর ও নগরের আবিভাব ঘটে ? উল্লেখযোগ্য এই যে নগরায়ণের প্রাগৈতিহাসিক যুগে নগর উন্নয়ন কেন্দ্রীভূত ছিল সিন্ধু নদ উপত্যকায় এবং তার সন্নিহিত রাজস্থান, পঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশের কিছু কিছু জায়গায়। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ লিখিত ইতিহাসের সময়কালে তা ঘটেছিল গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলে এবং ভারতের দক্ষিণ দিকে। প্রথম পর্যায়ের শহরগুলি হলো—মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, নালন্দা, তক্ষশীলা এবং বিজয়নগর। প্রাচীন অন্যান্য শহরগুলি হলো—পাটলিপুত্র, কাঞ্চীপুরম, মাদুরাই, বারাণসী এবং দিল্লি। নগরায়ণের অঙ্গ ছিল মন্দির ও অবিস্মরণীয় স্মৃতিস্তম্ভগুলি। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলি অধিকাংশই ছিল দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের এবং মুঘল যুগের বিশিষ্ট স্মৃতিস্তম্ভগুলি ছিল ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের।

৯.৪ ভারতে নগরায়ণের প্রকৃতি

ভারতের ক্ষেত্রে নগরায়ণ প্রক্রিয়াটি অবিশ্বাস্য রকম প্রকট হয়েছে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এবং ভারতের সামগ্রীক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় নগরায়ণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করেছে। ১৯৯১ সালের জনগণনা চিত্র অনুযায়ী সমগ্র জনসংখ্যার যখন ৮৪ কোটি ৪০লক্ষ তখন শহরে লোকের সংখ্যা হলো ২১ কোটি ৭০ লক্ষ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫% লোক শহরে বা নগরে বাস করে। ১৯৫১ সালের শহরে লোকের সংখ্যা ছিল ৬ কোটি ২০ লক্ষ, ১৯৮১ সালে তা বেড়ে হয় ১৫ কোটি ৯০ লক্ষ। অর্থাৎ ১৯৫১ সালের থেকে ১৯৯১—এই ৪০ বছরে শহরের বসবাসকারী লোকের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৩$^{1}/_{2}$ গুণ। অস্বাভাবিক এই দ্রুত হারে ভারতবর্ষের এই নগরায়ণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত যে কোনো দেশের নগরায়ণ প্রক্রিয়ার একটি বিপরীত চিত্র অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শিল্পোন্নত ইউরোপ এবং আমেরিকায় নগরায়ণ ঘটেছে সুস্পষ্টভাবে শিল্প শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধিতে ; ভারতবর্ষে ঘটেছে ঠিক তার বিপরীত কারণে—কৃষিশ্রমিকের চাহিদা হ্রাসের ফলে। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে একই সঙ্গে বেড়েছে নগরায়ণ ও শিল্পায়ন। ভারতের ক্ষেত্রে নগরায়ণ বাড়লেও শিল্পায়ন হয়েছে সেই তুলনায় শ্লথগতিতে। তাই পাশ্চাত্যের এক সমাজ সমীক্ষক পিচ (Peach) ভারতের এই নগরায়ণ প্রকৃতিকে সম্ভাব্যতা বিরোধী (Paradoxical) বলেছেন।

৯.৫ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নগরায়ণ প্রক্রিয়া

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে নগরায়ণে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি হলো—(ক) উদ্বাস্তু অনুপ্রবেশ এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে তাদের বসতি স্থাপন ; (খ) চণ্ডিগড়, ভুবনেশ্বর, গান্ধীনগর ইত্যাদি কয়েকটি নূতন প্রশাসন-শহর গড়ে

তোলা ; (গ) বড় শহরগুলির আশে পাশে কতগুলি নূতন শিল্প শহর গড়ে তোলা ; (ঘ) দশ লক্ষের উপরে জনবসতিপূর্ণ শহরের সৃষ্টি (ঙ) কতগুলো ছোটো শহরের আবদ্ধ অবস্থা এবং ধীরগতি অবলুপ্তি ; (চ) বিনা স্বত্বে বা অধিকারে জমি বাড়ী দখলকারী বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি এবং বড় শহর গুলিতে বস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি ; (ছ) গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত শহরের সীমানা (জ) নগর পরিকল্পনা এবং নাগরিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য নগর প্রশাসন ব্যবস্থা। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে প্রধানত দুটো পথ ধরে উদ্বাস্তু অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। প্রথমত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। এরা প্রধানত দিল্লি, দিল্লির আশেপাশে পঞ্জাব ও হরিয়ানায় এবং উত্তর-প্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে থাকে। দ্বিতীয়ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু যারা কোলকাতা ও তার আশেপাশে, আসামে এবং ত্রিপুরায় বসতি স্থাপন করে এবং এদের বাসস্থানের জন্য পশ্চিমবঙ্গে একটি, উত্তর প্রদেশে পাঁচটি, পঞ্জাবে চারটি, গুজরাটে তিনটি এবং মহারাষ্ট্রে একটি অর্থাৎ মোট ১৪ টি শহর গড়ে ওঠে। এই শহরগুলি মডেল শহর হিসাবে পরিচিত হয় এবং পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং দিল্লির ১৯টি স্থানে এই মডেল শহরগুলি নির্মাণের সুপারিশ করা হয়। তুলনায় পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে যারা আসেন তারা পঃবঙ্গ, আসাম এবং ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। অর্থাৎ পূর্ব বা দক্ষিণ ভারতের চেয়ে উত্তর ভারতেই নগরায়ণের চাপ ছিল বেশি। নগরায়ণের দ্বিতীয় প্রক্রিয়া—১৯৪৭ এর স্বাধীনতা এবং তাকে অনুস্মরণ করে পক্ষভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের ফলেও নূতন শহর গড়ে ওঠে। তার মধ্যে কেন্দ্রের সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্বে তৈরি হয় কয়েকটি রাজধানী শহর। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চণ্ডীগড়। অন্য শহরগুলি হলো আসামে দিসপুর, গুজরাটে গান্ধীনগর, উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বর। ভারতবর্ষের নগর পরিকল্পনায় এই শহরগুলি নূতন মাত্রা সংযোজন করেছে।

নগরায়ণের তৃতীয় প্রক্রিয়া—১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর বৃহত্তম শিল্পায়ত দেশগুলির মধ্যে ভারত ছিল দশম। ভারতবর্ষে শিল্পায়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফসল হিসাবেই সৃষ্টি হয় শিল্পশহর দুর্গাপুর, রুড়কেল্লা, ভিলাই নগর এবং বোকারো যাদের প্রত্যেকটিরই লোকসংখ্যা ছিল এক লাখের বেশি। অন্য শহরগুলি ছিল তেল সংশোধন শহর বারুনী, নুনমাটি, হলদিয়া এবং আংক্লেশ্বর ; সার উৎপাদন কেন্দ্র সিন্ধ্রি এবং মিত্রপুর, নয়া নাঙ্গাল এবং নামরূপ ; বন্দর শহর কান্দলা, পারাদীপ ; অ্যালোমিনিয়ম উৎপাদন কেন্দ্র কোর্ধা ও নামগিরি। এই শিল্পশহরগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো না কোনো বড় শহরের পাশে অবস্থান ছিল। এই ধরনের শিল্প শহরের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০। এর পরে এই ভাবেই পরবর্তী তিন দশক ধরে ভারতবর্ষে শিল্প শহরগুলির আবির্ভাব ঘটতে থাকে।

৯.৬ নগরায়ণের বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা

এই ভাবে ভারতবর্ষে যে নগরায়ণ ঘটতে থাকে তার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এক থেকে দশ লাখ জনবসতি নিয়ে খুব বড় শহর বা মেট্রোপলিটান তৈরি। ১৯৫১ সালে এই ধরনের শহরের সংখ্যা ছিল ৭৬টি। ১৯৮১ সালে তা বেড়ে হয় ২১৯টি। ১৯৮১ সালে জনগণনা চিত্রে এই ধরনের শহরগুলিতে বসবাসকারী অধিবাসীর সংখ্যা বলা হয়েছে ৯ কোটি ৪০লক্ষ। এই ধরনের বড় শহর নির্মাণের পাশাপাশি ভারতবর্ষে নগরায়ণের আর একটি সুস্পষ্ট প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়—তা হলো ক্ষুদ্রাকার কিছু শহরের অবক্ষয়। একটি সমীক্ষায় লক্ষ্য করা যায় যে ১৯৫১ সাল থেকে অপেক্ষাকৃত বড় শহরগুলির সংখ্যা বেড়ে যেখানে হয়েছে ২৮৪৪ থেকে ১৯৮১ সালে ৩২৪৫, সেখানে ছোটো শহরগুলির সংখ্যা ১৯৫১ সালে ২৩৪৫ এবং ১৯৮১ সালে তা হয় ২০২০ (২০০১ সালের জনগণনা চিত্রে শহরগুলির মোট সংখ্যা হলো ৫১৬১টি) একই কারণে ছোটো শহরগুলির সম্মিলিত জনসংখ্যাও এসে দাঁড়ায় সমগ্র লোকসংখ্যার ১৯% ভাগ। জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের কাছেও ছিল এটি অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ।

বলাবাহুল্য বড় শহরগুলি আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় নগরজীবনের নানা সমস্যা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়ে দাঁড়ায় গরীব মানুষের জন্য উপযুক্ত আবাসন গড়ে তোলা। জবর দখল, অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার এবং অস্বাস্থ্যকর চালাঘর, লতাপাতা বা বর্জ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি ঘরবাড়ী এবং রাস্তার পাশে সাধারণের পায়ে চলা পথ অবরোধ করে বাড়ীঘর দোর তৈরি হতে শুরু করে এই সময়েই।

ভারতবর্ষে নগরায়ণের এই প্রক্রিয়ার পাশাপাশি শুরু হয় আরেকটি প্রবণতা—বড় শহরগুলির ভৌগোলিক এলাকা বাড়তে বাড়তে গ্রামের ভৌগোলিক এলাকার ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। সমস্ত বড় শহরগুলিতে এইভাবে ঘটেছে গ্রাম—শহরের সীমানার অনির্দেশ্যতা, অস্পষ্টতা। শহরের সীমানার মধ্যে গ্রাম ঢুকেছে এবং ঐ গ্রামের জনগণ অনায়াসেই কোনো আর্থিক দায় গ্রহণ না করেই শহর-প্রশাসনের সুযোগ সুবিধাগুলি পেয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া শহরে বিজ্ঞি ও বস্তি এলাকায় যারা বাস করছেন তারাও জল, বিদ্যুৎ, আবর্জনা পরিষ্কার, পাকা-নর্দমা ইত্যাদি সমস্ত নাগরিক সুযোগ সুবিধাগুলি পেয়ে যাচ্ছেন কোনো ব্যয় স্বীকার না করেই ; এমনকি অবৈধ উপায়ে দখল করা বাড়ি বা জমিতেও যারা বাস করছেন তারাও পৌর সভার পরিষেবাগত সমস্ত সুযোগ ভোগ করছেন। অনেক সময় রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে বেআইনি দখলিকৃত সম্পত্তি বৈধ করে পৌরসভা ঐ জায়গায় বসবাসকারী ব্যক্তিগণকে পৌরসভার পরিষেবাগত সুযোগ সুবিধা দানের দায়িত্বও নিয়ে নেন। ফলে এই অসুবিধাগুলি পরিকল্পনাকারী ও নগর প্রশাসকগণের কাছে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর কালে নগরায়ণ প্রক্রিয়ার আর একটি বিশেষ দিক হলো নগর পরিকল্পনা রচনা। কেন্দ্রিয় সরকার কর্তৃক গঠিত এরকম একটি নগর ও শহর পরিকল্পনা সংগঠন (The Town and Country Planing Organisation) ১৯৫৭ সালে দিল্লির জন্য একটি বৃহদাকার পরিকল্পনা (Master plan) তৈরি করেন। এরই সঙ্গে শহর পরিকল্পনার জন্য একটা আদর্শ বিধির ছক তৈরি করেন যা অনুসরণ করে রাজ্য সরকারগুলি প্রয়োজনীয় আইন রচনা করতে পারেন। ষাটের দশকে সমস্ত রাজ্য সরকার শহর উন্নয়নের জন্য নগর পরিকল্পনা দপ্তর গঠন করেন। কেন্দ্রিয় সরকারের অর্থানুকূল্যে এই বিভাগগুলি সম্মিলিতভাবে প্রায় ৫০০টি পরিকল্পনা কাঠামো রচনা করেন। এই ধারা অনুসরণ করেই দিল্লি, মুম্বাই, কোলকাতা, চেন্নাই শহরে বড় শহর উন্নয়ন সংস্থা (Metropolitan Development Authority) গঠিত হয় যা পরবর্ত্তী সময়ে পরিকল্পিত নগর উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো রচনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

কোন স্থান বা এলাকাকে নগর বা শহর নামে চিহ্নিত করা যায় অথবা কোন মাপকাঠিতে গ্রাম ও শহরের সীমানা পৃথক করা যায়—সাধারণভাবে না হলেও দিল্লি, কোলকাতা ইত্যাদি বড় শহরগুলির ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি সমাজবিজ্ঞানী ও পরিকল্পনাকারীদের অত্যন্ত বিব্রত করে। সাধারণভাবে গ্রাম-শহরের এই দ্বিবিভাজনকে কয়েকটি মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা যেতে পারে। প্রথমত, লোকসংখ্যাভিত্তিক নির্দিষ্ট জনবসতি আকার আয়তন-গ্রাম-শহর অভিধা বা নামকরণের অস্পষ্টতা বা অনিশ্চিয়তা দূর করতে পারে। ভারতবর্ষে ১৯৮১ সালের জনগণনা চিত্রে এই প্রসঙ্গে যে জনসংখ্যাগত বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত হয়েছে তা পরবর্তী জনগণনা গুলিতেও গ্রহণ করা হয়েছে। যথা ঃ—

(ক) কোনো পৌর নিগম (Municipal corporation), পৌর সভা (Municipality), সেনা ছাউনী (Cantonment Board), বিজ্ঞাপিত শহর এলাকা (Notified Town Area)

অথবা

(খ) ন্যূনতম জনসংখ্যা হবে ৫০০০

অথবা

(গ) অধিবাসীগণের ৭৫% অ-কৃষিভিত্তিক বৃত্তিতে নিযুক্ত।

অথবা

(ঘ) ঐ এলাকার জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কি. মি. তে ৪০০।

উপরে উল্লিখিত মাপকাঠিগুলি পরিচ্ছন্নভাবে বৈধতা বা প্রশাসনিক মর্যাদাযুক্ত এবং জনগণনা প্রতিবেদন নির্দেশিত। ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের প্রণোদিত আইন মোতাবেক ঐ রাজ্যের পৌর আইন অনুযায়ী নগরভিত্তিক সংশ্লিষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয়েছে পৌর নিগমগুলিকে ক্ষমতা ও মর্যাদার দিক থেকে পৌরসভা থেকে পৃথক করা হয়েছে ; ছোটো শহরগুলিকে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন সংস্থা থেকে পৃথক করা হয়েছে। আবার লোকসংখ্যার পরিমাণ দিয়ে ভারতীয় জনগণনা চিত্রে নগর (Town) ও বড় শহরগুলির (city) মধ্যে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ—

জনসংখ্যা	শ্রেণী
১০০,০০০ ও তদূর্ধ্ব	প্রথম শ্রেণী
৫০,০০০ থেকে ৯৯,৯৯৯	দ্বিতীয় শ্রেণী
২০,০০০ থেকে ৪৯,৯৯৯	তৃতীয় শ্রেণী
১০,০০০ থেকে ১৯,৯৯৯	চতুর্থ শ্রেণী
৫,০০০ থেকে ৯,৯৯৯	পঞ্চম শ্রেণী
৫,০০০ এর চেয়ে কম	ষষ্ঠ শ্রেণী

(খ) ভৌগোলিক ভাবে হয়ত গ্রামীণ এলাকা ; কিন্তু সেগুলি শহুরে বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। যথাঃ—

(i) প্রকল্প উপনিবেশ (Project Colony) উদাহরণ, ফরাক্কা, বক্রেশ্বর, হলদিয়া।

(ii) নিবিড় শিল্পোন্নত এলাকা (Intensive Industrial Development) উদাহরণ—দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, বাটানগর, হলদিয়া, কল্যাণী।

(iii) রেল কলোনী (Railway Colony) উদাহরণ ঃ- খড়গপুর

(iv) গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র (Important Tourist Centre) উদাহরণ ঃ- বকখালি, মুর্শিদাবাদ, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং।

(v) তীর্থক্ষেত্র (Pilgrim place) উদাহরণ ঃ- বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর, কামারপুকুর, নবদ্বীপ।

শহর এবং নগর সম্পর্কিত আলোচনার সঙ্গে সম্পর্কিত কতগুলি ধারণা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত থাকা প্রয়োজন। এর মধ্যে একটি ধারণা হলো পিণ্ডিভূক্ত এলাকা বা Urban Agglomeration. ১৯৭১ সালে জনগণনা তথ্যে এই ধারণার সৃষ্টি। অনেক সময় দেখা যায় যে পৌর নিগম, পৌর সভা, সেনাছাউনী বা বিজ্ঞাপিত এলাকার বাইরে যে ব্যাপক পরিচিত এলাকা যা হয়ত এককভাবে কোনো নগরের অভিধাযুক্ত হবার যোগ্য নয়, এমন কি তারা হয়ত গ্রাম প্রশাসন সংস্থার অন্তর্ভুক্ত, এমন শহর বা নগর সন্নিহিত বিস্তৃত এলাকা নিয়ে গড়ে ওঠে পিণ্ডিভুক্ত এলাকা বা Urban Agglomeration । আসলে এই ধারণাটির মধ্যে একটি অর্থনৈতিক ব্যঞ্জনা আছে। পিণ্ডিভুক্ত ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে উৎপন্ন কৃষিজ দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুনরায় ব্যবহারের জন্য এবং নৈকট্য হেতু সংবাদাদি আদান প্রদান ঘটে এই এলাকাটিতেই। পিণ্ডিভূত নগর এলাকার ধারণা থেকেই নগরায়ণ প্রকৃতি ও প্রবণতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায়। পিণ্ডিভূত নগর এলাকা বলতে বুঝায় নগরের

নিরবচ্ছিন্ন প্রসার এবং শহর সন্নিহিত বিস্তৃতি বা দুই বা ততোধিক সন্নিহিত শহরের সম্মিলিত ভৌগোলিক এলাকা। ১৯৯১ সালের জনগণনা চিত্রে এই ধরনের পিণ্ডিত নগর এলাকার জনসংখ্যার ব্যাপক আয়তন বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

এছাড়া আরেকটি ধারণারও বিস্তৃত প্রচলন আছে। তা হলো Metropolis বা Metropolitan City. বাংলা পরিভাষায় যাকে বলা যেতে পারে প্রধান নগর বা মহানগরী। মুম্বাই, কোলকাতা, দিল্লি, চেন্নাই প্রভৃতি বড় শহরগুলি মহানগরী বলেই পরিচিত যাদের লোকসংখ্যা ১০ লক্ষেরও বেশি। এর মধ্যে কোলকাতা মহানগরীর স্বাধীনতা উত্তরকালে নগরায়ণ প্রক্রিয়ার ধারা সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা উচিত। কোলকাতা মহানগরীর ভৌগোলিক এলাকা অন্য তিনটি নামেও পরিচিত—

(i) কোলকাতা মহানগরী জেলা Kolkata Metropolitan District

(ii) কোলকাতা মহানগরী এলাকা Kolkata Metropolitan Area

(iii) যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন কোলকাতা নগর এলাকা— Kolkata Metropolitan Standard Area.

১৯৬১ সালে তৈরি হয় কোলকাতা মহানগরী পরিকল্পনা সংগঠন (Kolkata Metropolitan Planning Organisation; CMPO) । এই সংগঠনের দায়িত্ব ছিল মহানগরীর অধিবাসীগণের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, জনকল্যাণ সম্পর্কিত উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করা। ১৯৫০ এর দশকের মাঝামাঝি কোলকাতা বহু সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) প্রতিবেদনে তা স্বীকৃতি পায়। এই সমস্যাগুলির মোকাবিলা করার জন্যই তৈরি হয় কোলকাতা মহানগরী পরিকল্পনা সংগঠন (CMPO)। এই সংস্থাই ১৯৬৬ থেকে ১৯৮৬ এই ২০ বছরের জন্য একটি প্রাথমিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করে। কোলকাতা মহানগরী জেলাও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরই সঙ্গে যুক্ত হয় আরো দুটি সুবৃহৎ পরিকল্পনা—

(i) সামগ্রিক যানবাহন উন্নয়ন প্রকল্প (Comprehensive Transport Development Plan)

এবং

(ii) জল সরবরাহ, নোংরা জল নিষ্কাষণ, নর্দমা খনন সংক্রান্ত বৃহৎ প্রকল্প (Master Plan for water supply sewerage and drainage)।

১৯৭০ সালে তৈরি হয় কোলকাতা মহানগরী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (Kolkata Metropolitan Development Authority (CMDA)—মূলত ; এই শহরের সব পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য। এই সংস্থাই ধীরে ধীরে এই মহানগরীর উন্নয়নের জন্য আরো কিছু পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করে। পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত করার দায়িত্ব পড়ে—২টি পৌর নিগম, ৩৩টি পৌরসভা ও ৩৭টি পৌর প্রশাসনিক এককের উপর। হুগলী নদীর দুদিকে সুবিস্তৃত বিরাট এলাকার এই সব প্রশাসনিক সংস্থাগুলি একত্রে শহরমণ্ডল বা Conurbation নামে পরিচিত। এইভাবে ১৯৬০ সালে যে কোলকাতা জেলা মাত্র ৬৭৭.৮৭ বর্গ কিমি নিয়ে সীমাবদ্ধ ছিল তা বর্তমানে ১০৩৬৮.৪ বর্গ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্রব্য আগম নিগমের কোলকাতা অর্থনীতির প্রভাবের এলাকা হিসাবে এই এলাকাটিকে বলা হয় কোলকাতা মহানগরী অঞ্চল (Kolkata Metropolitan Region), একই ভাবে দিল্লি, চেন্নাই, মুম্বাই, হায়দ্রাবাদ ইত্যাদি মহানগরী গুলিরও ভৌগোলিক এলাকার বিস্তৃতি ঘটেছে।

৯.৭ নগর-প্রশাসন ব্যবস্থার বিবর্তন

ভারতবর্ষে নগরায়ণ ও মানব সভ্যতার সূত্রপাত প্রায় সমসাময়িক। প্রাগৈতিহাসিক কালে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা এবং তার আশে পাশে রাজস্থান, পঞ্জাব এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশের কোনো কোনো জায়গায় যে নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল তা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত হলেও তা ছিল মানবসভ্যতা বিকাশেরই একটি অংশ। সেখানে সংশ্লিষ্ট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর নিজেই যখন ঐ শহরতলির আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব বহন করতেন, তেমনি শহরের অধিবাসী গণের ন্যায়-বিচার পাবার অধিকার ও সুরক্ষা করতেন। ঐ নগরগুলির পৃথক কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল না। বংশাধিপতি কোনো এক রাজার সাম্রাজ্যের স্বার্থ, নিরাপত্তা ও রাজস্ব বিষয়ক স্বচ্ছলতা তৈরির জন্যই নগরগুলি পরিচালিত হতো। লিখিত-ইতিহাস-কাল শুরু হবার পর প্রায় ১০০০ বছর সময়কাল অর্থাৎ বেদুত্তর, মৌর্য্যযুগ অথবা তারও পরবর্তী সময় নগরায়ণের দ্বিতীয় পর্যায়। এ সময়েও হস্তিনাপুর, শ্রাবস্তি, কপিলাবস্তু, উজ্জয়িনী, অযোধ্যা, বারাণসী, পাটনা, মাদুরাই, কাঞ্চীপুরম ইত্যাদি নগরগুলির সন্ধান পাওয়া গেলেও সুবিন্যস্ত নগর প্রশাসন ব্যবস্থার সন্ধান মেলে না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে মৌর্য্য রাজাদের নগর প্রশাসন ব্যবস্থার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। নগরের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল একজন নাগরকের হাতে। নাগরকের মর্যাদা ও দায়িত্ব ছিল অনেকটা বর্তমান নগর পাল (Mayor) এর মতো। এই নাগরক ছিলেন পৌর বিষয়ক একজন মন্ত্রীর অধীন যাঁকে সমাহর্ত্তা বলা হতো। নগরকে চারটে ভাগে ভাগ করে প্রত্যেকটি ভাগ একজন স্থানিকের হাতে অর্পণ করা হতো। এই বিভাগগুলি আবার কতকগুলি গোপে বিভক্ত হতো। মোটামুটি প্রত্যেকটি গোপের উপর ১০ থেকে ৪০টি পরিবারের সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। এইভাবে প্রায় বর্তমান নগর প্রশাসন ব্যবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। মেগাস্থিনিশের বিবরণে পাওয়া যায়, প্রতিটি ৩০ জন সদস্য বিশিষ্ট ছটি কমিটি নগর প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কমিটির পরিবর্তে শাসক-মনোনীত অধ্যক্ষ বা তত্ত্বাবধায়কের উল্লেখ আছে। যে ভাবেই হোক কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নগর প্রশাসন ব্যবস্থার একটি সুশৃঙ্খল ও পরিকল্পিত উপকাঠামোর সন্ধান পাওয়া যায়। একেবারে অনুরূপ না হলেও প্রায় অভিন্ন নগর-প্রশাসন কাঠামোর পরিচয় পাওয়া যায় মুঘলযুগে। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরিতে ১৮০টি নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে নগর প্রশাসনের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতার অধিকারী দৃঢ়চিত্ত, অভিজ্ঞ, কর্মঠ, ধীরস্থির, মানবিক গুণের অধিকারী কোতোয়ালের কথা বলা হয়েছে। কোতোয়ালদের পালনীয় দায়িত্বের সুদীর্ঘ তালিকা বিশ্লেষণেও নাগরিকদের প্রতি নগর প্রশাসকগণের সুতীক্ষ্ণ দায়িত্ববোধেরই সন্ধান মেলে।

আধুনিক ভারতবর্ষে যে পৌর শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা মূলত ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থারই জাতক। ইংলণ্ডের নগর প্রশাসন ব্যবস্থার অনুকরণেই ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে একজন মেয়র (নগর পাল), ১২ জন অল্ডারম্যান (পৌরমুখ্য) এবং ৬০ জন বার্জেস (নগর প্রতিনিধি) নিয়ে একটি নগর পরিষদ (Town Council) গঠন করা হতো। এই পরিষদের হাতে যে যে দায়িত্বগুলি ন্যস্ত ছিল সেগুলি হলো—নগরের নিরাপত্তা বিধান, প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা ; নগরসজ্জা, বিদ্যালয়, জেলখানা, সভাগৃহ ও প্রাসাদ নির্মাণ ও সংরক্ষণ ; নগর পরিষদের কর্মচারী ও বিদ্যালয় শিক্ষকদের ব্যয় নির্বাহের জন্য কর আরোপ ইত্যাদি। কিন্তু জনগণ কর আরোপের তীব্র বিরোধীতা করলে পৌর শাসনের পরিবর্তে এক ধরনের মেয়র-আদালত (Mayor's Court) স্থাপন করা হয় ; এদের হাতে ছিল বিচার বিভাগীয় অনেক ক্ষমতা। ১৭৯৩ সালে চার্টার আইনের (Charter Act) বলে পৌর প্রশাসন বৈধতা লাভ করে এবং মাদ্রাজ, বোম্বাই, কোলকাতা এই তিনটি প্রধান শহরে পৌর প্রশাসন ব্যবস্থার শীর্ষে শান্তিরক্ষার্থে একজন নিম্নপদস্থ শাসক (Justice of peace) নিযুক্ত হন। ১৮৪২ সালে প্রণোদিত আর একটি আইনের বলে শহর কমিটি স্থাপনের মধ্য দিয়ে নাগরিকগণের সুযোগ সুবিধা দানের একটি সুদৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কিন্তু এই আইনে প্রত্যক্ষ করের

বিধান থাকায় ঐ আইনটি মানুষের সমর্থন পায়নি। ফলে পরোক্ষ করের ব্যবস্থা সহ ১৮৫০ সালে সারা দেশের জন্য আর একটি আইন পাশ হয়। কিন্তু এই আইনেও ছিল অনেক ত্রুটি ও তাই এই আইনটি বোম্বাই ও উত্তরপ্রদেশ ছাড়া কোথাও প্রযুক্ত হয়নি। এই আইনে আর্থিক সম্পদ সংগ্রহের ক্ষমতাও ছিল অপ্রতুল।

১৮৭০ সালে লর্ড মেয়ো স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে অধিকতর পরিষেবা গত সুযোগ সুবিধা দান এবং স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে মানুষের ইচ্ছা, উদ্যোগ ও ক্ষমতাকে যুক্ত করা। লর্ড মেয়োর এই প্রচেষ্টার ফলে নগর প্রশাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একদিকে যেমন বিকেন্দ্রীকরণ, অন্যদিকে আর্থিক স্বয়ংভরতার ক্ষেত্রেও অনুকূল বাতাবরণ তৈরি হয়। উল্লেখযোগ্য এই যে স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থাকে অত্যন্ত কার্য্যকর করার স্বার্থে লর্ড মেয়ো যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, ১৯৫৩-৫৪ সালে কর অনুসন্ধান কমিটিও তাকে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরবর্তী দিকচিহ্ন হচ্ছে ১৮৮২ সালে লর্ড রিপণের প্রস্তাব। ১৮৮২ সালের ১৮ই মে ঘোষিত এই প্রস্তাবে লর্ড রিপণ বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্থানীয় স্বার্থ এবং উদ্যোগকেই সমগ্র স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অর্থবহ করে তুলতে চেয়েছিলেন। এই ঐতিহাসিক প্রস্তাব একদিকে যেমন স্বায়ত্তশাসনের জাতীয় আগ্রহকে রূপ দেবার চেষ্টা করে, অন্যদিকে তেমনি সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদাকে মর্যাদা দিয়ে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক ও লোকায়ত করে তোলেন। তাই লর্ড রিপণকে ভারতবর্ষে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার রূপকার বলা হয়। পরবর্তী প্রায় ৪০ বছর ধরে এই ঐতিহাসিক প্রস্তাবটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে এবং পৌর প্রশাসন ব্যবস্থার প্রচলন ও প্রয়োগের বিস্তৃতি ঘটায়। শ্রী কে. এম. পানিক্কর (K. M. Panikkar) তাঁর A Survey of Indian History গ্রন্থে বলেছেন ঃ Lord Ripon's reform of local self Government laid the basis of local and municipal self-government which soon took firm root in India and became the groundwork of democratic institutions in higher spheres" এই প্রস্তাবের ফলেই এক দশকের মধ্যে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা ২২.৫% থেকে ৫৩.১% হয় এবং পৌর আয় ১.২৮ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২.০৫ কোটি টাকা হয়। আনুপাতিক হারে ব্যায়ও ১.২৮ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২.০৬ কোটি টাকা হয়। ১৮৮২ সালের ঐতিহাসিক রিপণ প্রস্তাবের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি—কার্য্যকর করার জন্য ১৮৮৪ সালে একটি আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইনটি পৌর প্রশাসন ব্যবস্থার কাঠামো ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি ও দায়িত্বের একটি মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে। এই আইনের বলে পুরবোর্ডের সমস্ত সদস্য নির্বাচিত হবেন এবং এতদিন ধরে প্রচলিত জেলা শাসকের নিয়ন্ত্রণ থেকে পুর প্রশাসনকে মুক্ত করা হয়। তাছাড়া এই প্রথম অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় শহরগুলিতে কোন অবস্থায় পৌর প্রশাসন প্রবর্তন করা হবে তা খোলাখুলি করে জানানো হয়। বলা হয় যে পৌর প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাপকাঠি হবে—(ক) সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসংখ্যা হবে ৩,০০০ (খ) ঐ এলাকার জনঘনত্ব প্রতি বর্গ মাইলে ১,০০০ জনের কম হবে না। (গ) ঐ এলাকার অধিবাসীগণের $^{3}/_{4}$ অংশ অ-কৃষিগত বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকবে। সম্পত্তির বার্ষিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে যেমন ভূ সম্পত্তির ফী দিতে হবে, তেমনি জল, বিদ্যুৎ, রাস্তা পরিষ্কার ইত্যাদি পরিষেবার জন্য কর দিতে হবে। শান্তি, সাধারণের স্বার্থহানি ইত্যাদি কারণ প্রদর্শন করে জেলা শাসক যে কোনো পৌরসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ দিতে পারতেন। ১৮৮৪ সালের আইনে পৌরসভা গঠনের জনগণের সঙ্কুচিত ভোটাধিকার ছিল। কিন্তু সরকারি মনোনয়ন ব্যবস্থার প্রভাবে ও আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাবে লর্ড রিপণের প্রস্তাবও এক ধরনের কেন্দ্রিকতা সৃষ্টি করে। ১৯০৭ সালে বিকেন্দ্রিকরণের জন্য একটি রাজকীয় কমিশন (Royal Commission on Decentralisation) গঠিত হয়। এই কমিশনই পৌর সংস্থাগুলিকে করস্থাপন ও করবৃদ্ধির অতিরিক্ত ক্ষমতা সহ আয়ব্যয় হিসাবের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য এবং একজন কার্য্যনির্বাহী আধিকারীকে (Chief Executive

officer) ও ২০,০০০ জনসংখ্যা বিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত ছোট শহরগুলিতে একজন স্বাস্থ্য অধিকর্তার নিয়োগ বাধ্যতামূলক হয়। পরবর্তী বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জও ঐ কমিশনের প্রস্তাবগুলির অনুকরণে ১৯১৫ সালে একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেন। স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার কাঠামো ও কার্য্যাবলির দিকে লক্ষ্য রেখেই এই প্রস্তাব রচিত হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রিয় সরকার সুপারিশগুলি পালনে রাজ্যসরকারকে বাধ্য করতে পারেনি। মূল উদ্যোগ কেন্দ্রিয় সরকারের হাতেই থেকে যায়। সর্বোপরি ১৯০৯ সালে ব্রিটিশ সরকার যে সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলীর (communal electorate) ব্যবস্থা করেছিলেন এই সময়ই তা স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রসারিত হয় এবং নগর প্রশাসণের গণতন্ত্রীকরণে কঠোর আঘাত হানে।

১৯১৮ সালে ভারত সরকার মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার আইন অনুসরণ করে আর একটি আইনের প্রস্তাব পাশ করে। এই প্রস্তাবে স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলিকে বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করে স্থানীয় মানুষের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করার মৌলিক নীতি গ্রহণ করেছিল। এই প্রস্তাবটির গুরুত্বের কথা বলতে গিয়েই অধ্যাপক রাশব্রুক (Prof. Rushbrook) বলেছেন : "....This resolution placed in the forefront of the objects of local self-government the training of the people in the management of their own affair and laid down in clear cut form the doctrine that political education must take precedence our departmental efficiency". ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের বলে ভারতে দ্বৈত শাসন (Dyarchy) প্রবর্তিত হয় এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের দায়িত্বটি রাজ্য তালিকায় স্থানান্তরিত (Transferred) হয় এবং রাজ্য সরকারের একজন মন্ত্রীর উপর স্বায়ত্তশাসনের ভার ন্যস্ত হয়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় জেলা আধিকারিকের ক্ষমতা অবলুপ্ত হয়। নির্বাচিত একটি পরিষদ ও নির্বাচিত সভাপতির (Chairman) হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় ; অবশ্য নগর প্রশাসন তদারকির ক্ষমতা জেলা আধিকারিকের কাছে থেকেই যায়। সাইমন কমিশনের প্রতিবেদনে এই সময়ে স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে—"In every province, while a few local bodies have discharged their responsibilities with undoubted success and others have been equally conspicuous failures the bulk lies between these two extremes". পরবর্তী ১৫ বছরে স্থানীয় পরিষেবা ও সুষ্ঠ পরিচালনা ও আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাবে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রসার শ্লথগতি হয়ে পড়ে। এর প্রধাণ কারণ ছিল নির্বাচিত পরিষদ সদস্যদের যথেষ্ট প্রশিক্ষণের অভাব। এরই ফলে তৎকালীন নগর প্রশাসন কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে পৌর সংস্থাগুলি পরিচালনায় স্বজন পোষণ, ভ্রষ্টাচার ও দুর্নীতি প্রকট হয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক ও জাতপাত নির্ভর নির্বাচনের প্রভাবে পৌর প্রশাসন ব্যবস্থা চরম উপেক্ষা ও অবহেলায় বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে। এই রকম একটা অবস্থার প্রতীকার সাধনের ১৯২৪-২৫ সালে এলাহাবাদ পৌর সভার সভাপতি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বলেন : গণতন্ত্রকে সফল হতে গেলে তার প্রেক্ষিতে থাকতে হবে জ্ঞান সমৃদ্ধ জনমত ও দায়িত্বশীলতা ("for, democracy, to be successful must have a background of informed public opinion")

১৯৫৩ সালের ভারত শাসন আইনের বলে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান হয়। সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অনুমোদনের পাশাপাশি স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা রাজ্য তালিকাভুক্ত হয়। জাতীয় আন্দোলনের বিস্তার এবং রাজ্যশাসনের স্বাতন্ত্র্যের দাবির মধ্য দিয়ে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ধারণাটি যথার্থ অর্থবহ হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে রাজ্যশাসনের সমস্ত ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে তুলে দিয়ে স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থায় প্রসারকে স্থগিত রাখা হয়। রাজ্যে রাজ্যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় এবং কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করতে থাকে। এই অবস্থা চলতে থাকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে নগর প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্থগিত থাকে।

৯.৮ বঙ্গীয় পুরশাসনের বিবর্তন

পুরশাসনের সর্বভারতীয় রাজনৈতিক বাতাবরণের মধ্যে বঙ্গীয় পৌরশাসন ব্যবস্থা আবর্তিত হতে থাকে। অবিভক্ত বাংলায় পৌর প্রশাসন প্রথম বিধিবদ্ধ হয় ১৮৪২ সালের আইনে। ঐ আইনেই কোলকাতার বাইরে শহরগুলিতে পৌর সংঘ বা বিভিন্ন ধরনের পৌর প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা বলা হয়। এই আইনেই স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সুযোগ ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য সংশ্লিষ্ট শহরের ১/৩ অংশ অধিবাসীর আবেদন ক্রমে একটি পৌর কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়। প্রয়োজনীয় আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাবে আইনের প্রয়োগ ব্যহত হয়। পরবর্তী কালে আরো দুইটি আইন প্রণোদিত হয়—(১) শহর উন্নয়ন আইন ১৮৫০ (Improvement of Town Act 1850) এবং ১৮৫৬ সালের পুলিশ আইন (Police Act 1856)। এই দুটি আইনের দ্বারা পৌর প্রশাসনকে আরো অনেক শহরে বিস্তৃত করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ দমনে বিপুল পরিমাণ অর্থব্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার পরিষেবাগত ব্যয় নির্বাহ অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু জনস্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতা জাতীয় পরিষেবা দানের ক্ষেত্রে শহর কমিটিগুলিই যে সবচেয়ে কার্যকরী হয়—ক্রমবর্দ্ধমান এই চেতনার ফলেই ১৮৬৪ সালের বাংলা পৌর আইন জনস্বার্থ সম্পর্কিত অধিকতর পরিষেবা বিতরণের কাজে এগিয়ে আসে। এই আইনেই প্রথম পৌর রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে জমি, অট্টালিকা, বাড়ী এবং যানবাহনের উপর করের কথা বলা হয়। জেলা শহর আইন, ১৮৬৮ (District Town Act 1868) দ্বারা ক্ষুদ্র শহরগুলির জন্য পৌর সংঘের প্রবর্তনের কথা বলা হয়। এই ক্ষেত্রে জেলাশাসক হবেন চেয়ারম্যান এবং শহরের অধিবাসীগণ কর্তৃক নির্বাচিত ৫ জন বেসরকারী প্রতিনিধি হিসাবে নগর প্রশাসনের দেখাশুনা করবেন। ৬০ এর দশকের শেষের দিকেই ভারতের বুদ্ধিজীবী শ্রেণি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নগর-প্রশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাধারণ মানুষের অংশ গ্রহণের দাবিতে সোচ্চার হয়। শহরের উল্লেখযোগ্য নেতৃস্থানীয় একদল মানুষ পৌর ব্যবস্থা গুলিতে জনপ্রতিনিধিত্বের দাবি তোলে। বলা বাহুল্য হিতবাদী ও উদারনৈতিক ব্রিটিশ রাজনৈতিক ভাবাদর্শও এই ধরনের দাবীদাওয়ার অনুকূলে প্রেরণা সঞ্চার করে। এরই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ লর্ড মেয়োর প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এই প্রস্তাবকে বিকেন্দ্রিকরণের একটি সচেতন প্রক্রিয়া (Conscious process of administrative devolution) বলা হয়। এই উদার প্রস্তাবটি ছিল ১৮৭৬ সালের বাংলা পুর আইনের (Bengal Municipal Act 1876) মৌলিক প্রেরণা। ১৮৫০, ১৮৫৬, ১৮৬৪ এবং ১৮৬৮ সালের চারটি আইনের বক্তব্য এই আইনটিতে সংহত হয়। ১৮৭৬ সালের এই আইনে জেলা শাসক বা তার মনোনীত ব্যক্তিকেই পুরসভার চেয়ারম্যান নিযুক্ত করার কথা বলা হয়। তা ছাড়াও বলা হয় নির্বাচিত উপ-সভাপতির (Vice-Chairman) কথা। পুরসভার এলাকার প্রসার ঘটে এই আইনের বলে এবং নৌকা, ফেরী, বাজারের উপর টোল বা শুল্ক জাতীয় কয়েকটি রাজস্ব উৎসের সন্ধান দেওয়া হয়। পৌর রাজস্ব ব্যায়ের বিষয়ে প্রয়োজনের অগ্রাধিকারের নির্ণয়ের কথা বলা হয়। আজও পর্যন্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পুর রাজস্ব ব্যায়ের যে নীতিটি প্রচলিত আছে তা মূলত ১৮৭৬ সালের প্রস্তাবেরই ফল। এর পরেই এল স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার অগ্রগতির আর এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ—১৮৮১ সালের লর্ড রিপণের প্রস্তাব। পৌর প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণই ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে—এই চেতনাটি এই আইনে সমাদৃত হয়।

বঙ্গীয় পুর আইন, ১৮৮৪ ঃ

১৮৮২ সালের বঙ্গীয় পুর আইনের বক্তব্যই ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় পুর আইনে গৃহীত হয়। এই আইনে পৌর প্রশাসনিক ব্যবস্থার কাঠামো, কাজ এবং দায়িত্বের বিষয়ে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। এই আইনেই নিয়ন্ত্রিত ভোটাধিকারের মাধ্যমে পুরসভার ১/৩ সদস্যকে কমিশনার হিসাবে নির্বাচিত করার কথা বলা হয়। বাকী ১/৩ অংশ

সরকার কর্তৃক মনোনীত হবে। কমিশনারগণ তাদের ভোটে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন। তাছাড়া জেলা সমাহর্তাকে পৌর প্রশাসনিক কাজকর্ম তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিভাগীয় কমিশনারকে পৌর বোর্ড কর্তৃক গৃহীত যে সিদ্ধান্ত বাতিল করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এইভাবে ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় পুর আইনে একদিকে যেমন পরিষেবা বিধানের পৌর কর্তৃত্বের বিস্তৃতি ঘটে, অন্যদিকে তেমনি পৌর প্রশাসনের উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণও বাড়ে। প্রায় ৫০ বছর ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় পুর আইনটি বলবৎ ছিল।

১৯৯৯ সালে ভারত শাসন আইনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যেমন উদারনীতি ও গণতান্ত্রিক বাতাবরণ সৃষ্টির প্রয়াস নেওয়া হয় তেমনি পৌর প্রশাসনের ক্ষেত্রেও বিকেন্দ্রিকরণ ও পৌর বোর্ডগুলির পরিষেবাগত ক্ষমতা বৃদ্ধির কথা বলা হয়। বাংলায় তখন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত অধিকারী ছিলেন বিখ্যাত জাতিয়তাবাদী নেতা স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ১৯১৯ সালের সংস্কার আইনের উদার মনোভাবের অনুসরণেই ১৯২৩ সালে পৌর প্রশাসনের একটি নতুন আইনের প্রস্তাব রচনা করেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা অনুমোদিত হয়নি। অনুকূল প্রবণতার মধ্যে ১৯৩২ সালে তৎকালীন মন্ত্রী স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়ের নেতৃত্বে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের বিকাশে সেই আইনটি প্রবর্তিত হয়। এই আইনটিই বঙ্গীয় পুর আইন, ১৯৩২ নামে পরিচিত। নগর প্রশাসন বিকাশের ইতিহাসে এই আইনটি যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

৯.৯ বঙ্গীয় পুর আইন ঃ ১৯৩২

সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা এই আইনের দ্বারা পৌর প্রশাসনের কথা বলা হয়। অবশ্য এখনও ভোটাধিকার ছিল নিয়ন্ত্রিত। নিয়ন্ত্রিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের 'কমিশনার' বলা হয়। কমিশনারদের নিয়ে গঠিত পুরবোর্ডই ছিল পুর প্রশাসনের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। পুর বোর্ডের সমস্ত প্রশাসনিক কর্তৃত্ব বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব ছিল চেয়ারম্যানের হাতে। তবে রাজ্য আইনসভায় প্রণোদিত আইন এবং পুর বোর্ডের সভায় কমিশনারদের গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক চেয়ারম্যানের কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রিত হতো। এখনও পর্যন্ত ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় পুর আইনটি বাংলায় পৌর প্রশাসনের প্রধান নীতিস্তম্ভ হিসাবে পরিগণিত হয়। এই আইনটিই এখনও পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ছোটো বড় সমস্ত শহরের পৌর প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত করছে।

৯.৯.১ বঙ্গীয় পুর আইন, ১৯৩২ এর গঠনগত বৈশিষ্ট্য ঃ পরিচালন কাঠামো

সমস্ত ক্ষমতা ৯ থেকে ৩০ জন কমিশনার নামে পরিচিত পর্যদগণের একটি বোর্ডের উপর ন্যস্ত। রাজ্য সরকার এই সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে। প্রত্যেক কমিশনার ৪ বছরের জন্য এক একটি নির্বাচন এলাকা বা ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত। কমিশনারগণ একটি সভায় মিলিত হয়ে কতগুলি বিষয়-ভিত্তিক কমিটি (Subject Committee) গঠন করে। তবে তা বাধ্যতামূলক নয়। এই কমিটিগুলির কোনো প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই, কেবল সুপারিশ দানের অধিকার আছে। পুর বোর্ডই নীতি নির্দ্ধারণ করে এবং সমস্ত প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব নির্বাহ করে। পুরবোর্ডই সমস্ত ক্ষমতার ভাণ্ডার। এই পুর বোর্ডর উপরেই নগর বিকাশ পরিচালিত করার বিপুল দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। কার্যত এই ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপরই প্রত্যার্পিত। চেয়ারম্যান কমিশনারগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। এইভাবে ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় পুর আইনে তিন ধরনের কর্তৃপক্ষের কথা বলা হয়েছে—(ক) পুরসভা (খ) চেয়ারম্যান (গ) একজন প্রশাসনিক অধিকর্তা ; অবশ্য এই নিয়োগ বাধ্যতামূলক নয়।

৯.৯.২ পুর বোর্ড

নির্বাচিত কমিশনারদের সংস্থা হলো পুর বোর্ড। সাধারণত মাসে ১ বার সভা বসে। প্রয়োজনে একাধিক অধিবেশন হতে পারে। দৈনন্দিন কাজের দায়িত্ব পুরবোর্ড চেয়ারম্যানের উপরেই অর্পণ করে। প্রত্যার্পিত ক্ষমতা চেয়ারম্যান উপ-সভাপতি (Vice-chairman) এর উপর অর্পণ করতে পারেন। এইভাবে ১৯৩২ সালের পুর আইনে পূর্বতন প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে সুস্পষ্ট পার্থক্য রচিত হয়। কারণ পূর্বে, জেলার রাজস্ব সংগ্রাহকই (Collector) ছিলেন পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান এবং তিনি নির্বাচিত কমিশনারদের সমস্ত ক্ষমতা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক ভাবে হস্তগত করে নিয়েছিলেন। অবশ্য ১৯৩২ সালের আইনে সভাপতির (Chairman) এক্তিয়ারের বাইরে কিছু বিষয় ছিল যেগুলি সম্পূর্ণভাবে পুর বোর্ডের অনন্য ক্ষমতার পর্যায়ভুক্ত। যথা—পৌর উচ্চ-পদাধিকারী ব্যক্তি (Officer) ও পৌর কর্মচারীদের নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতা ; সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও বিক্রয় ; চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া ; কতগুলি বিধি এবং উপবিধি (Byc-Rulc) তৈরি ; বাৎসরিক আয়ব্যয়ের প্রতিবেদন অনুমোদন ; পুর কর্মচারীদের কাজের সর্তাদি তৈরি করা ; পুর বোর্ডের ও বিভিন্ন কমিটিগুলির কার্য্য পরিচালনার নিয়মবিধি তৈরি করা, পুর কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা নির্ধারণ ইত্যাদি।

৯.৯.৩ চেয়ারম্যান

কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও পুরসভার সভাপতির বিশিষ্টতম ভূমিকা ১৯৩২ সালের পুর আইনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

শহরের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল (ward) থেকে নির্বাচিত জন প্রতিনিধি বা কমিশনারগণ তাদের সভাতেই একজন সভাপতি বা চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন এবং যতদিন তিনি পুর বোর্ডের সংখ্যাধিক সদস্যের আস্থাভাজন থাকেন ততদিন তিনি তাঁর কাজে বহাল থাকেন। তিনি পুরবোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং পুর প্রশাসনের সমস্ত দায়দায়িত্ব তাঁর উপরেই বর্তায়। তিনি একাধারে সভাপতি, প্রধান সচিব এবং রাজনৈতিক নেতা। পুর বোর্ড এবং কমিটিগুলি যে সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেন সেগুলিকে বাস্তবায়িত করা তাঁর দায়িত্ব। তিনি একদিকে পৌরসভা অন্যদিকে রাজ্যসরকার, জেলা কর্তৃপক্ষ, করদাতা নাগরিক এবং অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। তিনি মূলত একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং কমিশনারগণের বৃত্তিগত প্রশাসনিক দক্ষতা অনেক সময় তিনি তাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দিয়ে ভরাট করে নেন এবং তারই ফলে মূলত পুরসভার কর্মপ্রক্রিয়া রাজনৈতিক প্রক্রিয়াই হয়ে পড়ে। সাধারণ লোকের চক্ষে চেয়ারম্যানই হলেন পুরসভা পরিচালনার প্রধান ব্যক্তি। পুরসভার সমস্ত নথি, দলিল, স্মারক ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের আইনী কর্তৃত্ব চেয়ারম্যানের উপরেই ন্যস্ত। অবশ্য ১৯৩২ সালের পুর আইন অনুযায়ী সভায় সমবেত কমিশনারগণই চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী। শুধু নীতি নির্দ্ধারণ বা আলোচনা সভা নয়, আইনটির বিশ্লেষণ যথেষ্ট বোঝা যায় যে বঙ্গীয় পুর আইন ১৯৩২ প্রশাসনিক ক্ষমতাও অর্পণ করেছে কমিশনারগণের সম্মেলক সংস্থা পুরসভাকে। ফলে সেই অনুপাতে চেয়ারম্যানের ক্ষমতাও কমে যায়।

৯.৯.৪. কমিটি ব্যবস্থা

ইংলণ্ডে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার অনুকরণে ভারতে ব্রিটিশ শাসনাধীন নগর প্রশাসন কাঠামোতে কোনো কমিটি ব্যবস্থা ছিল না ; ১৮৮৪ সালের পুর আইনেও কমিটি ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত হয় চেয়ারম্যানের হাতে। এলাকা ভিত্তিক কতগুলি ওয়ার্ড কমিটি গঠনের কথা থাকলেও ১৯৩২ এর পুর আইনে তা একেবারে অবলুপ্ত হয়। পুর প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিটি ব্যবস্থাকে কোনো মর্য্যাদাই দেওয়া হয়নি।

প্রাথমিকভাবে (১) স্থায়ী কমিটি, (২) বিশেষ কমিটি, (৩) শিক্ষা কমিটি এবং (৪) যৌথ কমিটি—১৯৩২ এর আইনে এই চারটি কমিটির স্বীকৃতি থাকলেও একমাত্র শিক্ষা কমিটি ছাড়া কমিটিগুলির গঠন ছিল ঐচ্ছিক। প্রতি আর্থিক বৎসরের প্রাক্কালে কমিশনারগণ কতগুলি স্থায়ী কমিটি গড়তে পারতেন, কিন্তু তারও কোনো বাধ্যবাধকতা ছিলনা। যৌথ কমিটির সদস্যদের মধ্যে ১/৩ অংশ বহিরাগত হতে পারতেন। স্থানীয় কমিটির সিদ্ধান্ত পুরবোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। সাধারণত গণস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, গণপূর্ত্ত (Public works) কার্যাবলী, স্থায়ী সম্পত্তি ও ঘরবাড়ী এবং যানবাহন ইত্যাদি বিষয়গুলি দিয়েই স্থায়ী কমিটি গঠন করা যেতো ; কিন্তু তাও অমোঘ ছিল না। একমাত্র শিক্ষা কমিটি গঠনই ছিল অনিবার্য্য। একজন শিক্ষা সচিব অথবা রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত শিক্ষানুরাগী কোনো ব্যক্তি, কমিশনারদের সভায় তাদের মধ্য থেকে স্থিরীকৃত ২ থেকে ৪ জন কমিশনার, অনধিক ৩ জন স্থানীয় অধিবাসী নিয়ে গঠিত এই কমিটি পুরসভা কর্তৃক পরিচালিত সমস্ত বিদ্যালয়, পাঠাগার এবং যাদুঘরের পরিচালনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্পর্কে সমস্ত দায়িত্ব পরিচালনা করতেন। বঙ্গীয় পুর আইনের মধ্যে পুরসভা পরিচালন কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যৌথ কমিটির ব্যবস্থা। জল সরবরাহ, নর্দমা বা আবর্জনা পরিষ্কার সংক্রান্ত যে কোনো বৃহৎ দায়িত্ব সম্পাদনের দায়িত্ব ন্যস্ত এই কমিটির উপর। সাধারণত কমিটিগুলির কোনো নির্বাহী দায়িত্ব নেই। এইদিক থেকে ইংলণ্ডে প্রচলিত নগর প্রশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটেনে কমিটিগুলিও পুরবোর্ডের সঙ্গে নির্বাহী দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেয় এবং কমিটিগুলি তাদের পালনীয় দায়িত্বের জন্য পুরসভার কাছে দায়ত্বশীল থাকে। পঃবঙ্গে এই কমিটিগুলির ক্ষমতা সুপারিশমূলক এবং তা ১৯৩২ পুর আইন থেকেই শুরু।

৯.৯.৫. পুরকর্মচারী

ব্রিটিশ শাসনকালে পৌর প্রশাসনে পৌর কর্মচারী নিয়োগের কোনো বন্দোবস্তই ছিল না। পুরসভার চেয়ারম্যানই চিরাচরিত ভাবে পুরসভার প্রাত্যহিক কার্যনির্বাহের সমস্ত দায়িত্ব নির্বাহ করতেন। ১৯৪৪-৪৫ সালে প্রশাসন অনুসন্ধান কমিটি (Administration Inquiry Committee) যা Rowland Committee নামে পরিচিত ছিল, প্রথম রাজস্ব সংগ্রহকে নিশ্চিত এবং কার্যকরী করার জন্য একজন নির্বাহী আধিকারীকের সুপারিশ করে। কিন্তু এই আধিকারীকের নিয়োগকর্তা কে হবেন—রাজ্য সরকার না পৌর প্রশাসন, এই বিতর্কে ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়। শুধু পৌর কর্মচারী নিয়োগের প্রশ্নেই নয়, পুরসভার কাজে যথেষ্ট শৃঙ্খলা ও দায়িত্বশীলতা আনয়নের জন্য ১৯৪৪-৪৫ সালে রাওল্যাণ্ড কমিটি রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের সঙ্গে যুক্ত একটি পরিদর্শক (Inspectorate) ব্যবস্থার কথাও সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু সেটিও কার্যকরী হয়নি।

৯.১০ স্বাধীন ভারতে পৌর প্রশাসনের বিবর্তন

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে প্রাথমিক ভাবে নগর প্রশাসনের কোনো ব্যবস্থা বা নগর প্রশাসনের জাতীয় নীতি প্রণয়নের কোনো উল্লেখ ছিল না। সংবিধানের ৪০ নং ধারায় গ্রাম পঞ্চায়েতের গঠনের উল্লেখ ছিল। কিন্তু স্পষ্টভাবে পৌর প্রশাসনের কোনো নির্দেশ ছিল না ; কেবল ৩৮নং ধারায় উল্লেখ ছিল—রাজ্যগুলি এমন সামাজিক ব্যবস্থা অবলম্বন করবে যাতে জাতীয় জীবনের সমস্ত সংস্থাগুলিতে সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এদিকে স্বাধীন সরকার সোভিয়েত রাশিয়ার মডেলে একখানি সামগ্রীক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণ করায় বিনিয়োগ যোগ্য সমস্ত অর্থ কেন্দ্রিভূত হয় এবং রাজ্য সরকারগুলি তাদের ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয়ের জন্য কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এদিকে সংবিধান নির্দেশিত আইন অনুযায়ী নগর পরিকল্পনা, জমি

অধিগ্রহণ, বাড়ী ভাড়া, পৌর প্রশাসন ইত্যাদি আনুষঙ্গিক সমস্ত দায়িত্ব রাজ্যের হাতেই ন্যস্ত হয়। বিভিন্ন রাজ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যে এই ব্যবস্থাগুলিও ভিন্ন ভিন্ন হয়। কেন্দ্রীয় স্তরে একটি কেন্দ্রীয় নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধীন নগর ও শহর উন্নয়ন সংস্থা (Town & Country planning organisation) নামক একটি সংস্থা থাকলেও তার ক্ষমতা ছিল নিতান্তই সুপারিশমূলক। এর ফলে জাতীয় নগর নীতি রচনা সম্ভব হয়নি। এই কারণেই স্বাধীনতার পর অন্তত দুই দশক ধরে পঃবঙ্গ সহ ভারতীয় নগরগুলির উন্নয়ন কাঠামোর কোনো পরিবর্তন সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ ব্রিটিশ শাসনে যে কেন্দ্রিকতার অভিযোগ ছিল, স্বাধীন ভারতের প্রথম তিনদশক তা প্রায় অব্যাহতই ছিল। অথচ জনসংখ্যা বেড়েছে দ্রুতগতিতে। এক পশ্চিমবঙ্গেই এই জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ (১৯৫১ সালে ৬২ লক্ষ ৮০ হাজার থেকে ১৯৭১ সালে ১ কোটি ৯৭ হাজার) সমগ্র দেশে এই জনসংখ্যা যে পরিমাণে বেড়েছে শহরগুলিতে বৃদ্ধির হার ছিল তার চেয়ে বেশি। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে শহরে নানা সমস্যা—বস্তি, ঘিঞ্জি জনবসতি, দারিদ্র ও জীবনযাত্রার জটিলতা। নাগরিক সুযোগ সুবিধা ও পরিষেবার ক্ষেত্রগুলি দ্রুত হারে সঙ্কুচিত হয়েছে। এর মধ্যেই পঃবঙ্গে ১৯৩২ সালের পৌর আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে পৌর প্রশাসন ব্যবস্থা চালাতে থাকে। ১৯৩৪ সালে পঃবঙ্গে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার সর্বপ্রথম স্বীকৃত হয়। ২৫ বছর থেকে নামিয়ে ২১ বছর বয়স্ক সকল পুরবাসীকে পৌর সভার সদস্য নির্বাচিত হবার অধিকার দান করা হয়। সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার ১৯৮০ সালে ১৮ বছরে নামিয়ে আনা হয়। স্মরণ করা যেতে পারে সংবিধানের ৬২ তম সংশোধন আইন অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনে ১৮ বছর বয়স্ক সমস্ত নাগরিকের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় ১৯৮৮ সালে। অর্থাৎ ঐ সময় থেকেই পঞ্চায়েত, পুরসভা, রাজ্যআইনসভা ও সংসদ—সব কটি নির্বাচনেই একই ভোটার তালিকা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ১৯৭৮ সালে বহু সদস্য নির্বাচন এলাকা (Multimember ward) এর বদলে এক সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন এলাকা (Single member ward) এর ব্যবস্থা করা হয়। শুধু তাই নয়, যাতে প্রত্যেকটি এলাকা থেকে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব ঘটে তার জন্য রাজ্য সরকার আইন করে নির্বাচন এলাকা (Ward) সংখ্যাও বাড়ায়। ১৯৮২ সালে এই ওয়ার্ডগুলির ভৌগোলিক সীমা পরিবর্তনের দায়িত্বটি দেওয়া হয় স্থানীয় সংস্থার পরিচালককে (Local Body Director); এর মধ্যেই পঃবঙ্গে পরিবর্তিত বামপন্থী সরকারের রাজনৈতিক বাতাবরণে কলিকাতা পুর নিগম আইন, ১৯৮০ প্রণোদিত হয়। ১৯৫১ সালের কলিকাতা পুর আইনের চিরায়ত বিধানগুলি অক্ষুন্ন থাকলেও, ১৯৮০ সালের কলিকাতা পুরনিগম আইনই প্রথম মন্ত্রিসভা পরিচালিত পৌর সরকারের ব্যবস্থা করে। ভারতীয় লোকতন্ত্রের ৪৪ তম বর্ষে পশ্চিমবঙ্গে পৌর প্রশাসন সম্পর্কিত প্রচলিত সমস্ত আইন (১৯৩২ সালে বঙ্গীয় পৌর আইন, ১৯৫৫ সালের চন্দন নগর পৌর আইন, ১৯৮০ সালের হাওড়া পৌর নিগম আইন, ১৯৮০ সালের কোলকাতা পৌর আইন, ১৯৯০ সালের আসানসোল পৌরনিগম আইন) একত্রিকরণ ও সংশোধন পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন, ১৯৯৩ অনুমোদিত হয়। ছয়টি পুর নিগম আইন যেমন সংশ্লিষ্ট ছয়টি বড় শহরের পৌর প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত করবে। ১৯৯৩ সালের বঙ্গীয় পুর আইন এককভাবে পশ্চিমবঙ্গের ১১২ টি শহরের পৌর প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত করবে। উল্লেখযোগ্য এই যে পরের বছরেই ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পঃবঙ্গ বিধান সভায় দুটি আইন অনুমোদিত হয়—

(১) পঃবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন আইন, ১৯৯৪ (২২.৩.৯৪)

(২) পঃবঙ্গ পৌর নির্বাচন আইন, ১৯৯৪ (২০.৭.৯৪)

কলিকাতা পুর নিগম আইন, ১৯৮০-র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন হয়েছে ২০০১ সালে (W.B. Act VIII of 2001); কিন্তু ১৯৯৩ সালের বঙ্গীয় পুর আইন এখনও পর্য্যন্ত সর্বাংশে অপরিবর্তিত থেকেই পঃবঙ্গ পৌর প্রশাসন ব্যবস্থার বিধিস্তম্ভ হিসাবে কাজ করছে।

৯.১১ সারাংশ

ছোটো জনগোষ্ঠী থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প এবং অন্যান্য অ-কৃষিগত বৃত্তির বিস্তৃত এলাকায় মানুষের স্থানান্তরের যে প্রক্রিয়া তারই নাম নগরায়ণ। এই নগরায়ণ প্রক্রিয়ার সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে পৌর প্রশাসনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় পুর আইন। এখনও তা পঃবঙ্গে পুর প্রশাসনের নীতিস্তম্ভ হিসাবে স্বীকৃত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে ক্রমবর্দ্ধমান নগরায়ণ উন্নয়ন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে যেমন অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছে, তেমনি জন্ম দিয়েছে নূতন নূতন ধারণা ও সংগঠনের। তারই মাঝে মাঝে পৌর প্রশাসনকে প্রকৃত অর্থে স্বায়ত্তশাসন করে তুলবার জন্য বঙ্গীয় পুর আইন। ১৯৩২ এর প্রয়োজনীয় সংশোধন চলতে থাকে। অবশেষে ১৯৯৩ সালের বঙ্গীয় পুর আইন প্রণয়ণের মধ্য দিয়ে সমকালীন পঃবঙ্গে পৌর প্রশাসনের চূড়ান্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত হয়ে যায়।

৯.১২ অনুশীলনী

১। দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ—

(ক) ভারতবর্ষে নগরায়ণের প্রক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

(খ) ভারতবর্ষে নগর প্রশাসনের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করুন।

(গ) বঙ্গীয় পুর প্রশাসনের বিবর্তন প্রসঙ্গে বঙ্গীয় পুর আইন, ১৯৩২ এর কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

(ঘ) স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে পৌর প্রশাসনের বিবর্তন আলোচনা করুন।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ-

(ক) নগরের বা শহরের সংজ্ঞা দিন।

(খ) নগর বা শহরের তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করুন।

(গ) ভারতের নগরায়ণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে পাশ্চাত্যের নগরায়ণ প্রক্রিয়ার পার্থক্য কী?

(ঘ) পৌর সংঘ বলতে কী বুঝায়?

(ঙ) Urban Agglomeration বা পিণ্ডিভূত এলাকা বলতে আপনার ধারণা কী?

(চ) কোলকাতা মহানগরী পরিকল্পনা সংগঠন বা CMPO কী?

(ছ) কোলকাতা মহানগরী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা CMDA কী?

(জ) ভারতের নগরায়ণের কোনো জাতীয় নীতি রচিত হয়নি কেন?

৩। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ-

(ক) অবিভক্ত ভারতে প্রাগৈতিহাসিক দুটি শহরের নাম বলুন।

(খ) ভারতবর্ষে মধ্যযুগের দুটি প্রাচীন শহরের নাম বলুন।

(গ) কার রচিত কোন্ গ্রন্থে মুঘল যুগের নগর প্রশাসনের কথা জানা যায়?

(ঘ) কোন্ আইনটিকে বঙ্গীয় পুর প্রশাসনের নীতিস্তম্ভ বলা হয়?

(ঙ) পঃবঙ্গে মোট কয়টি পুর নিগম আছে ও কী কী?

(চ) পঃবঙ্গে মোট কয়টি পুরসভা আছে?

(ছ) কোন আইন অনুযায়ী বর্তমানে পঃবঙ্গে পুর প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়?

৯.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

১। Urbanisation and urban systems in India—R. Ramachandran (Oxford Univ. Press)

২। Indian Administration—Mohit Bhattacharya (World Press).

৩। Municipal Management and Electoral Perception—Asok Mukhopadhay (World Press)

একক ১০ □ নগর প্রশাসনের কাঠামো

গঠন

১০.০ উদ্দেশ্য

১০.১ প্রস্তাবনা

১০.২ নগর প্রশাসনের কাঠামো

১০.৩ কোলকাতা পুর নিগমের বিবর্তন

১০.৪ কোলকাতা পুর নিগম আইন, ১৯৮০

- ১০.৪.১ পুর নিগমের গঠন
- ১০.৪.২ নগরপাল ও চেয়ারম্যান
- ১০.৪.৩ নগরপাল-সহ-পারিষদ
- ১০.৪.৪ তিনটি কমিটি
- ১০.৪.৫ পুরনিগমের আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মচারী

১০.৫ পৌর কৃত্যক

১০.৬ কোলকাতা পুর নিগমের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

১০.৭ স্বেচ্ছাধীন কার্যাবলী

- ১০.৭.১ মেয়র পরিষদের কাজ
- ১০.৭.২ মেয়র পরিষদ ব্যবস্থার উদ্ভব
- ১০.৭.৩ মেয়র
- ১০.৭.৪ নগরপাল ও চেয়ারম্যান

১০.৮ কমিশনার

১০.৯ মেয়র বনাম কমিশনার

১০.১০ পৌর তহবিল

- ১০.১০.১ আয়ের উৎস

১০.১১ পুর নিগম আইনের সমস্যা

১০.১২ রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ

১০.১৩ পৌরসভা ঃ কাঠামো ও কার্যাবলী

- ১০.১৩.১ পৌরসভার গঠন
- ১০.১৩.২ আসন সংরক্ষণ

১০.১৩.৩ গণপূর্তি
১০.১৩.৪ কাউন্সিলর পর্ষদের সভা
১০.১৪ চেয়ারম্যান
১০.১৫ বিরোধীদলীয় নেতা
১০.১৬ বোরো কমিটি
১০.১৭ ওয়ার্ড কমিটি
১০.১৮ পৌরসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী
১০.১৯ পৌর তহবিল
১০.২০ ১৯৯৩ সালের পৌর আইনের বৈশিষ্ট্য
১০.২১ প্রজ্ঞাপিত এলাকা
১০.২২ সারাংশ
১০.২৩ অনুশীলনী
১০.২৪ গ্রন্থপুঞ্জী

১০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- পশ্চিমবঙ্গে পৌর সংঘগুলির নাম ও সংখ্যা
- কোলকাতা পুর নিগমের বিবর্তন
- কোলকাতা পুর নিগম আইন, ১৯৮০ কর্তৃপক্ষ, কাঠামো ও কার্যাবলি
- পশ্চিমবঙ্গে পৌরসভাগুলির জেলা ভিত্তিক পরিসংখ্যান
- পশ্চিমবঙ্গে পৌর আইন, ১৯৯৩ (১৯৩০ এর বঙ্গীয় পুর আইনের সঙ্গে তুলনা) কর্তৃপক্ষ ও কাঠামো
- বিজ্ঞাপিত এলাকার প্রশাসন : কাঠামো, কার্যাবলি ও বৈশিষ্ট্য

১০.১ প্রস্তাবনা

দীর্ঘদিন ধরে ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় পুর আইনই পঃবঙ্গে পুর প্রশাসনের নীতিস্তম্ভ হিসাবে বিবেচিত হতো। কিন্তু স্বাধীনতার পরেও সারা ভারতে পৌর প্রশাসন প্রচলিত কাঠামো ও কাজ নিয়ে প্রকৃত স্বশাসিত সংস্থায় রূপান্তরিত হতে পারেনি। যেখানে যখন যেমন প্রয়োজন স্থানীয় রাজ্য আইনে তেমন সংশোধন করেই চলছিল পৌর প্রশাসন ; তার না ছিল কোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ সুঠাম চেহারা, না ছিল নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্বের মর্যাদা। এই অভাব বোধ থেকেই

১৯৮৯ সালে একটি কেন্দ্রীয় নগরপাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনের প্রতিশ্রুত সিদ্ধান্ত ছিল ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে হবে সেখানে যেখান থেকে ক্ষমতা উৎসারিত হয়। এই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করার জন্যই ১৯৯২ সালে ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইন প্রনীত হয় এবং ২৪৩ নং ধারার সঙ্গে ১৮টি উপধারা সংযোজিত হয়। এই সংশোধনী একদিকে যেমন পৌর প্রশাসনকে সাংবিধানিক মর্যাদা দান করেছে, অন্যদিকে তেমনি সবদিক থেকে নগর প্রশাসনকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত প্রসারিত করার প্রয়াস গ্রহণ করেছে। এই আইনের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করেই পঃবঙ্গ আইন সভায় ১৯৯৩ সালে নূতন করে এবং আগের সমস্ত আইনের সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশগুলিকে একত্রিত করে একটি পুর আইন প্রণোদিত হয়। এখন এই আইনটিই পঃবঙ্গে পৌর প্রশাসন পরিচালনা করে।

১০.২ নগর-প্রশাসনের কাঠামো

পশ্চিমবঙ্গে পৌরসংঘগুলি শহর এলাকার স্বায়ত্ত শাসনের দায়িত্বে আছে। পৌরসংঘগুলির মধ্যে আছে—

(ক) ১১৭টি পৌরসভা।

(খ) কোলকাতা, হাওড়া, চন্দননগর, আসানসোল, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি—এই ৬টি পুর নিগম

(গ) মিরিক (দার্জিলিং জেলা), তাহেরপুর (নদীয়া) এবং কুপারস ক্যাম্প (নদীয়া)—এই ৩টি বিজ্ঞাপিত এলাকা এবং (ঘ) বারাকপুর সেনা ছাউনী

পুরনিগমগুলির গঠন প্রক্রিয়া এবং কার্যাবলি প্রায় অভিন্ন। সর্ববৃহৎ এবং প্রাচীনতম পুর নিগম হিসাবে কোলকাতা পুরনিগমের বিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারে।

১০.৩ কোলকাতা পুর নিগমের বিবর্তন

কোলকাতা পুর নিগমের সুদীর্ঘ ইতিহাস শুরু হয় ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে। এই সময় জন প্রতিনিধিত্ব বনাম সরকারি মনোনয়নের প্রশ্নে বিতর্ক উপস্থিত হয়। অবশেষে স্থির হয় যে পুর প্রশাসনের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ন্যস্ত থাকবে শান্তি রক্ষার্থ নিয়োজিত শাসকদের (Justices of Peace) উপর এবং তাঁদের কাছে দায়িত্বশীল একজন আধিকারিকের উপর প্রশাসনিক দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে। বাংলার গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পলের উদ্যোগেই ১৮৭৬ সালে প্রথম নির্বাচনের নীতি গৃহীত হয়। ঠিক হয় ৭২ জন করপোরেশন সদস্যের মধ্যে ৪৮ জন নির্বাচিত হবেন এবং বাকি ২৪ জন সরকারের মনোনীত সদস্য থাকবেন। ১৮৮৮ সালে এই ব্যবস্থাটির ঈষৎ সংশোধন করে বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্স, ক্যালকাটা ট্রেডারস্ এ্যাসোসিয়েশনে এবং পোর্ট কমিশনের জন্য আসন সংরক্ষিত হয়। এই সময়েই প্রভাবশালী ও বিত্তশালী লোকেদের প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটে। এই বছরেই আইন করে কমিশনারদের ক্ষমতা বাড়ানো হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বলা হয় যে করপোরেশনের অক্ষমতার অভিযোগ দেখিয়ে সরকার কমিশনারদের মতামত উপেক্ষা করেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবে না। এই অবস্থা বলবৎ থাকে ৯বছর। ১৮৯৯ সালে প্লেগরোগে বিধ্বস্ত কোলকাতাকে শক্ত হাতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিরাপত্তা দানের জন্য তৎকালীন গভর্নর ম্যাকেঞ্জির নির্দেশ অনুযায়ী একজন প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারিক একটি সাধারণ কমিটি ও একটি পরিষদ্ নিয়ে কোলকাতা করপোরেশন নূতন ভাবে গঠিত হয়। কোলকাতা করপোরেশনের তার পরের ইতিহাসেই সংযোজিত হয় ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয় চেতনার প্রভাব ও জন প্রতিনিধিত্বের দাবি। ব্রিটিশ উদারনৈতিক

চিন্তাধারায় পুষ্ট মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার আইন অনুমোদিত হয় ১৯১৯ সালে। তারই সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বাংলার তৎকালীন স্বায়ত্ত শাসন মন্ত্রী শ্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কোলকাতা করপোরেশনের প্রশাসন ব্যবস্থাতেও স্বরাজের দাবি উত্থাপন করেন। এর ফলে নূতন আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইনে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত পুর বোর্ডকেই চূড়ান্ত কর্তৃত্ব দান করা হলো এবং প্রধান নির্বাহী আধিকারিককেও ঐ পুর বোর্ডের কাছে দায়িত্বশীল করা হলো। কিন্তু এর পর জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতে জোয়ার আসায় স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক দাবি দাওয়ার ক্ষেত্র অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়ে। এই অবস্থার মধ্যে দেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার পরে ১৯৪৮ সালে কোলকাতা করপোরেশন বাতিল করা হয় এবং করপোরেশনের কার্যাবলী অনুসন্ধান করার জন্য বিচারপতি শ্রী সি. সি. বিশ্বাসের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের সুপারিশ করলেও এই প্রক্রিয়ায় সমাপ্তি ঘটে ১৯৫১ সালে। এ বছরেই কলকাতা করপোরেশন আইন ১৯৫১ অনুমোদিত হয় এবং দীর্ঘদিনের উপনিবেশিক ও আমলাতান্ত্রিক পৌর প্রশাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটে। কলকাতা করপোরেশনের বিবর্তনে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলি নূতন মাত্রা সংযোজিত করেছে—

(ক) ১৯৬৯ সালে রাজ্যে এবং কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা পরিচালিত ধাঁচে পৌর প্রশাসনকে রূপান্তরিত করবার জন্য গণপ্রশাসন বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

(খ) ১৯৭২ সালে রাজ্যে সরকার গঠনের পরেই, কংগ্রেস কর্তৃক ১৯৫১ সালের কোলকাতা কর্পোরেশন অধিগ্রহণ পদ্ধতির সংশোধন এবং ঐ বছরেই ৩৯টি বামপন্থী পৌরসভা সহ কোলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচিত পুরবোর্ড বাতিল ও কোলকাতা কর্পোরেশন অধিগ্রহণ।

(গ) ১৯৭৭ সালের নির্বাচিত বিপুল ভোটাধিক্যে বামপন্থীদের জয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার গঠন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সংস্থাগুলির মর্যাদা পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি।

(ঘ) ১৯৭৮ সালে কোলকাতা পুর নিগম সহ সমস্ত পুরসভাগুলিতে ভোটাধিকারের বয়স ২১ থেকে ১৮নামিয়ে আনা। স্মরণ থাকতে পারে ১৯৮৮ সাল পর্য্যন্ত রাজ্য আইনসভা ও কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচকদের ভোটের বয়স ২১ই থেকে যায়।

(ঙ) ১৯৭৯ সালে তৎকালীন স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী শ্রী প্রশান্ত সূরের উদ্যোগে মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকারের মডেলে কলকাতা পুর প্রশাসনকে পুনর্গঠনের জন্য পঃবঙ্গ বিধানসভায় একটি নূতন আইনের প্রস্তাব আনয়ন। অনুমোদিত এই প্রস্তাবটিই কোলকাতা পুরনিগম আইন, ১৯৮০ নামে পরিচিত।

কোলকাতা পুর নিগম আইন, ১৯৮০ হলো কোলকাতা পুরনিগম পরিচালনার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রক। ১৯৮৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারী থেকে এই আইনটি বলবৎ হয়। ১৯৮৩ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্য্যন্ত ১৮বছরে মোট ১২টি সংশোধনী আইনে ১৯৮০ সালের মূল আইনের বিভিন্ন বিষয়ের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে।

১০.৪ কোলকাতা পুর নিগম আইন, ১৯৮০

কোলকাতা পুর নিগম ১৯৮০ আইনের দ্বিতীয় ভাগে "সংবিধান ও সরকার" নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনটি কর্তৃপক্ষের উপর কোলকাতা পুরনিগমের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এই তিনটি কর্তৃপক্ষ হলো ঃ—

(ক) পুর নিগম (The Corporation)

(খ) নগরপাল-সহ-পরিষদ (The Mayor-in-Council)

(গ) নগর পাল (The Mayor)

এই তিন পুর কর্তৃপক্ষ নিয়ে গঠিত কোলকাতা পুর নিগম আইনবলে গঠিত নিরবচ্ছিন্ন উত্তরাধিকার সম্পন্ন একটি যৌথ সংস্থা। এই নামেই এর শীলমোহর থাকবে। এই নামেই আদালতে অভিযোগ উত্থাপন করবে বা আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত হবে। সংশ্লিষ্ট আইনের নির্দেশ অনুযায়ী এই নামেই সম্পত্তি অর্জন, ভোগ এবং হস্তান্তর করতে পারবে।

১০.৪.১ পুর নিগমের (Corporation) গঠন

নিম্নলিখিত সদস্যগণকে নিয়ে কোলকাতা পুরসভা গঠিত হবে—

(ক) ১৪১ জন নির্বাচিত পরিষদ

(খ) পৌর প্রশাসন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ অথবা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি। বিভিন্ন সময়ে রাজ্য সরকার এদের মনোনীত করেন এবং পুরসভায় এদের কোনো ভোটাধিকার থাকে না। এদের মধ্যে দুজন হবেন—কোলকাতা মহানগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (KMDA) প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারিক এবং কোলকাতা উন্নয়ন অছি পরিষদের (Board of Trustees for the Improvement of Calcutta) সভাপতি।

(গ) ১৪১ জন নির্বাচিত পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত ৭জন অল্ডারম্যান।

রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্দ্ধারিত পদ্ধতি ও দিনে এবং রাজ্যসরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তির সভাপতিত্বে পরিষদগণ একটি সভায় সমবেত হয়ে ১জন চেয়ারম্যান ৭জন অল্ডারম্যানকে নির্বাচন করেন। পারিষদ হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অযোগ্য অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত অথবা বিজয়ী কোনো ব্যক্তি অল্ডারম্যান হিসাবে নির্বাচিত হতে পারেন না। চেয়ারম্যানের মর্যাদা অনেকটা আইনসভার অধ্যক্ষের মতো। তবে কেবল করপোরেশন সভা ডাকা এবং সেই সভায় সভাপতিত্ব করার মধ্যেই তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকে।

নিম্নে ২০০১ এর জনগণনা চিত্র থেকে ১৪১টি নির্বাচন এলাকা বা ওয়ার্ডের সংখ্যা ও ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে সঠিক পরিচয়টি তুলে ধরা হলো।

Census of India 2001
West Bengal

Annexure - 11

URBAN FRAME

(As on 1.1.2000)

DISTRICT WISE LIST OF TOWNS, CENSUS TOWNS AND URBAN OUTGROWTHS

DISTRICT : (17) KOLKATA

TOWN CODE NO.	NAME OF TOWN WITH STATUS	NAME OF SUB DIVISION	NAME OF POLICE STATION	NAME OF OUTGROWTHS (OG) WITH JL NO. OF THE MOUZA
00000001	KOLKATA (MC)	Ward No.		
		0001	Cossipore	JOKA (JL NO. 31) (P)
		0002	Cossipore	P.S. THAKURPUKUR
		0003	Ultadanga, Chitpore	DISTRICT SOUTH 24 PARGANAS

DISTRICT : (17) KOLKATA

TOWN CODE NO.	NAME OF TOWN WITH STATUS	NAME OF SUB DIVISION	NAME OF POLICE STATION	NAME OF OUTGROWTHS (OG) WITH JL NO. OF THE MOUZA
00000001	KOLKATA (MC)	Ward No.		
		0004	Chitpore	
		0005	Chitpore	
		0006	Cossipore/Chitpore	
		0007	Shyampukur	
		0008	Shyampukur	
		0009	Shyampukur	
		0010	Shyampukur	
		0011	Shyampukur, Burtola	
		0012	Ultadanga	
		0013	Manicktola, Ultadanga	
		0014	Manicktola	
		0015	Burtala, Manicktola	
		0016	Burtolla	
		0017	Burtolla	
		0018	Burtolla	
		0019	Jorabangan	

STATE : (19) WEST BENGAL

		0020	Jorabagan	
		0021	Jorabagan, North Port	
		0022	Posta	
		0023	Posta	
		0024	Jorabagan	
		0025	Jorasanko	
		0026	Jorasanko, Burtolla	
		0027	Burtolla, Amherst Street	
		0028	Narkeldanga	
		0029	Narkeldanga	
		0030	Phoolbagan, Narkeldanga	
		0031	Phoolbagan	
		0032	Manicktala	
		0033	Phoolbagan, Beliaghata	
		0034	Beliaghata	
		0035	Beliaghata, Narkeldanga	
		0036	Narkeldanga	
		0037	Amherst Street	
		0038	Amherst Street	
		0039	Jorasanko	
		0040	Amherst Street, Muchipara	
		0041	Jorasanko	
		0042	Burabazar	
		0043	Jorasanko	
		0044	Bowbazar, Jorasnko	
		0045	Here Steet	
		0046	Bowbazar, Hare Street, Taltola	
		0047	Bowbazar	
		0048	Muchipara	
		0049	Muchipara	
		0050	Muchipara	

STATE : (19) WEST BENGAL

TOWN CODE NO.	NAME OF TOWN WITH STATUS	NAME OF SUB DIVISION	NAME OF POLICE STATION	NAME OF OUTGROWTHS (OG) WITH JL NO. OF THE MOUZA
00000001	KOLKATA (MC)	Ward No.		
		0051	Muchipara, Taltola	
		0052	Taltola	
		0053	Taltola	
		0054	Beniapukur, Entally	
		0055	Beniapukur, Entally	
		0056	Beniapukur	
		0057	Beniapukur, Tangra, Tiljala	
		0058	Tangra, Tiljala	
		0059	Beniapukur, Tapsia	
		0060	Beniapukur	
		0061	Beniapukur, Parkstreet	
		0062	Parkstreet, Taltola	
		0063	Pakstreet, Taltola, Shakespeare Sarani	
		0064	Beniapukur, Karaya	
		0065	Karaya, Tiljala	
		0066	Tiljala	
		0067	Tiljala, Kasba	
		0068	Gariahat	
		0069	Ballygunge	
		0070	Bhowanipore	
		0071	Bhowanipore, Kalighat	
		0072	Bhowanipore	
		0073	Bhowanipore, Kalighat	
		0074	Alipore, Watgunge	
		0075	Watgunge, Hastings, South Port	
		0076	Watgunge	
		0077	Watgunge, Ekbalpore	
		0078	Ekbalpore	
		0079	Ekbalpore, South Port, Taratala	
		0080	Garden Reach, South Port, West Port, Taratala	
		0081	Charu Market, Tollygunge	
		0082	Alipore, New Alipore	
		0083	Kalighat	
		0084	Tollygunge	
		0085	Lake Gariahat	
		0086	Lake Gariahat	
		0087	Tollygunge	
		0088	Tollygunge	
		0089	Charu Market, Regent Park	
		0090	Lake	
		0091	Kasba	
		0092	Kasba Jadavpur	
		0093	Lake Jadavpur	
		0094	Jadavpur	
		0095	Jadavpur	
		0096	Jadavpur	

STATE : (19) WEST BENGAL

TOWN CODE NO.	NAME OF TOWN WITH STATUS	NAME OF SUB DIVISION	NAME OF POLICE STATION	NAME OF OUTGROWTHS (OG) WITH JL NO. OF THE MOUZA
00000001	KOLKATA (MC)	Ward No.		
		0097	Jadavpur, Regent Park	
		0098	Jadavpur	
		0099	Jadavpur	
		0100	Jadavpur	
		0101	Jadavpur	
		0102	Jadavpur	
		0103	Purba Jadavpur	
		0104	Kasba Purba Jadavpur	
		0105	Kasba	
		0106	Kasba	
		0107	Kasba, Tiljala	
		0108	Tiljala	
		0109	Purba Jadavpur	
		0110	Jadavpur	
		0111	Regent Park	
		0112	Regent Park	
		0113	Regent Park	
		0114	Regent Park	
		0115	Thakurpukur	
		0116	Behala	
		0117	Behala	
		0118	Behala	
		0119	Behala	
		0120	Behala	
		0121	Behala	
		0122	Thakurpukur	
		0123	Thakurpukur	
		0124	Thakurpukur	
		0125	Thakurpukur	
		0126	Thakurpukur	
		0127	Thakurpukur	
		0128	Behala	
		0129	Behala	
		0130	Behala	
		0131	Behala	
		0132	Behala	
		0133	Metiabruz, Garden Reach	
		0134	Garden Reach, West Port	
		0135	Metiabruz, Garden Reach	
		0136	Metiabruz	
		0137	Metiabruz	
		0138	Metiabruz	
		0139	Metiabruz	
		0140	Metiabruz	
		0141	Metiabruz	

কোলকাতা পুরনিগমের স্থিতিকাল ৫ বছর। ভারতীয় সংবিধানের ৭৪তম সংবিধান সংশোধন আইন অনুযায়ী যে কোনো পৌরসঙ্ঘের স্থিতিকাল সম্পর্কে একটি আইন বলবৎ হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী ৫ বছর কাল সমাপ্ত হওয়ার আগেই কোনো পৌরসঙ্ঘকে ভেঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। তবে তার আগে ঐ পৌরসঙ্ঘকে আত্মপক্ষ সমর্থনের ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিতে হবে। এর পরেও কোনো পুরসভা ভেঙ্গে দিলে ভেঙ্গে দেবার তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন সম্পূর্ণ করতে হবে। ভেঙ্গে দেবার পর নূতন যে পুরসভা গঠিত হবে তা কেবল অবশিষ্ট কালের জন্যই বহাল থাকবে। তবে অবশিষ্ট কাল যদি ৬ মাসের কম হয় তাহলে আর নির্বাচনের প্রয়োজন হবে না। এক্ষেত্রে রাজ্যসরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা একজন প্রশাসক বা প্রশাসক পর্ষৎ নিয়োগ করবেন। কোলকাতা পুর নিগম আইনের ১১৭নং ধারায় ক্ষমতার অপব্যবহার, দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা, দায়িত্বহীনতা, পুরকর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রমাণিত অনাস্থা ইত্যাদি কারণে রাজ্য সরকারকে পুরসভা ভেঙ্গে দেবার অধিকার দান করা হয়েছে।

১০.৪.২ নগর পাল ও চেয়ারম্যান

নির্বাচিত পরিষদগণ প্রথম সভাতেই নিজেদের মধ্য থেকে একজন সদস্যকে নগর পাল (Mayor) হিসাবে এবং একজন সদস্যকে সভাপতি বা চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত করবেন। কোনো কারণে তাঁদের সদস্যপদ বাতিল হলে অথবা নিজেই লিখিতভাবে পদত্যাগ করলে তাদের পদ শূন্য হবে। এই ক্ষেত্রে পদ শূন্য হওয়ার এক মাসের মধ্যে পুনরায় একটি সভায় মিলিত হয়ে নির্বাচিত পরিষদগণ তাঁদের মধ্য থেকে আবার একজন নগর পাল ও সভাপতি নির্বাচিত করবেন। দায়িত্ব গ্রহণ করার ৬ মাসের মধ্যে এদের বিরুদ্ধে কোনো পদচ্যুতির অভিযোগ আনা যাবে না। সভাপতিকে পদচ্যুত করার ব্যবস্থা কোলকাতা পুর নিগম আইন ১৯৮০ তে আছে। সভার ন্যূনতম ১/৩ অংশ সদস্যের আনিত লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সংখ্যাধিক্য সদস্যের সমর্থন পেলে নগরপাল বা সভাপতি পদচ্যুত হবেন। তবে এই ধরনের কোন প্রস্তুতি ব্যর্থ হলে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সংখ্যাধিক্যের সমর্থন না পেলে আগামী ৬ মাসের মধ্যে আর এই ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করা যাবে না।

১০.৪.৩ নগরপাল-সহ-পারিষদ

নগরপাল, উপ-নগরপাল এবং অনধিক ১০ জন নির্বাচিত পারিষদ নিয়ে তৈরি হবে একটি নগরপাল-সহ-পারিষদ। নগরপাল তাঁর আপন দায়িত্ব গ্রহণ করার পরেই নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে একজন উপ-নগরপাল ও অন্যান্য দশজন সদস্যকে মনোনীত করবেন। এদের নিয়েই গঠিত হবে নগরপাল সহ-পারিষদ বা মেয়র পরিষদ। মৃত্যু, পদত্যাগ, পদচ্যুতি ইত্যাদি কোনো কারণে ঐ পদ শূন্য হলে নগর পাল পুনরায় সেই পদ পূরণ করবেন। মেয়র পরিষদের সদস্যদের প্রত্যেককে এক একটি বিশেষ দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যাতে মেয়র পরিষদ একটি মন্ত্রিসভার সদস্যদের ন্যায় যোগ্যতা সম্পন্ন ও দায়িত্বশীল হতে পারে। দপ্তর বন্টন করেন নগর পাল। সমগ্র মেয়র-পরিষদের উপর অর্পিত দায়িত্বগুলি এইরূপ—

অর্পিত দপ্তর	দায়িত্বাধিকারি
অর্থ ও সাধারণ প্রশাসন	নগরপাল
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন	উপ-নগরপাল
জল সরবরাহ	প্রথম সদস্য
ময়লা নিষ্কাষণ ও শক্ত বর্জ্য পদার্থ পরিচালন	দ্বিতীয় সদস্য

নর্দমা এবং পয়ঃপ্রণালী	তৃতীয় সদস্য
সড়ক এবং প্রকৌশল	চতুর্থ সদস্য
বস্তি এবং পরিবেশ	পঞ্চম সদস্য
স্বাস্থ্য, গণনিরাপত্তা ও চিকিৎসা	ষষ্ঠ সদস্য
বাজার ও আলো	সপ্তম সদস্য
দালান, লাইসেন্স	অষ্টম সদস্য
শিক্ষা, সংস্কৃতি ও গণ সম্পর্ক	নবম সদস্য
পার্ক, উদ্যান এবং ক্রীড়া	দশম সদস্য

১০.৪.৪ তিনটি কমিটি

এই তিন কর্তৃপক্ষ ছাড়াও কোলকাতা পুরনিগম সংস্থার সংবিধানে তিন ধরনের কমিটির কথা বলা হয়েছে। এই কমিটিগুলি হলো—পৌর হিসাব কমিটি (Municipal Accounts Committee), বরো কমিটি (Brough Committee) এবং ওয়ার্ড কমিটি (Ward Committee)। এ ছাড়াও আছে পরামর্শ কমিটি। নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে করপোরেশনের প্রথম সভাতেই হিসাব কমিটি ও বরো কমিটিগুলি গঠিত হবে।

হিসাব কমিটি ঃ একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক গোপন ভোটের ভিত্তিতে ৫ থেকে ৭ জন নির্বাচিত সদস্যকে নিয়ে পৌর হিসাব কমিটি গঠিত হবে। তবে মেয়র পরিষদের কোনো সদস্য এই কমিটিতে থাকতে পারবেন না। এ ছাড়াও হিসাব কার্য ও সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ দুজন নির্বাচিত সদস্য অথবা করপোরেশন অফিসার অথবা করপোরেশনে চাকুরিরত কর্মচারী এই কমিটিতে মনোনীত হতে পারেন। হিসাব কমিটি তাদের মধ্য থেকেই একজন সভাপতি নির্বাচন করবেন।

হিসাব কমিটির কাজ— (ক) পুর নিগমের হিসাব পরীক্ষা করা। করপোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যয়যোগ্য অর্থের সদ্ব্যবহার হয়েছে কি না তা দেখা।

(খ) করপোরেশনের হিসাব পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন পরীক্ষা করা। মঞ্জুরীকৃত অর্থ সঠিক অনুমোদন লাভ করেছে কিনা তা দেখা এবং অনুমোদিত অর্থ সঠিক পরিষেবা বা উদ্দেশ্যে খরচ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা।

(গ) প্রতি বছরে এই ধরনের দায়িত্ব সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পেশ করা।

(ঘ) বিশেষ কোনো হিসাব-নিকাশের নিরীক্ষার প্রতিবেদন বিবেচনা করা, করপোরেশনের মজুত রাখা ভাণ্ডার সংক্রান্ত হিসাব পরীক্ষা করা এবং জমিজমা ও ঘরবাড়ী সহ করপোরেশনের তালিকাভুক্ত সমস্ত সম্পত্তি পরীক্ষা করা।

(ঙ) এ ছাড়াও করপোরেশন কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা হিসাব কমিটির কাজ।

বরো কমিটি ঃ করপোরেশন তার প্রথম সভাতেই অথবা যথাসম্ভব সত্বর ঘনিষ্ঠ ওয়ার্ডগুলির নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে ১৫টি বরো কমিটি গঠন করবে। প্রত্যেকটি বরো কমিটি তাদের সদস্যদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি নির্বাচন করবেন। তিনিও মেয়র পরিষদের সদস্য হতে পারবেন না।

বরো কমিটির কাজ—মেয়র পরিষদের সাধারণ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে বরো কমিটি তার নিজস্ব ভৌগোলিক এলাকা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে—সরবরাহী নলের ব্যবস্থা, চতুস্পার্শস্থ অঙ্গনাদি সহ অট্টালিকায় (Premises) নর্দমা ও পয়ঃপ্রণালীর সংযোগের ব্যবস্থা করা, বৃষ্টি অথবা অন্য কারণে রাস্তায় অথবা জনসমাগমের স্থানে সঞ্চিত জল নিষ্কাষণ, শক্ত আবর্জনা আহরণ ও অপসারণ, সংক্রামক শক্তিশূন্য করা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অনাক্রমনের ব্যবস্থা করা, বস্তি পরিষেবা, আলোর ব্যবস্থা করা, পার্ক-নর্দমা ও পয়োনালীগুলি সংরক্ষণ করা। এ ছাড়াও করপোরেশন কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা বরো কমিটির দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

ওয়ার্ড কমিটি ঃ প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে একটি করে কমিটি থাকবে। রাজ্য সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জানিয়ে দেবেন ওয়ার্ড কমিটি কীভাবে গঠিত হবে এবং তাদের দায়িত্ব কী হবে। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত সদস্যই ওয়ার্ড কমিটির চেয়ার পারসন হবেন। ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের বলেই একটি কমিটি তৈরি হয়েছে। অনধিক ১৪ জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত এই কমিটি সংশ্লিষ্ট বরো কমিটির নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

পরামর্শ কমিটি ঃ মেয়র-পরিষদকে তার কার্য পরিচালনার কাজে সাহায্য করার জন্য মেয়র-পরিষদ প্রত্যেকটির ওয়ার্ডের জন্য অনধিক পাঁচ জন সদস্যকে নিয়ে একাধিক পরামর্শদান কমিটি তৈরি করতে পারেন। মেয়র পরিষদই তাদের কার্য পরিচালনার পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করে দেবেন।

১০.৪.৫ পুরনিগমের আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মচারী

কোলকাতা পুরনিগম কাঠামোর ক্ষেত্রে উপরোক্ত তিনটি কর্তৃপক্ষ ও কমিটিগুলি ভিন্ন সমগ্র সংগঠনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য আরো ১০ জন আধিকারিক আছেন। এই আধিকারিক পদগুলি হলো— (ক) কমিশনার, (খ) যৌথ কমিশনার, (গ) পৌর অর্থ ও হিসাব নিয়ন্ত্রক, (ঘ) মুখ্য পৌর হিসাব সংরক্ষক, (ঙ) মুখ্য পৌর প্রকৌশলী, (চ) মেয়র পরিষদ কর্তৃক স্থিরীকৃত সংখ্যক উপ-কমিশনার ও মুখ্য পৌর প্রকৌশলী, (ছ) মুখ্য পৌর স্থপতি ও নগর প্রকল্পকারক, (জ) মুখ্য পৌর স্বাস্থ্য আধিকারিক, (ঝ) মুখ্য পৌর আইন আধিকারিক এবং (ঞ) পৌর সচিব।

এদের মধ্যে প্রথম চারটি পদে নিয়োগ করেন মেয়র পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ ক্রমে রাজ্য সরকার। অন্যগুলিতে নিয়োগ করেন রাজ্য কৃত্যকের সঙ্গে পরামর্শ করে মেয়র পরিষদ। প্রথম চারটি পদে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিয়োগ রাজ্য সরকার বাতিল করতে পারেন। এ ছাড়াও পুরনিগমের বিপুল পরিমাণ দায়দায়িত্ব নির্বাহের জন্য থাকে বিশাল এক কর্মীবাহিনী। এদের A, B, C, D এই চারটি বর্গে নিয়োগ হয়। বিভিন্ন বর্গাধীন কর্মীগণের নিয়োগ বিভিন্ন। যথা—পৌর কৃত্যকের সুপারিশ অনুযায়ী 'A' বর্গের কর্মীদের নিয়োগ করবেন কমিশনার ; পৌর কৃত্যকের সুপারিশ অনুযায়ী 'B' বর্গের নিয়োগ করবেন যৌথ কমিশনার ; নির্দিষ্ট প্রবিধির নির্দেশ অনুযায়ী 'C' এবং 'D' বর্গের কর্মীদের নিয়োগ করবেন মেয়র পরিষদের অনুমোদন ক্রমে কমিশনার।

পুর নিগমের আধিকারিক ও কর্মচারীগণের কাজের আচার-আচরণ ও শর্তাবলী সংশ্লিষ্ট প্রবিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শৃংখলা ও সংশ্লিষ্ট প্রবিধি ভংগের অভিযোগে শাস্তি এমনকি সাময়িকভাবে কাজ থেকে অপসারণের ব্যবস্থা আছে।

১০.৫ পৌর কৃত্যক (Municipal Service Commission)

কোলকাতা পুর নিগমের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। একজন চেয়ারম্যান ও আরো তিনজন সদস্য নিয়ে এই কৃত্যক গঠিত হবে। মেয়র-পরিষদের সুপারিশ ক্রমে চেয়ারম্যান এবং একজন সদস্যকে মনোনীত করবে পুর

নিগম। অন্য দুজনকে মনোনয়ন দেবেন রাজ্য সরকার এবং এই দুজনের একজন হবেন রাজ্য সরকারের জনজাতি ও উপজাতি দপ্তরের আধিকারিক। প্রতিটি পুর কৃত্যক তিন বছরের জন্য গঠিত হবে।

এই প্রসঙ্গে নগর কৃত্যকের (Urban Local Sevice) সারা ভারতের প্যাটার্ন বা চেহারাটির আলোচনা করা যেতে পারে।

ভারতবর্ষের সব রাজ্যে নগর কৃত্যকের চেহারাটি এক ধরনের নয়। তামিলনাড়ু সহ দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে সমান্তরাল ভাবে পৌর আধিকারিকগণ একটি পৌরসভা থেকে অন্য পৌর সভায় অথবা উল্লম্বভাবে জাতীয় ও রাজ্য কৃত্যকের বিভিন্ন সংস্থায় স্থানান্তরিত হতে পারেন। রাজস্থান, উঃপ্রদেশ, পঞ্জাব এবং হরিয়ানাতেও এই ব্যবস্থা অনুসৃত হয় ; কেবলমাত্র নীচের তলায় কর্মীগণ সংশ্লিষ্ট পুরসভা কর্তৃক পৃথকভাবে নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রিত হন। পঃবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট পৃথক কর্মীব্যবস্থা (Personnel System) গ্রহণ করেছে যেখানে পৌর কমিটিগুলিই তাদের কর্মীদের নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ভোগ করেন। এই সব রাজ্যে সাধারণত পৌর কর্মী পরিচালনার নিয়মগুলি রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত হয়। কিন্তু তাদের নিয়োগ ও বাতিলের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব পুর কমিটিগুলির উপর ন্যস্ত থাকে। এই প্রসঙ্গে ই পৌর কৃত্যকের প্রাদেশিকীকরণ Provinicalisation of Municipal Services) সম্পর্কিত ধারণাটি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। প্রাদেশিকীকরণের অর্থ হলো—

ক) পৌরকর্মী নিয়োগে রাজ্য ক্যাডার তৈরি করা।

খ) এক পৌর সভা থেকে অন্য পৌর সভায় স্থানান্তর।

গ) রাজ্য সরকারের কোনো সংস্থা কর্তৃক তাদের নিয়োগ এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক তাদের কাজের সর্তাবলী নির্দ্ধারণ।

ঘ) পৌরসভা কর্তৃক তাদের প্রাত্যহিক কাজ কর্মের নিয়ন্ত্রণ।

ঙ) পৌর তহবিল থেকে পৌর কর্মীদের বেতন দান।

মন্ত্রক ও গণপ্রশাসন বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন সম্মেলনে এই প্রাদেশিকী করণের নীতিকে সমর্থন জানানো হয়েছে। এই ব্যবস্থাই অন্য নামে ভূমিপুত্র (Son of the soil) ব্যবস্থা বলে পরিচিত। তদনুসারে বিভিন্ন রাজ্যেও তাদের পৌর আইনেরও প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নিয়েছে।

১০.৬ কোলকাতা পুর নিগমের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

কোলকাতা পুর নিগম আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে ২৮, ২৯, ৩০, ৩১ ও ৩২ নং ধারায় এবং বিভিন্ন বিধি ও প্রবিধি অনুযায়ী কোলকাতা পুরনিগমকে বিপুল পরিমাণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। আয়তনে এবং জটিলতার দিক দিয়ে ভারতবর্ষের কোনো পুরসভাকে এত বিশাল দায়িত্ব পালন করতে হয় না। এই কাজগুলিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(ক) বাধ্যতামূলক (খ) স্বেচ্ছাধীন। বাধ্যতামূলক কাজের দীর্ঘ তালিকাটি হলো—(১) সর্বসাধারণের এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারযোগ্য জলসরবরাহ ব্যবস্থা তৈরি করা ও তার সংরক্ষণ (২) অগ্নি-নির্বাপক জলের ব্যবস্থা (৩) অগ্নি নিরোধক এবং অগ্নি নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ (৪) পুরনিগমের এলাকার নর্দমা, পয়ঃপ্রণালী, জনসাধারণের ব্যবহার্য শৌচাগার এবং সম্পর্কিত সুযোগ সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, তৈরি, পরিচালনা ও সংরক্ষণ। (৫) রাস্তায় স্তূপীকৃত আবর্জনা ও পূতিগন্ধময় ও দূষিত আবর্জনা অপসারণ (৬) অস্বাস্থ্যকর জনবসতিগুলির পুনরুদ্ধার ও পচা জিনিসপত্র ও আবর্জনা পরিষ্কার (৭) জনপথ ও জনপথের আসবাবপত্র, সেতু,

রাস্তার নীচের পয়োনালী, উড়াল ও ভূগর্ভস্থ পথ নির্মাণ, সংরক্ষণ, পরিবর্তন ও উন্নয়ন, (৮) জনপথ, জনসমাগমের জায়গাগুলিতে আলো ও জলের ব্যবস্থা করা ও সেগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, (৯) জনপথ, সেতু অথবা জনসমাগমের ভেতরে বা বাইরে কোনো বাধা বা এই জাতীয় কোনো নির্মাণ অপসারণ, (১০) রাস্তা ও বাড়ীর নামকরণ ও সংখ্যায়ন ; (১১) রাস্তার পাশে এবং অন্যত্র বৃক্ষস্থাপন ও তার যত্ন করা, (১২) রাস্তার রেখা ও পরিসর রাস্তা করা, (১৩) দালান নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করা এবং বিপজ্জনক দালান ও স্থানের অপসারণের ব্যবস্থা করা, (১৪) ভূনিম্নস্থ দালানগুলির পরিচালন নিয়ন্ত্রণ, (১৫) পরিষেবা প্রদায়ক বিভিন্ন সংস্থার অধিকারের সমন্বয় সাধন, (১৬) ভূগর্ভস্থ রেলপথ, পাইপ ও টিউব লাইন, মোটা তার তৈরির জন্য ভারার্পিত বিভিন্ন সংস্থার কাজের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন, (১৭) জনসাধারণের ব্যবহার্য পার্ক, উদ্যান ও প্রমোদস্থান গুলির খসড়া প্রকল্প তৈরি করা এবং ঐ স্থানগুলি সংরক্ষণ, (১৮) জন্ম ও মৃত্যুর পঞ্জীকরণ, (১৯) মৃত ব্যক্তি বা বস্তুর নিষ্পত্তীকরণ নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ, (২০) মারাত্মক ব্যধিক সংক্রমণ নিরোধ করা (২১) গণটিকা প্রদানসহ রোগ নিমূলকরণ, (২২) গণস্বাস্থ্য সংরক্ষণ এবং চিকিৎসার সুযোগ দানের জন্য জল, খাদ্য ও ঔষধ পরীক্ষার জন্য রাসায়ণিক অথবা জীবাণুগত বীক্ষণাগার তৈরি, (২৩) পৌর বাজার ও কসাইখানা তৈরি, পরিচালন ও সংরক্ষণ, (২৪) সমস্ত স্মৃতিস্তম্ভের পরিচালনা, (২৫) পুরনিগমের কর্তৃত্বাধীন সমস্ত সম্পত্তির পরিচালনা ও উন্নয়ন, (২৬) পুর নিগমের বিভিন্ন কাজের উপর সতর্ক প্রহরা, (২৭) পুর নিগমের প্রশাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন দলিল ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ, (২৮) পুর নিগম আইন বা অন্যান্য আইন দ্বারা অর্পিত কার্যাবলী।

১০.৭ স্বেচ্ছাধীন কার্যাবলী

৩০ নং ধারায় উল্লিখিত স্বেচ্ছাধীন কাজগুলি হলো—

(১) সাংস্কৃতিক ও শারীরিক শিক্ষা সহ সমস্ত প্রকার শিক্ষার সম্প্রসারণ, ক্রীড়ার সম্প্রসারণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও রক্ষনাবেক্ষণ।

(২) পাঠাগার, যাদুঘর, চিত্রপ্রদর্শনী গ্যালারি, উদ্ভিদ ও প্রাণীজ সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(৩) বিভিন্ন অট্টালিকা, দালান ও জমি জরিপ।

(৪) প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের নাগরিক সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা।

(৫) বিভিন্ন প্রমোদভবন, রঙ্গালয়, চলচ্চিত্র ও সংগীত ভবন, নির্মাণ ও পরিচালনা।

(৬) মেলা ও প্রদর্শনীভবন গঠন ও পরিচালনা।

(৭) পুরনিগমের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ।

(৮) বিশ্রামাগার, দারিদ্র মানুষের বাসস্থান, চিকিৎসালয়, শিশুভবন, মূক বধির অথবা বিকৃতঙ্গদের থাকার জায়গা তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(৯) গবাদি পশুর খোঁয়ার তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(১০) সরকারি আধিকারিক ও কর্মচারীদের জন্য বাসভবন নির্মাণ ও খরিদ করা এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ।

(১১) সরকারি আধিকারিক ও কর্মচারীদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থা ও কর্মসূচি গ্রহণ।

(১২) হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, মাতৃসদন, শিশুকল্যাণ কেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও পরিবার কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভবন নির্মাণ ও পরিচালনা।

(১৩) গণস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য সন্তরণ শিক্ষার পুকুর, ধৌতাগার, স্নানাগার নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(১৪) পণ্যাগার ও গুদামঘর তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(১৫) গ্যারেজ, গাড়ী রাখার আস্তানা, চালা এবং গবাদি পশুর শবাধার রাখার মতো উপযুক্ত জায়গা তৈরি ও সংরক্ষণ।

(১৬) অপরিশুদ্ধ জল সরবরাহ।

(১৭) ধোঁয়ার দূষণ রোধ করা।

(১৮) কোনো এলাকা বা কোনো বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জন্য আবাসস্থল তৈরি।

(১৯) জনস্বাস্থ্য, গণনিরাপত্তা ও শহুরে উন্নয়ন ও ন্যায়বিচার সম্পর্কিত অন্যান্য যে কোনো কাজ বা ব্যবস্থা।

কোলকাতা মহানগরীর ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা ও সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য পুরনিগমকে বিশাল এই দায়িত্ব বহন করতে হয়। এই সুবিশাল দায়িত্ব নির্বাহ করাই নির্বাচিত সদস্যদের সমগ্র কক্ষের বা করপোরেশনের কাজ।

১০.৭.১ মেয়র পরিষদের কাজ

পূর্বেই বলা হয়েছে এই বিশাল প্রশাসনিক দায়িত্ব বহন করে মেয়র-পরিষদ—অনেকটা রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের মন্ত্রিসভার ন্যায়। কর্পোরেশনের সমগ্র কক্ষটি অনেকটা রাজ্য আইনসভা বা সংসদের মতো আলোচনা কক্ষ হিসাবে কাজ করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু সেই সব সিদ্ধান্তকে রূপ দান করে মেয়র-পরিষদ। অবশ্য করপোরেশনের নামেই মেয়র পরিষদের প্রশাসনিক নির্দেশ প্রকাশিত হয়। আর সেগুলিকে বাস্তবায়িত করে করপোরেশনে কর্মরত বিভিন্ন আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ।

১০.৭.২ মেয়র পরিষদ ব্যবস্থার উদ্ভব

নগর পালগণের সর্বভারতীয় সম্মেলন এবং কেন্দ্রিয় স্বায়ত্তশাসন পরিষদের দীর্ঘ দিনের একটি চাহিদা ছিল নগর-প্রশাসনের কাঠামোগত সংস্কার সাধন। সেই কথা মনে রেখেই একটি আদর্শ পৌর প্রশাসন আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ভারতীয় গণ-প্রশাসন প্রতিষ্ঠান (ISPA) একগুচ্ছ শিক্ষামূলক সম্মেলন করে। কিন্তু সেই সম্মেলনগুলির আলোচনা থেকে কোনো বিশেষ বিকল্পের সুপারিশ করা যায়নি। এরপর ১৯৮০ সালে কেন্দ্রীয় পূর্ত্ত এবং আবাসন দপ্তর থেকে কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থার বৈশিষ্ট্য, ক্ষমতা এবং আইন সম্পর্কে কতগুলি বিশেষ সমীক্ষা করা হয়। এই সমীক্ষক গোষ্ঠীই মেয়র-পরিষদের সুপারিশ করে। মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকারি শাসন ব্যবস্থার ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিই ছিল মেয়র-পরিষদ ব্যবস্থার সমর্থনের যুক্তি। এর পর নগর পালদের সর্বভারতীয় সম্মেলনেও প্রচলিত ব্যবস্থার চেয়ে অধিকতর ফলপ্রদায়ক এবং দায়িত্বশীল হিসাবে মেয়র-পরিষদ ব্যবস্থাকে সমর্থন দান করা হয়। কিন্তু অনেক সরকারি প্রস্তাব ও সুপারিশ সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যবস্থা গ্রহণে কোনো রাজ্যই এগিয়ে আসেনি। পঃবঙ্গ সরকারই প্রথম ১৯৮০ সালের মে মাসে প্রনোদিত একটি আইনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থাটি গ্রহণ করে। প্রায় একই সময়ে ১৯৮০ সালের জুন মাসে রাজ্যপালের স্বাক্ষর পেয়ে সিমলা পুর নিগমের সংশোধিত আইন প্রণীত হলেও

তা মেয়র-পরিষদ ব্যবস্থা অনুসরণ করেনি। মেয়র, দুজন উপ-মেয়র, দুজন নির্বাচিত পরিষদ এবং কমিশনার নিয়ে গঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ অর্থ ও চুক্তি কমিটির (Finance and Contract Committee) ব্যবস্থা থাকলেও তা কোনোক্রমেই মেয়র-পরিষদের সাংসদীয় উৎকর্ষতার যুক্তিকে অনুসরণ করেনি।

১০.৭.৩ মেয়র

কোলকাতা পুর নিগম, ১৯৮০ আইন অনুযায়ী মেয়র-পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন মেয়র এবং মেয়র-পরিষদের সভায় আলোচ্য বিষয়গুলি স্থির করেন মেয়র এবং তাঁরই নির্দেশে সেই বিষয়গুলি অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। মেয়র পরিষদের সমর্থন সাপেক্ষে মেয়র পুর নিগম আইন মোতাবেক নিজে থেকেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এইভাবে অবিকল মন্ত্রিসভার ছকে এবং বৈশিষ্টে মেয়র-পরিষদকে সাজানো হয়েছে। আবার অন্য দিকে মেয়রের ক্ষমতা মেয়র-পরিষদ এমন কি কর্পোরেশনের নির্বাচিত সদস্যদের সমগ্র কক্ষের ক্ষমতাকেও ছাপিয়ে যেতে পারে। নির্দিষ্ট আইনের ৩৭ নং আইনের ধারায় জরুরি অবস্থাকালীন মেয়রের ক্ষমতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে তিনি জনস্বার্থে বা গণনিরাপত্তার জন্য অথবা নিগমের বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির ক্ষতি থেকে অব্যাহতি দানের জন্য জরুরি অবস্থাকালীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারেন। এইভাবে সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদটি মেয়রকেও রাষ্ট্রপতির মতো অধ্যাদেশ জারি করার মতো ক্ষমতা প্রদান করেছে। শুধু তাই নয় কোন্ ব্যবস্থাটি জরুরি বা কোন্‌টি নয় তাও বিচার করার ক্ষমতা মেয়রকেই দান করা হয়েছে। কারণ সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদটি শুরু হয়েছে প্রায় রাষ্ট্রপতির জরুরি অবস্থাকালীন ক্ষমতার ঘোষণার ভাষাতেই—"যদি মেয়র সন্তুষ্ট হন যে জরুরি অবস্থা দেখা দিয়েছে".....("If the Mayor is satisfied that an emergency has arisen...") তবে মেয়র সঙ্গে সঙ্গে তা কর্পোরেশন বা মেয়র পরিষদের কাছে জানাতে বাধ্য থাকবেন। এই ভাবে মেয়রের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহারকে শৃঙ্খলিত করার চেষ্টা থাকলেও রাজনৈতিক দলীয় সংখ্যা গরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে মেয়র এই ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারেন। ৩১নং আইনের ধারায় এই সব নির্দেশ বা অন্যান্য তথ্য, হিসাব, পরিকল্পনা বা পুর নিগম-প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোনো ব্যবস্থা মেয়র কর্পোরেশনকে জানাবেন। অবশ্য এর পেছনে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। মেয়র স্ব-ইচ্ছায় জনস্বার্থে বা কর্পোরেশনের স্বার্থে তা কর্পোরেশনকে নাও জানাতে পারেন। এইভাবে মেয়র-পরিষদ ব্যবস্থায় সংসদীয় দায়িত্বশীলতা প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস নিলেও পুরনিগমের নগর পালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ দান এই প্রয়াসকে অর্থহীন করে তুলতে পারে।

১০.৭.৪ নগরপাল ও চেয়ারম্যান

নূতন আইনে প্রধান কার্যনির্বাহী হিসাবে মেয়র এবং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। কর্পোরেশনের প্রথম সভাতেই নিজেদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান বা সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু আইনসভার অধ্যক্ষ বা স্পীকারের মতো বিস্তৃত ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হয়নি। তিনি সভা আহবান করেন এবং সভাপতিত্ব করেন। কর্পোরেশনের নির্বাচিত সদস্যদের সমগ্র কক্ষটি আইনসভার মতো আলোচনা কক্ষ হিসাবে কাজ করলেও অধ্যক্ষের সাড়ম্বর সাংবিধানিক মর্যাদার সংস্কার ও প্রথাগুলি এক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়নি।

১০.৮ কমিশনার

কোলকাতা পুর নিগম আইনে কমিশনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ। নূতন আইনে তাঁর পদমর্যাদা হলো প্রধান প্রশাসক। তিনি একদিকে যেমন নির্দিষ্ট আইনের বলে কর্পোরেশনের কর্তৃক ভারার্পিত সমস্ত দায়িত্ব ও

কার্যাবলি পালন করবেন তেমনি কর্পোরেশনের সমস্ত আধিকারিক ও কর্মীদের আপন আপন দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবেন এবং সমস্ত আইন ও কর্মপ্রক্রিয়া তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করবেন। কর্পোরেশনের সমস্ত আধিকারিক ও কর্মীগণ কমিশনারের অধঃস্তন পদমর্যাদা সম্পন্ন। তিনিই প্রকৃত ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের সমস্ত রেকর্ডও অন্যান্য মূল্যবান কাগজপত্র, দলিল ও প্রামাণ্য তথ্যাদির সংরক্ষক। প্রতি আর্থিক বছরের প্রথম দিনে তিনি পূর্ববর্তী বছরে কোলকাতা পুরনিগম পরিচালনার সমস্ত প্রতিবেদন তৈরি করবেন। করপোরেশন ঐ প্রতিবেদনটি বিবেচনা করে রাজ্য সরকারকে প্রেরণ করবেন। স্মরণ থাকতে পারে মেয়র পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী কমিশনারকে নিয়োগ করবেন রাজ্য সরকার অথবা রাজ্য সরকারের নির্দেশে রাজ্য কৃত্যকের সঙ্গে পরামর্শ করে কমিশনারকে নিয়োগ করবেন মেয়র পরিষদ অথবা রাজ্য সরকারের অনুমোদন ক্রমে কর্পোরেশনে কর্মরত আধিকারিকদের মধ্যে থেকে কমিশনারকে নিয়োগ করবেন মেয়র-পরিষদ। রাজ্য সরকার যে কোনো সময় প্রথম পদ্ধতিতে নিযুক্ত কমিশনারকে পদচ্যুত করতে পারেন। আবার মেয়র-পরিষদ চাইলেও রাজ্য সরকার কমিশনারকে পদচ্যুত করতে বাধ্য থাকেন।

কোলকাতা পুরনিগম আইন, ১৯৮০ আইন অনুযায়ী নগরপাল, কর্পোরেশনের সভাপতি, মেয়রের পরিষদের সমস্ত সদস্য এবং কর্পোরেশনের বিভিন্ন কমিটির সদস্যগণ কিছু পারিশ্রমিক ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন। তাছাড়া তাদের বিভিন্ন ব্যয় নিয়ন্ত্রক কিছু ভাতা এবং কমিটির কাজে যোগদানের জন্য যাতায়াতের খরচ বাবদ কিছু অর্থ দেওয়ার কথা সংশ্লিষ্ট পুর আইনে আছে। দিল্লি কর্পোরেশনের কমিশনারকে নিয়োগ করেন কেন্দ্রীয় সরকার। সিমলা করপোরেশনের কমিশনার তিন বছরের জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। তবে পুনরায় তিন বছরের জন্য কমিশনারের কার্যকাল সম্প্রসারিত হতে পারে। তিনি রাজ্য সরকারের প্রথম শ্রেণীর আধিকারিকদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত হন এবং সিমলা করপোরেশনের তহবিল থেকেই তাঁর বেতন ও ভাতা দেওয়া হয়।

১০.৯ মেয়র বনাম কমিশনার

লক্ষণীয় এই যে নির্বাচনের ভিত্তিতে নিয়োজিত একজন মেয়র এবং উচ্চশিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন, সুদক্ষ এবং অভিজ্ঞ একজন কমিশনারের মর্যাদাগত একটা বিরোধের অবকাশ আছেই। আইন ঠিকমত অনুসৃত হচ্ছে কিনা এটা দেখা যেমন কমিশনারের কাজ, তেমনি তিনি বে-আইনি কাজও প্রতিরোধ করবেন। কখনও কখনও নির্বাচিত সদস্য সহ মেয়রের কাজ বা নির্দেশও কমিশনারের কাছে আইনানুগ মনে নাও হতে পারে। তখনই বিরোধ লাগে এবং বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে যেখানে রাজ্যে ও কর্পোরেশনে দুই বিবদমান রাজনৈতিক দল বা কোয়ালিশন সরকার প্রশাসন চালায়। এই অসুবিধা প্রকট সমস্যা দৃষ্টি করতে পারে মেয়র পরিষদ পরিচালিত পুরনিগম প্রশাসনে। তাই ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যই মেয়র-পরিষদ ব্যবস্থাটি গ্রহণ না করেই সুস্পষ্টভাবে মেয়রকে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ও কমিশনারকে চূড়ান্ত প্রশাসনিক কর্তৃত্ব দান করেছে।

১০.১০ পৌর তহবিল

কোলকাতা পুর নিগম আইন ১৯৮০ র আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো বিপুল পরিমাণ ব্যয় নির্বাহে আর্থিক উৎস। সংশ্লিষ্ট আইনের তৃতীয় অধ্যায়ে ১১৯ নং পরিচ্ছেদে একটি পৌর তহবিলের গঠনের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে পৌর তহবিলের অর্থ স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া বা রাজ্য সরকারের অনুমোদিত যে কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে নিম্নলিখিত ৫টি নামে আমানত করা হবে। যথা ঃ—

ক) জল সরবরাহ, দূষিত জল, আবর্জনা ও নর্দমা আমানত

খ) সড়ক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ আমানত

গ) বস্তি পরিষেবা আমানত

ঘ) বাণিজ্যিক প্রকল্প আমানত

ঙ) সাধারণ আমানত।

করপোরেশন প্রতি বছর ২২ শে মার্চের পূর্বে আগামী আর্থিক বছরে কর্পোরেশনের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব পেশ করবে। এই হিসাবে বা বাজেটে উল্লিখিত বিষয়গুলির ব্যয় নির্বাহের জন্য পৌর তহবিল থেকে টাকা তোলা যাবে। এইভাবে বাজেট অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্যও মেয়র-পরিষদই চূড়ান্তভাবে পৌর তহবিল থেকে টাকা তোলার সুপারিশ করলে তবেই ব্যবস্থাটি কার্যকরী হবে। অবশ্য বাজেট বহির্ভূত কোন্ কোন্ খাতে পৌর তহবিল থেকে টাকা তোলা যাবে তাও সুস্পষ্টভাবে ১২৭ নং আইনের ধারায় বলা হয়েছে। আবার মেয়র-পরিষদের সুপারিশক্রমে কর্পোরেশন বাজেটে উল্লিখিত আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবের পরিবর্তন করতে পারে।

১০.১০.১ আয়ের উৎস

কোলকাতা পৌর নিগমের সমস্ত প্রকার আয়ই পৌর তহবিলে জমা হবে। পৌর তহবিলে আয়ের উৎসগুলি হলো—(১) রাজ্য সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে অনুমোদিত ঋণ ও অনুদান, (২) আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থাগুলি থেকে অনুমোদিত অর্থ, (৩) নিগম নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে কর আদায় করতে পারে—

ক) জমি ও দালানের উপর কর

খ) বৃত্তি বা ব্যবসার উপর কর

গ) বিজ্ঞাপনের উপর কর

ঘ) রাজ্য সরকার পুর নিগম বা অন্যান্য পৌর সভার গাড়ী ও যানবাহন ছাড়া অন্যান্য গাড়ী ও যানবাহনের উপর কর।

ঙ) এ ছাড়া রাজ্য সরকারের অনুমোদিত হারে কর্পোরেশন তার রাস্তা দিয়ে চলাচল করার বা বাজারে মাল বেচার জন্য উপশুল্ক (Toll) বা টোল, জমি হস্তান্তরের উপর অতিরিক্ত কর, বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উপর বিশেষ সংরক্ষণ শুল্ক, বিদ্যাসাগর সেতু কর ইত্যাদি।

১০.১১ পুর নিগম আইনের সমস্যা

কিন্তু কোলকাতা একটি মহানগরী। ভারতবর্ষে অন্য যে কোনো বড় শহরের যে এর সমস্যার ব্যাপকতা, গভীরতা ও জটিলতা অনেক বেশি। কোলকাতা পঃবঙ্গের একটি শহর হলেও কেবল অন্ন সংস্থানের জন্য ভারতের যে কোনো অঞ্চল, সম্প্রদায়, জাতপাত এবং ধর্মের লোক এখানে বাস করে। বিপুল এই জনসংখ্যার ক্রমবর্দ্ধমান সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য কোলকাতা পুর নিগমের আয়ের উৎস সীমিত সন্দেহ নেই। তাছাড়া বিপুল পরিমাণ দায়িত্ব নির্বাহের জন্য একেবারে নীচের তলায় যে পরিমাণ কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে তাদের কাজের সমন্বয়ের জন্য আনুপাতিক সেই পরিমাণে উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা আধিকারিক নেই। ফলে কর্মপ্রক্রিয়ার সমন্বয়ের অভাব ঘটে।

পুর নিগমের কাঠামো গত অবস্থানেও কতগুলো প্রশ্ন অনিবার্যভাবেই এসে পড়েছে। পূর্বে কোলকাতা মহানগরী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (KMDA) উপরেই উন্নয়নের সামগ্রীক দায়িত্ব অর্পিত ছিল। শুধু অর্থ যোগান দেওয়া নয়, উন্নয়নের নির্দেশ দানের দায়িত্বও ছিল এই কর্তৃপক্ষের। কিন্তু ১৯৮০ সালের পুর নিগম আইন প্রণীত হবার পর পুর নিগমই উন্নয়নের আইনানুগ সমগ্র দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এবং সি এম ডি-এর সঙ্গে সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটেছে। আগামী দিনে কোলকাতা পুর নিগমের সাফল্য অনেক খানি নির্ভর করবে কে এম ডি-এর সঙ্গে তার সম্পর্কের উপর। দ্বিতীয়ত মেয়র-পরিষদের কাঠামো। পূর্বেই বলা হয়েছে মেয়র পরিষদের ১০ জন সদস্যকে ১০টি দপ্তরের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। প্রতিটি নির্বাচনের পরেই হয়ত এই দপ্তর বিভাজন ও বন্টনে ঈষৎ পরিবর্তন হয়। কিন্তু প্রশাসনিক তদারকি ও নিয়ন্ত্রণকে অত্যন্ত কার্যকর করার জন্যই যে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সুস্পষ্ট ভাবেই উপলব্ধি করা যায়। এই অবস্থায় মেয়র পরিষদের সদস্যের সঙ্গে দপ্তর প্রধানের সম্পর্ক কেমন তার উপরেও পুর নিগমের পরিষেবাগত সাফল্য নির্ভর করে। বর্তমানে ১৪ জন নিয়ন্ত্রণ আধিকারিক আছেন যারা প্রত্যক্ষ ভাবে প্রধান প্রশাসক কমিশনারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেন। ফলে এখন ঐ নিয়ন্ত্রক আধিকারিকগণকে একই সঙ্গে দুজনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলতে হয়। প্রথমত—কমিশনারের সঙ্গে, দ্বিতীয়ত—মেয়র পরিষদে ঐ দপ্তরের ভার প্রাপ্ত সদস্যের সঙ্গে । আগামী দিনে সচিবালয় জাতীয় কিছু সুস্থ অলিখিত রীতি নীতির উদ্ভব হলেই এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপর্যয়কে এড়ানো যেতে পারে।

তৃতীয়ত—নূতন পুর আইনের একটি দুর্বলতা হলো বিরোধী দল বা গোষ্ঠীর শক্তিহীনতা। বিভিন্ন স্তরে এই অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যে পুর নিগম পরিচালনায় বিরোধী দলের কোনো ভূমিকাই নেই। স্ব স্ব নির্বাচন এলাকায় যে কমিটিগুলি গড়ে ওঠে সেখানে তাদের চিন্তা ভাবনার সুযোগ থাকলেও সিদ্ধান্ত নির্ধারক স্থানে এবং মেয়র পরিষদের ভাবপ্রাপ্ত সদস্যের সঙ্গে বৈঠকে তাদের বক্তব্যগুলি আরো দৃঢ় ভাবে বলার সুযোগ হয় না। আবার সংসদীয় ধাঁচে কোনো সরকারি হিসাব কমিটি (PAC) এবং আনুমানিক ব্যয় কমিটি (EC) না থাকায় করপোরেশন আয় ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়েও তারা হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তাই বলা যায় মেয়র-পরিষদ বিচ্ছিন্ন ভাবে সর্বরোগহর কোনো ঔষধ নয়। নির্বাচিত সদস্যদের শুভেচ্ছা এবং কিছু সুস্থ রীতি নীতির সমন্বয়েই কোলকাতা পুর নিগম আইন, ১৯৮০ প্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করতে পারবে।

১০.১২ রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ

সবশেষে ৭নং অধ্যায়ে ১১৩ থেকে ১১৮ নং ধারা পর্যন্ত আইনগুলির মাধ্যমে রাজ্য সরকার কর্তৃক কোলকাতা পুর নিগমের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ব্যবস্থাগুলিও স্বায়ত্ত শাসনের মৌলিক ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তার আলোচনা প্রয়োজন।

রাজ্য সরকার পুর নিগমের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পুরসভা সম্পর্কিত যে কোনো দলিল, পরিকল্পনা আয়ব্যয়ের হিসাব, পরিসংখ্যাণ অথবা যে কোনো প্রতিবেদন চেয়ে পাঠাতে পারেন অথবা নিগমের বা তার যে কোনো দপ্তরের কাজ কর্ম বা সম্পত্তি পরিদর্শন বা পরীক্ষা করার জন্য আপন আধিকারিক নিয়োগ করতে পারেন। উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা দুটির ভিত্তিতে রাজ্য সরকার পুরনিগম কর্তৃপক্ষের নেওয়া যে কোনো কাজকে বা সিদ্ধান্তকে বেআইনি ঘোষণা করতে পারেন এবং তদনুয়ায়ী রাজ্য সরকার আপন খুশী মত ঐ কাজ বা সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। তাছাড়া ভারতীয় সংবিধানের ৭৪ তম সংবিধান সংশোধন আইন অনুযায়ী যে কোনো পৌরসঙ্ঘের স্থিতিকাল সম্পর্কে একটি আইন বলবৎ করা হয়েছে। এই আইন আনুযায়ী ৫ বছর কাল সমাপ্ত হওয়ার আগেই কোনো পৌরসভাকে ভেঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। তবে তার আগে ঐ পৌরসঙ্ঘকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়। এরপরেও

কোনো পুরসভা ভেঙ্গে দিলে ভেঙ্গে দেবার তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন সম্পূর্ণ করতে হবে। ভেঙ্গে দেবার পর নূতন যে পুরসভা গঠিত হবে তা কেবল অবশিষ্ট কালের জন্যই বহাল থাকবে। তবে অবশিষ্ট কাল যদি ৬ মাসের কম হয় তাহলে আর নির্বাচনের প্রয়োজন হবে না। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপণ দ্বারা একজন প্রশাসক বা প্রশাসক পর্ষদ নিয়োগ করবেন। কোলকাতা পুর নিগম আইনের ১১৭ নং ধারায় ক্ষমতার অপব্যবহার দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা, দায়িত্বশীলতা, পুরকর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রমাণিত অনাস্থা ইত্যাদি কারণে রাজ্য সরকারকে পুরসভা ভেঙ্গে দেবার অধিকার দান করা হয়েছে। এই ধরনের সম্ভাবনায় অনেক সমালোচক আতঙ্কিত এবং রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গণতন্ত্রের বিপর্যয়ের হাতিয়ার বলে মনে করেন। কিন্তু কোলকাতা পুরনিগমের ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ সালের নির্বাচনের ফলাফল ও তার পরবর্তী অভিজ্ঞতা এই আশংকাকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে। যথাক্রমে মাত্র ১টি আসন ও ৩টি আসনে এগিয়ে থেকেও বামফ্রন্ট যেভাবে তাদের সংহতি ও সাফল্য প্রদর্শন করেছে—তাতে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে কোনো আশংকার কারণ থাকে না। তবে রাজনৈতিক দলগুলির বি-সম জোট তৈরি করেও যেভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার আত্মপ্রয়াস লক্ষ্য করা যায় তাতে দল-বিদীর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ দূষিত হতেই পারে এবং পুরনিগমের স্থিতিকালও বিপন্ন হতে পারে।

১০.১৩ পৌরসভা ঃ কাঠামো ও কার্যাবলী

পশ্চিমবঙ্গে ৬টি পৌর নিগম, ৩টি প্রজ্ঞাপিত এলাকা এবং ১টি সেনা ছাউনী বোর্ড ব্যতীত সমগ্র শহর প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পিত আছে ১১২টি পৌর সভার উপর। পূর্বেই বলা হয়েছে ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় পৌরসভা আইন দীর্ঘদিন পর্যন্ত পৌর প্রশাসনের নীতিস্তম্ভ হিসাবে কাজ করেছে। ১৯৯৩ সালে এই আইনটি আমূল পরিবর্তন করে পঃবঙ্গ বিধানসভায় ১৯৯৩, পঃবঙ্গ পৌর আইন প্রণোদিত হয়। এই আইনটিই বর্তমানে পঃবঙ্গে পৌর প্রশাসনের নির্দেশক।

বর্তমান আইনের ৩নং ধারাতেই তিনটি শর্তসাপেক্ষে পঃবঙ্গের রাজ্যপালের উপর পৌর এলাকা গঠন ও উহার ঘোষণা প্রদানের ক্ষমতা স্বীকৃত হয়েছে। এই শর্ত তিনটি হলো (ক) উক্ত এলাকায় ২০,০০০ এর বেশি জনসংখ্যা থাকতে হবে। (খ) প্রতি বর্গ কিলো মিটারে ৭৫০ এর বেশি ঘন জনবসতি থাকতে হবে। (গ) মোট প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি লোক কৃষিকার্য ছাড়া অন্য পেশায় নিযুক্ত থাকবেন। এছাড়াও শর্ত সংযোজিত হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট এলাকাটি পৌর স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উপযোগী কর ও অন্যান্য আয়ের উৎস দানের ক্ষমতা বিশিষ্ট হবে। পৌর বোর্ড প্রবর্তনের জন্য প্রত্যেক রাজ্য জনসংখ্যাকেই একমাত্র ভিত্তি হিসাবে ধরে নিলেও রাজ্য বিশেষে এই জনসংখ্যার পরিমাণ ভিন্ন। বিহার এবং উড়িষ্যাতে ন্যূনতম এই সংখ্যাটি মাত্র ৫,০০০ ও অন্যদিকে কর্ণাটকে এই সংখ্যাটি ৫০,০০০। কিন্তু পৌর সভা গঠন করলেই তো হবে না। তার পর্বত প্রমাণ সমস্যা সমাধানের জন্য ঐ এলাকায় বসবাসকারী জনগণের ঐ বিশাল ব্যয় নির্বাহের ইচ্ছা ও ক্ষমতাও থাকা দরকার। এবং জনগণের মাথা পিছু আয় এবং এলাকাটির অন্যান্য সম্পদ তখনই দেখা হয় যখন বসবাসকারী জনসংখ্যা থাকে কম এবং নির্দিষ্ট এলাকার আয়তনটিও থাকে ক্ষুদ্র।

১৯৯৩ পঃবঙ্গ পৌর আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকার সবশেষ আদমসুমারীতে প্রকাশিত জনসংখ্যা অনুযায়ী পৌরসভাগুলিকে ৫টি শ্রেণিতে বিন্যাস করতে পারেন।

শ্রেণি ক ঃ ২০,০০০০ এর বেশি জনসংখ্যা

শ্রেণি খ ঃ ১,৫০,০০০ এর বেশি কিন্তু অনধিক
২০,০০০০ জনসংখ্যা সম্বলিত পৌরসভা।

শ্রেণি গ ঃ ৭৫,০০০ এর বেশি কিন্তু অনধিক

১৫,০০০০ জনসংখ্যা সম্বলিত পৌরসভা

শ্রেণি ঘ ঃ ২৫,০০০ এর বেশি কিন্তু অনধিক

৭৫,০০০ জনসংখ্যা সম্বলিত পৌর সভা

শ্রেণি ঙ ঃ অনধিক ২৫,০০০ জনসংখ্যা সম্বলিত পৌরসভা।

রাজ্য সরকার এলাকার জনসংখ্যা, বসতবাড়ীর ধরন, ভৌগোলিক অবস্থান ও আর্থিক দিক বিবেচনা ক্রমে প্রত্যেক শ্রেণি পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যাও নিম্নোক্ত অনুপাতে নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন।

ক শ্রেণির পৌর সভার জন্য ঃ ৩৫টি

খ শ্রেণির পৌর সভার জন্য ঃ ৩০টি

গ শ্রেণির পৌর সভার জন্য ঃ ২৫টি

ঘ শ্রেণির পৌর সভার জন্য ঃ ২০টি

ঙ শ্রেণির পৌর সভার জন্য ঃ ১৫টি

১৯৯৭ সালের এক সংশোধনী আইনের দ্বারা কোনো এলাকাকে পৌর এলাকার আওতা থেকে বাদ দেওয়ার কিংবা পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারকে। রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই কাজ করবেন।

শুধু তাই নয় কোনো পৌর এলাকা বা কোনো শ্রেণির পৌর এলাকায় এই আইন প্রযোজ্য না হলে তার লিখিত কারণ দেখিয়ে রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা সেই এলাকাকে অব্যাহতি দিতে পারেন। প্রত্যেকটি পৌরসভা আইন দ্বারা গঠিত সংস্থা। তাঁর একটি চিরস্থায়ী সত্ত্বা এবং সাধারণ শীলমোহর থাকবে। ঐ পৌরসভার নামেই সে মামলা করবে বা অভিযুক্ত হবে।

১৯৯৩ পঃবঙ্গ পৌর আইনের তৃতীয় অধ্যায়ে ১২ নং ধারায় তিনটি পৌর কর্তৃপক্ষের উল্লেখ করা হয়েছে। এই তিনটি কর্তৃপক্ষ হলো—

(ক) পৌরসভা

(খ) চেয়ারম্যান সহ-পর্ষদ

(গ) চেয়ারম্যান।

১০.১৩.১ পৌরসভার গঠন

সংশ্লিষ্ট পৌর এলাকায় যতগুলি নির্বাচন এলাকা বা ওয়ার্ড থাকবে তার প্রত্যেকটি থেকে একজন সদস্য নির্বাচিত হবেন। তাঁকে পারিষদ বা কাউন্সিল বলা হবে। এ ছাড়া পৌর প্রশাসন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে কখনও কখনও রাজ্য সরকার মনোনীত করতে পারেন। পৌর সভার কোনো সভায় এরূপ ব্যক্তির ভোট প্রদানের কোনো অধিকার থাকে না। ১৯৯২ সালের ৭৪ তম সংবিধান সংশোধন আইন অনুযায়ী পুরসভার সমগ্র বা আংশিক এলাকার অন্তর্গত সংসদ এবং বিধায়কগণ এবং পুর কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন কমিটির সভাপতিগণ

(Chairpersons) ঐ পুরসভার সদস্য হবেন। পারিষদবর্গ বা কাউন্সিলরগণ ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। ৫ বছর পর পরবর্তী পারিষদ সভা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী পুরবোর্ডই পৌরসভার কাজ পরিচালনা করবে।

ভারতীয় সংবিধানের ৭৪ তম সংশোধন আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোনো একটি পৌরসভার স্থিতিকাল সম্পর্কিত একটি আইন বলবৎ হয়েছে। এই আইনে পৌর অধিগ্রহণ (Superscssion) সম্পর্কিত ব্যবস্থাকে অবলুপ্ত করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী ৫ বছর কাল সমাপ্ত হওয়ার আগেই কোনো পৌরসভাকে ভেঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। তবে তার আগে ঐ পুরসভাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের ন্যায়সম্মত অধিকার দিতে হবে। এর পরেও কোনো পুরসভা ভেঙ্গে দিলে ভেঙ্গে দেবার তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্যে পুনর্নির্বাচন সম্পূর্ণ করতে হবে। ভেঙ্গে দেবার পর নূতন যে পুরসভা গঠিত হবে তা কেবল অবশিষ্ট কালের জন্যই বহাল থাকবে। তবে অবশিষ্ট কাল যদি ৬ মাসের কম হয় তাহলে আর নির্বাচনের প্রয়োজন হবে না। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপণ দ্বারা একজন প্রশাসক বা প্রশাসক পর্ষৎ নিয়োগ করবেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, নিতান্ত ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা নয়, গুরুতর অনিয়ম বা চরম অবহেলার ক্ষেত্রেই আইনের ৪৩১ নং ধারা অনুযায়ী রাজ্য সরকারকে পুরসভা ভেঙ্গে দেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে সম্বোধন করে যে কোনো কাউন্সিলর পদত্যাগ করতে পারেন। আইন নির্দিষ্ট কারণে কোনো কাউন্সিলরের নির্বাচন বাতিল বলে ঘোষিত হলে অথবা রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট আইন মোতাবেক কোনো ওয়ার্ডকে সংশ্লিষ্ট পুরসভার বহির্ভূত ঘোষণা করলেও কাউন্সিলর পদ শূন্য হতে পারে। কোন স্বীকৃত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত হয়ে পৌরসভার কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচিত হলে এবং পরবর্তীকালে উক্ত রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ প্রত্যাহার করলে বা পদত্যাগ করলে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর পদ থেকে অপসারিত হবেন।

১০.১৩.২ আসন সংরক্ষণ

নূতন পুর আইন অনুযায়ী কোনো পুর এলাকাভুক্ত সমগ্র জনসংখ্যার যে অনুপাতে জনজাতি ও উপজাতিয় লোক আছে সেই অনুপাতে তাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করতে হবে এবং ঐ আসনগুলির $^{১}/_{৩}$ অংশ জনজাতি ও উপজাতিয় মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

১০.১৩.৩ গণপূর্তি

কোনো পৌরসভায় মোট নির্বাচিত কাউন্সিলরদের $^{১}/_{৩}$ অংশ সভায় উপস্থিত থাকলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গণপূর্তি হবে। কাউন্সিলরগণ যথা নির্ধারিত হারে পারিশ্রমিক ও ভাতা পেয়ে থাকেন।

পর্ষৎ-সহ-চেয়ারম্যান ঃ সংসদীয় গণতন্ত্রের মডেলে মন্ত্রিসভা পরিচালিত ব্যবস্থার মতো রাজনৈতিক প্রশাসন বিভাগের নাম হলো চেয়ারম্যান সহ-পর্ষদ (Chairman in-Council) । এই পর্ষদে থাকবেন চেয়ারম্যান স্বয়ং, ভাইস-চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন শ্রেণির পৌরসভার জন্য নিম্নলিখিত সংখ্যায় কয়েকজন নির্বাচিত সদস্য ঃ—

ক শ্রেণিভুক্ত	অনধিক ৫ জন		প্রত্যেক শ্রেণিভুক্ত নির্ধারীকৃত সদস্য সংখ্যার সঙ্গে চেয়ারম্যান্ ও ভাইস্ চেয়ারম্যান যুক্ত হয়ে ঐ শ্রেণির পুরসভার চেয়ারম্যানসহ পর্ষদ গঠিত হয়।
খ "	"	৪ "	
গ "	"	৩ "	
ঘ "	"	২ "	
ঙ "	"	১ "	

১০.১৩.৪ কাউন্সিলর পর্ষদের সভা

প্রতি মাসে একবার কাউন্সিলর পর্ষদের সভা বসে। কাউন্সিলর-পর্ষদের মোট সদস্যের $^{১}/_{৩}$ অংশ বা তার চেয়ে বেশি সদস্যবৃন্দের লিখিত আবেদন ক্রমেও চেয়ারম্যান ঐ পর্ষদের অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন। অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের সংখ্যাধিক্যের সমর্থনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১০.১৪ চেয়ারম্যান

নির্বাচিত পার্ষৎগণ বোর্ডের প্রথম সভায় মিলিত হয়ে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন। তিনিই হবেন পুরসভার শাসনবিভাগীয় অধিকর্তা এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণে পুরসভার প্রশাসন পরিচালিত হবে। চেয়ারম্যান আপন কার্যভার গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে পৌর সভার সদস্যবৃন্দের মধ্য থেকে একজন ভাইস-চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে মনোনীত করবেন। চেয়ারম্যান পর্ষৎ-সহ-চেয়ারম্যান এবং কাউন্সিলর গণের সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তিনি চেয়ারম্যান কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে কার্য বন্টন করবেন। চেয়ারম্যান কখনও কাউন্সিলর পর্ষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বা পরিপন্থি কোনো কাজ করতে পারে না। কোনো কারণে চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হলে কাউন্সিলর পর্ষদ নির্ধারিত পন্থায় তাদের মধ্য থেকে অন্য একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন, কিন্তু চেয়ারম্যানের পদে কোনো প্রার্থীকে সর্বসম্মত বা নির্বাচনে নিযুক্ত করতে ব্যর্থ হলে রাজ্য সরকার কোনো ব্যক্তিকে উক্ত পদে মনোনীত করতে পারবেন। চেয়ারম্যান পৌর এলাকার কাউন্সিলর পদ হারালে তিনি চেয়ারম্যানের পদে থাকতে পারবেন না। চেয়ারম্যান যে কোনো সময় কাউন্সিলর পর্ষদকে লিখিত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা পদত্যাগ করতে পারেন এবং নির্ধারিত পন্থায় তার পদত্যাগ পত্র গৃহীত হবে। ১৮নং ধারার ৩নং উপধারায় চেয়ারম্যানের পদচ্যুতির পদ্ধতির কথা আছে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী চেয়ারম্যান পর্ষদের সদস্য কর্তৃক আনীত অভিযোগের ভিত্তিতে আহুত পুরসভার অধিবেশনের ১/৩ অংশ যদি লিখিত ভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ঐ প্রস্তাব অধিকাংশ সদস্যের দ্বারা সমর্থিত হয় তাহলে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চেয়ারম্যানকে অপসারণ করা যাবে। চেয়ারম্যানের অবর্তমানের চেয়ারম্যান পর্ষদ এবং কাউন্সিলরদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন ভাইস চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যান পর্ষদের কাজ ঃ- সময়ে সময়ে চেয়ারম্যান কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বগুলিই হলো চেয়ারম্যান পর্ষদের কাজ।

১০.১৫ বিরোধী দলীয় নেতা

১৯৯৩ সালের পঃবঙ্গ পৌর আইনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি। পৌরসভায় স্বীকৃত বিরোধী রাজনৈতিক দলের সর্বাধিক সংখ্যক সদস্যদের প্রতিনিধি হিসাবে চেয়ারম্যান একজন সদস্যকে বিরোধী দল-নেতা হিসাবে স্বীকৃতি দেবেন। দুই বিরোধী দলের সমান সংখ্যক সদস্য থাকলে বিরোধী দলনেতা মনোনয়নে চেয়ারম্যানের বিবেচনাই চূড়ান্ত হবে।

১০.১৬ বোরো কমিটি

নূতন পুর আইনে কমিটি ব্যবস্থারও বিস্তৃত আয়োজন আছে। তিন লক্ষ বা ততোধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট হলে পুরসভার প্রথম অধিবেশনেই অথবা যথাসম্ভব শীঘ্র ৫টি বরো কমিটি গঠিত হবে। প্রত্যেকটি বরো কমিটিতে ৬টি করে ওয়ার্ড থাকবে। প্রত্যেক বরো কমিটিতে উহার অধীন ৬টি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত ৬জন সদস্য থাকবেন। প্রত্যেক বরো কমিটি তাদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন। কিন্তু তিনি কাউন্সিলর-পর্ষদের সদস্য হবেন না। পৌরসভার আইন ও নির্দেশ মোতাবেক বরো কমিটি আপন দায়িত্ব নির্বাহ করবে।

১০.১৭ ওয়ার্ড কমিটি

পৌরসভার প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য একটি ওয়ার্ড কমিটি থাকবে। মাসে অন্তত একবার করে ওয়ার্ড কমিটি সভা বসবে। ঐ ওয়ার্ডে বসবাসকারী বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ও জন-প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিগণকে নিয়ে ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হবে। এই সব সদস্যদের মনোনয়ন দেবেন ঐ ওয়ার্ডের নির্বাচিত কাউন্সিলর এবং তিনিই ওয়ার্ড কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

ওয়ার্ড কমিটি গুলির উপর নিম্নলিখিত দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে ঃ

- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করা এবং সমস্যাগুলির অগ্রাধিকার দান।
- ঐ এলাকায় পৌর পরিষেবা, উন্নয়ন এবং পরিচালনার কাজে এলাকার অধিক সংখ্যক অধিবাসীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা এবং কোনো একটি প্রকল্প বা কর্মসূচি সম্পন্ন হবার পর তার অবস্থা ও সংরক্ষণ সম্পর্কে জনগণের প্রতিক্রিয়াকে পৌর প্রশাসনের সঙ্গে সংযুক্ত করা।
- পৌর কর এবং অন্যান্য ফি যথাসময়ে প্রদানের জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা।
- ওয়ার্ড এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রচনা এবং তা সম্পাদন করা।
- বে-আইনি নির্মাণ, পৌর এবং জনগণের সম্পত্তির উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ, কর ফাঁকি দেওয়া, লাইসেন্সবিহীন সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম করা, জনসাধারণের পক্ষে বিরক্তিকর বা ক্ষতিকর কাজ—ইত্যাদি অপরাধগুলি সরকার ও পৌর কর্তৃপক্ষের নজরে আনা।
- রাস্তার জল, আলো, কল, জনগণের উদ্যান ও খেলার মাঠ, বিনোদন ক্ষেত্র, পাঠাগার ইত্যাদি উপযুক্ত ব্যবহার সুনিশ্চিত করা।
- সুযোগ সময় মত সভা ডেকে পৌর পরিষেবা বিধানের কাজে জনগণের অংশগ্রণের ব্যবস্থা করা।
- জনগণের অভাব-অভিযোগ শোনা এবং তা প্রতিকারের বন্দোবস্ত করা।
- বরো কমিটি বা পুর বোর্ড কর্তৃক প্রত্যর্পিত অন্যান্য ক্ষমতা।
- প্রতি বছর ৩০ শে জুনের মধ্যে একটি বাৎসরিক সভা আহ্বান ও সংগঠন করে পৌর পরিষেবার মূল্যায়ন।

ওয়ার্ড কমিটি ও বরো কমিটি ছাড়াও নূতন পুর আইনে বিশেষ কমিটি ও যৌথ কমিটি গঠনের কথা বলা

হয়েছে। বিশেষ কমিটি গঠনের অধিকার চেয়ারম্যান পর্ষদের। কোনো বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য অথবা কোনো অনুসন্ধান কার্য সম্পাদনের জন্য অথবা কোনো সমীক্ষার প্রতিবেদনের জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু যৌথ কমিটি গঠনের অধিকার রাজ্য সরকারের । পার্শ্ববর্তী এক বা একাধিক পৌরসভার সাধারণ স্বার্থ বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সমূহকে নিয়ে রাজ্য সরকার যৌথ কমিটি গঠন করবেন।

১৯৯৩ পঃবঙ্গ পুর আইনের আর একটি উল্লেখযোগ্য সংস্থা হলো পৌর কৃত্যক কমিশন (Municipal Service Commission)। রাজ্য সরকার একজন চেয়ারম্যান ও অন্য দুজন সদস্যকে নিয়ে পৌর কৃত্যক কমিশন গঠন করবেন। এই পৌর কৃত্যক কমিশনার একজন নির্বাহী আধিকারিক সহ ১৪ জন আধিকারিক ও অন্যান্য পৌর কর্মচারীদের মনোনীত করবেন এবং তাদের বেতন, ভাতা ও চাকুরির শর্তাবলী নির্ধারণ করবেন।

১০.১৮ পৌর সভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী

পুরসভার কাজগুলিকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) বাধ্যতামূলক (খ) স্বেচ্ছাধীন এবং (গ) রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রত্যার্পিত।

গণপূর্ত, গণস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, শহর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, প্রশাসন, শিক্ষাক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত দীর্ঘ তালিকায় পুরসভার বাধ্যতামূলক ও স্বেচ্ছাধীন কাজের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলো—

ক) সাধারণের চলাচলের রাস্তা, সেতু, পার্ক, উদ্যান, পুকুর, ঘাট, পাতকুয়া, সংযোগ, নর্দমা, পায়খানা, প্রসাবখানা, পুল, উড়াল পুল, ভূতল পথ নির্মাণ, সংরক্ষণ, পরিবর্তন ও উন্নয়ন।

খ) সাধারণ এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পৌরসভা নিজে অথবা কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে জল সরবরাহ করা ও আলোর ব্যবস্থা করা।

গ) রাস্তার নামকরণ এবং বাড়ীর নম্বরযুক্ত করা।

ঘ) বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্য্যাকরণ।

ঙ) পৌর বাজার ও কসাইখানা নির্মাণ ও সংরক্ষণ।

চ) স্মৃতিসৌধ ও ঐতিহাসিক স্থান রক্ষণাবেক্ষণ।

ছ) অগ্নি নির্বাপণের উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

জ) সমস্ত প্রকার আবর্জনা, ময়লা, দুর্গন্ধযুক্ত বা দূষিত সমস্ত পদার্থ সংগ্রহ অপসারণ ও বিনষ্টকরণ।

ঝ) অপরাধমূলক বিপজ্জনক ব্যবসা ও কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ ও নিষিদ্ধ করণ।

ঞ) মৃত বস্তু ফেলিবার স্থান নির্ধারণ ও সংরক্ষণ ও মৃত পশুর দেহ বা অজ্ঞাত মৃতদেহ অপসারণ ও নিষ্পত্তিকরণ।

ট) গণটীকা প্রদান এবং বিপজ্জনক ব্যাধি সংক্রমণ প্রতিরোধ।

ঠ) শহর পরিকল্পনা ও বস্তি উন্নয়ন।

ড) জন্ম এবং মৃত্যু নিবন্ধিকরণ।

চ) শিক্ষার উন্নয়ন।

ণ) প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ।

ত) হাসপাতাল, চিকিৎসালয়, আশ্রয়স্থল, মাতৃসদন এবং শিশুমঙ্গল কেন্দ্র গঠন, সংরক্ষণ এবং সাহায্য দান।

থ) আর্থিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ শ্রেণীর লোকেদের জন্য গৃহনির্মাণ।

দ) পশ্চাৎপদ পুরুষ এবং মহিলার জন্য রোজগার যোজনার মাধ্যমে সাহায্যদান।

সংক্ষেপে বলা যায় যে সমাজবদ্ধ মানুষের সামগ্রীক জীবনের সমস্ত প্রকার সমস্যা সমাধানের দায়িত্বই পৌরসভার হাতে ন্যস্ত হয়েছে। কর্তব্য ও ক্ষমতার এই বিস্তৃত তালিকার বাইরেও রাজ্য সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা পৌরসভার উপর আরও অনেক দায়িত্ব ন্যস্ত করতে পারে।

১০.১৯ পৌর তহবিল

পৌরসভার উপর যে বিপুল পরিমাণ দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে তার জন্য পৌরসভার প্রয়োজন একটি পৌর তহবিল। নতুন আইনের ৬৭নং ধারায় এই পৌর তহবিলের কথা বলা হয়েছে। পৌরসভার আইনে আদায়কৃত সমস্ত অর্থ পৌরসভা কর্তৃক অন্য কোনভাবে আদায়কৃত অর্থ এই তহবিলে জমা পড়বে। পৌর তহবিলে গৃহীত সমুদয় অর্থ পৌর এলাকার সরকারি কোষাগারে অথবা কোনো ব্যাঙ্কে জমা রাখা হবে এবং সংশ্লিষ্ট পৌরসভার নামে জমা থাকবে। চলতি বাজেটে বরাদ্দ না হলে এবং বাজেট মঞ্জুরী না হলে সাধারণত পৌর তহবিল থেকে কোনো ব্যয় কর যাবে না।

আয়ের উৎস ঃ পৌর সভার রাজস্ব আদায়ের উৎসগুলির মধ্যে প্রধান হলো কর-রাজস্ব। কাউন্সিলর পর্ষদ নিম্নোক্ত কর আরোপ করতে পারে—

ক) ভূমি ও বাড়ীর উপর সম্পত্তি কর

খ) পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ব্যতীত অন্য বিজ্ঞাপনের উপর কর

গ) গরুর গাড়ীর উপর কর

ঘ) যানবাহনের উপর কর

ঙ) খেয়া, সেতু এবং ভারী মালবাহী ট্রাকের উপর শুল্ক কর ও অভিকর আরোপ করা করের হার বা পরিমাণ কাউন্সিলর পর্ষদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে।

দ্বিতীয়ত, ধর্মসভা, মেলা, উৎসব, সার্কাস বা যাত্রাসহ পৌর এলাকায় অনুষ্ঠিত যে কোনো ধরনের সমাবেশের উপর তোলা আরোপিত হতে পারে। তবে তার পরিবর্তে পৌরসভা কর্তৃক কিছু পরিষেবা প্রদানের বন্দোবস্ত থাকতে হবে।

তৃতীয়ত, পৌর পরিষেবা প্রদানের বিনিময়ে পর্যটকদের কাছ থেকে তোলা আদায় করা যেতে পারে।

চতুর্থত, ভারী ট্রাক ও বাসের উপর তোলা আরোপ করা যায়।

পঞ্চমত, গলিত বর্জ্য পদার্থ অপসারণের জন্য পৌর পরিষেবা প্রদানের বিনিময়ে বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর কাউন্সিলর পর্ষদ বিশেষ সংরক্ষণ তোলা ধার্য করতে পারেন।

ষষ্ঠত, কোনো হোল্ডিং-এর উপর আরোপিত সম্পদ করের উপর ২০% থেকে ৫০% অভিকর।

সপ্তমত, ট্রেড লাইসেন্স প্রদান এবং নবায়নের জন্য পৌরসভাকে দেয় ফি। এই উৎসগুলি ছাড়াও পৌরসভা জল সরবরাহ, নূতন রাস্তা তৈরি, গাড়ী পার্ক করার ফি ইত্যাদি বাবদও অর্থ আদায়ের নূতন নূতন সুযোগের ব্যবহার করছে।

অর্থ আদায়ের উৎস হিসাবে সবশেষে রাজ্য সরকারের কাছে প্রাপ্ত অনুদানের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকারের কাছে প্রাপ্য সাহায্যকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। তা ছাড়া আছে অনুদান। অনুদানগুলি দুই ধরনের হতে পারে—সর্ত সাপেক্ষ ও এককালীন অনুদান। বিশেষ কোনো প্রকল্পের আংশিক ব্যয় নির্বাহের জন্য সর্তসাপেক্ষ অনুদান দেওয়া হয় যা ঐ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই খরচ করতে হয়। এককালীন অনুদানের অর্থ ব্যয়ে কর্পোরেশনের অনেক খানি স্বাধীনতা থাকে। আবার পৌরসভার রাজস্ব ঘাটতি মেটানোর জন্যও রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুদান মঞ্জুর হতে পারে। আবার মূলধন উন্নয়ন প্রকল্পেও রাজ্য সরকার অনুদান দিতে পারে। আবার বীমা কর্পোরেশন (LIC), আবাসন উন্নয়ন সংস্থা (HUDCO) ইত্যাদি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকেও জল সরবরাহ ব্যবস্থা এবং আবাসন ব্যবস্থার মতো মূলধন সৃষ্টিকারী ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে অর্থ সাহায্য বা ঋণ নেওয়া যেতে পারে।

১০.২০ ১৯৯৩ সালের পৌর আইনের বৈশিষ্ট্য

১৯৯৩ সালের পৌর আইনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হলো পৌরসভা গঠনের যুক্তিসিদ্ধ মাপকাঠি নির্ণয়। ১৯৩২ এর পুর আইনে এমনকি ১৯৮০-র সংশোধনী আইনেও এই ব্যবস্থা ছিল না। নূতন আইনে জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব নিশ্চয়ই পৌরসভা নির্বাচনে একটি উল্লেখযোগ্য নির্ধারক, কিন্তু সেই সঙ্গে জনসাধারণের বৃত্তি এবং পুরসভার ক্রমবর্দ্ধমান সমস্যা সমাধানে জনগণের আর্থিক সক্ষমতার কথাও গুরুত্ব পেয়েছে। জনসংখ্যার পরিমাণ হিসাবে পৌরসভাগুলিকে ৫টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক শ্রেণির কাউন্সিলর পরিষদে পারিষদগণের প্রতিনিধির সংখ্যাও জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য ১৯৩২ এর বঙ্গীয় পুর আইনে প্রচলিত পুরসভাগুলির বাইরে নূতন কোনো পুরবোর্ড গঠনের ইচ্ছা সরকারের ছিল না কারণ নির্দিষ্ট কয়েকটি শহর ছাড়া অন্যত্র জনসংখ্যার তেমন চাপ ছিল না।

দ্বিতীয়ত, ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় আইনের সঙ্গে ১৯৯৩ সালের পৌর আইনের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কাউন্সিলর পর্ষদের স্বীকৃতিতে। ১৯৩২ সালের আইনে পুরবোর্ডকে এমন কতগুলি ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল যেগুলি চেয়ারম্যান ব্যবহার করতে পারতেন না যথা পুরসভার অফিসারের ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও অপসারণ ; কমিটি গঠন, সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও প্রয়োজনে বিক্রয় করার অধিকার। পুরবোর্ড কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারতেন এবং কতগুলি বিধি ও উপবিধি তৈরি করা এবং বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন করতেন। পুর কর্মচারীদের কাজের শর্তাদি তৈরি করাও ছিল পুরবোর্ডের কাজ। তাছাড়া তার নিজের ও কমিটিগুলির কার্য পরিচালনার বিধি তৈরি। পুর কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা নির্ধারণ এ সবই ছিল পুরবোর্ডের কাজ। কিন্তু এই সঙ্গে ১৯৩২ এর আইনে পুরসভার চেয়ারম্যানকেও বিশিষ্টতম ভূমিকা দান করা হয়েছিল। প্রাত্যহিক দায়িত্ব নির্বাহের দায়িত্ব পুরসভা চেয়ারম্যানের হাতেই অর্পণ করে ; আবার চেয়ারম্যান তাঁর রুটিন প্রশাসনিক কাজের কিছু কিছু

ভাইস চেয়ারম্যানের উপর অর্পণ করতেন। পুরসভার সমস্ত নথি, দলিল, স্মারক ইত্যাদির উপর চেয়ারম্যানের আইনী কর্তৃত্ব ছিল। চেয়ারম্যানের কাজে সাহায্য করার জন্য পুরবোর্ড একজন শাসক সচিব নিয়োগ করতে পারতেন। এইভাবে ১৯৩২ সালে আইনে সমগ্র পুরসভার দায়িত্ব পুরবোর্ড ও চেয়ারম্যানের মধ্যে বিভাজিত ছিল। কিন্তু ১৯৮০ সালের আইনে আবার পূর্ববর্তী ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে চেয়ারম্যানকে কতগুলি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। যথা—বোর্ড অব কমিশনার্সদের সভা ডাকা এবং সেই সভায় নির্দেশ জারি করা, অধঃস্তন পুরকর্মচারী নিয়োগ। পুরসভার বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব তৈরি, সমগ্র পুরকর্মচারীদের কাজকর্ম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ, পুরকর এবং ফি ইত্যাদি আদায়ের ব্যবস্থা করা ও তদারকি করা, যে সমস্ত ব্যক্তির ও সংস্থার কাজকর্ম তদন্ত করা হবে তা প্রকাশ করা, সম্পত্তির মূল্যের পুনঃসমীক্ষা করা, পুর এলাকায় দালান ও অট্টালিকা তৈরি, আদালতে বিচারাধীন কমিশনারদের পক্ষে আদালতে প্রতিনিধিত্ব দান, পুর আইন বলবৎ করা ইত্যাদি। এইভাবে ১৯৮০ সালের আইনে চেয়ারম্যানের অনন্য ভূমিকা আবার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৯৩ এর পুর আইনে পুনরায় এই ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকারের আদর্শে একটি কাউন্সিলর পর্ষদ গঠিত হয়।

১৯৯৩ সালের নূতন আইনে সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কাউন্সিলর পর্ষদের হাতে অর্পণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাউন্সিলর পর্ষদের সম্মতি থাকলেই তবে পুরবোর্ডে ঐ বিষয় অনুমোদন পেত অনেকটা মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকারের প্রথা অনুসারে। কাউন্সিলর পর্ষদের বিরুদ্ধে বা পরিপন্থি কোনো কাজ করা চেয়ারম্যানের পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও পৌরসভার যাবতীয় নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপরই ন্যস্ত করা হয়। এইভাবে কাউন্সিলর পর্ষদের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নূতন আইন পার্ষদগণের যৌথ দায়বদ্ধতাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তৃতীয়ত, ১৯৮০ সালের আগে পর্যন্ত চেয়ারম্যানকে সাহায্য করার জন্য পুরবোর্ড একজন শাসক-সচিব (Administrative Secretary) নিয়োগ করত। কিন্তু ১৯৮০ সালের সংশোধনে তা পরিত্যক্ত হয়। এই সংশোধনীর আগে পর্যন্ত রাজ্য সরকার একজন নির্বাহী আধিকারিক (Executive Commissioner) নিয়োগ করতে পারতেন এবং বিশেষ কোনো দায়িত্ব বা সব দায়িত্ব তার উপর প্রত্যর্পণ করতে পারতেন। এইভাবে পেছনের দরজা দিয়ে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপের একটি সুযোগও তৈরি হয়। ১৯৮০ সালের সংশোধনীতে এই ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ বাতিল বলে ঘোষিত হয়। কিন্তু ১৯৯৩ সালের পুর আইনে পুনরায় ১৯৮০ সালের আগের ব্যবস্থাটি পুন প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে শুধু একজন নির্বাহী আধিকারিক নয়, তার সঙ্গে স্বাস্থ্য, অর্থ, প্রকৌশলী ইত্যাদি আরও ১৪জন আধিকারিকের নিযুক্তির বন্দোবস্তও করা হয়। এদের নিয়োগ কাউন্সিলর পর্ষদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করলেও নির্বাহী আধিকারিক, স্বাস্থ্য আধিকারিক, প্রকৌশলী অথবা অর্থ আধিকারিক—এই চারজনের বেতন ও ভাতা সমূহ রাজ্যসরকার বহন করবেন এবং রাজ্য সরকারই এদের নিয়োগের উপায় ও চাকুরির সর্তাবলি স্থির করবেন। এইভাবে ১৯৯৩ সালের আইনেও রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপের পরোক্ষ বন্দোবস্তের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত কাউন্সিলর পর্ষদ কোনো আধিকারিকের পদও সৃষ্টি করতে পারবেন না। নির্বাহী আধিকারিকের জন্য নূতন আইনে যে পদমর্যাদা স্থিরীকৃত হয়েছে তাও স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রিভূত ক্ষমতার ধারণাকে দুর্বল করে দেওয়া নির্বাহী আধিকারিক পৌরসভার প্রধান নির্বাহী আধিকারিক হবেন এবং পৌরসভার অন্য সমস্ত আধিকারিক ও কর্মচারী তাহার অধঃস্তন থাকবেন। এমনকি তিনি কাউন্সিলরদের সভায় অথবা কোনো কমিটির সভাতেও উপস্থিত থাকতে পারেন যদিও ঐ সব সভায় তার কোনো ভোটাধিকার থাকে না। এতৎসত্ত্বেও ১৯৯৩ সালের পুর আইনে ১৯৮০ সালের পূর্ববর্তী ব্যবস্থার পুনঃপ্রচলনের মধ্যে অনেকে রাজ্য সরকারের অগণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপের আশংকা করেন।

১৯৯৩ সালের পুর আইনে শাসক সচিব বা চেয়ারম্যানের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার অবসান ঘটে। কাউন্সিলর পর্ষদই হয় চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু কাউন্সিলর-পর্ষদে প্রশাসন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধির অভাবে তাদের সিদ্ধান্ত

কৃৎকৌশলের যৌক্তিকতার দিক দিয়ে পুরসভার যোগ্য এবং অভিজ্ঞ আধিকারিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত নাও হতে পারে এবং সেখানেই সৃষ্টি হতে পারে বিরোধের। ফলে গণ-প্রশাসন বিশেষজ্ঞদের ধারণা মন্ত্রিসভা পরিচালিত ব্যবস্থায় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের পশ্চাতে অরাজনৈতিক কর্মচারীগণের অস্তিত্ব না থাকলে স্বায়ত্তশাসন অর্থহীন হয়ে পড়তে পারে।

চতুর্থত, ১৯৩২ এবং ১৯৯৩ এর পুর আইনের মধ্যে আর একটি ব্যবধান হলো কমিটি ব্যবস্থা। ১৯৩২ এর পুর আইনে কমিটিকে কোনো ভূমিকাই দেওয়া হয়নি। প্রাথমিকভাবে ৪টি কমিটির গঠনের কথা থাকলেও তার একমাত্র শিক্ষা কমিটি ছাড়া বাকিগুলি গঠনের কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। অবশ্য ১৯৮০ সালের আইনে অর্থ, জনস্বাস্থ্য, পূর্ত এই তিনটি কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক হয়। কিন্তু কমিটি ব্যবস্থাটিকে অধিকতর সুদৃঢ় ও ক্ষমতাশালী করা হয় ১৯৯৩ এর পুর আইনে। ক্ষমতা বিকেন্দ্রিভূত হয় বরো কমিটি ও ওয়ার্ড কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে। জনগণের সমর্থন ও অংশগ্রহণের সুযোগ ঘটে। তাছাড়াও পৌর প্রশাসনে অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের জ্ঞান ও বুদ্ধি যুক্ত করার জন্য বিশেষ কমিটি গঠনের কথা বলা হয়। সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত দুই বা ততোধিক পুরসভার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে যৌথ কমিটি গঠনের ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। এই দিক থেকে ১৯৯৩ এর পৌর আইন বিকেন্দ্রীভূত স্বায়ত্তশাসনের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা সংযোজন করেছে।

সর্বোপরি ১৯৯২ সালে ৭৪ তম সংবিধান সংশোধন আইনের বলে পঃবঙ্গে ১৯৯৩ সালের আইনে উল্লিখিত পৌর কাঠামো ও পৌর প্রশাসন সাংবিধানিক মর্যাদা লাভ করেছে। ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনের লক্ষ্য ছিল শহরের স্বায়ত্ত শাসন সংস্থাগুলি যাতে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে স্বশাসনকে অর্থবহ করে তুলতে পারে। তাছাড়া নগর পরিষেবার পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং বন্টনে যাতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে এবং জনগণের অবাধ অংশগ্রহণ হয় তা সুনিশ্চিত করাই ছিল ৭৪তম সংশোধনী আইনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণে পৌর প্রশাসনের ক্ষেত্রে যে মৌল পরিবর্তনগুলি সাধিত হয় সেগুলি হলো—

প্রথমত, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত পৌর সংস্থার স্থায়িত্বকে নিশ্চিত করা।

দ্বিতীয়ত, ১২নং তপসীলের অর্ন্তভুক্তির মাধ্যমে রাজ্য সরকারের পৌর দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলি সম্বন্ধে একটি পরিচ্ছন্ন কাঠামো রচনা করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, স্বায়ত্ত শাসন সংস্থাগুলির সম্পদে বৃদ্ধি এবং রাজ্য ও পৌর সংস্থাগুলির রাজস্বের ভাগাভাগির জন্য রাজ্য সরকারের নির্দেশে অর্থ কমিশন গঠন।

চতুর্থত, মহানগর ও জেলা পরিকল্পনা কমিটি গঠন এবং ঐ কমিটিগুলির মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে উন্নয়ণ পরিকল্পনা রচনা ও পরিচালনাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

১০.২১ প্রজ্ঞাপিত এলাকা

পঃ বঙ্গে প্রজ্ঞাপিত এলাকার সংখ্যা ৩—নদীয়া জেলার তাহেরপুর এবং কুপারস্ ক্যাম্প এবং দার্জিলিং জেলার মিরিক। আসলে কোনো শহরাঞ্চলে পৌরসভা গঠন করবার মতো অবস্থা না থাকলে অথবা নূতনভাবে কোনো শহরাঞ্চল তৈরি হলে রাজ্য সরকারের পক্ষে রাজ্যপাল ঐ এলাকাকে ঘোষিত বা প্রজ্ঞাপিত এলাকা বলে ঘোষণা করতে পারেন। আবার রাজ্যপাল যেদিন প্রয়োজনীয় শর্তাবলী সম্পর্কে সন্তুষ্ট হবেন, সেদিন তিনি ঐ এলাকাকে নিয়মিত পৌরসভা এলাকা বলে ঘোষণা করতে পারেন। পৌরসভার মতো প্রজ্ঞাপিত এলাকারও নির্বাচিত সদস্য

থাকেন এবং তাঁদের সিদ্ধান্তে সংখ্যাধিক্য সদস্যের সমর্থন নিয়ে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পৌরসভার মতোই প্রজ্ঞাপিত এলাকার নির্বাচিত কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক এবং বিধি প্রণয়ণের অধিকার আছে। শুধু তাই নয় রাজ্য সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধিকারিক ও কর্মচারীও নিয়োগ করতে পারেন।

১০.২২ সারাংশ

কোলকাতা পুর নিগম সহ পঃবঙ্গের পৌরসভাগুলি প্রশাসনিক কাঠামো এবং কার্যাবলীর আমূল পরিবর্তন ঘটে ১৯৯২ সালের ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইনে। সেই সঙ্গে শহর স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলি সংবিধানিক স্বীকৃতিও লাভ করে। ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ১৯৯৩ সালে পঃবঙ্গ পুর আইন রচিত হয় এবং ১৯৮০ সালের পুর নিগম (Corporation) প্রশাসনেও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা হয়। কোলকাতা পুরনিগমের ক্ষেত্রে মেয়র-পরিষদ একটি নূতন পরীক্ষা। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমস্ত ক্ষমতা এই মেয়র-পরিষদের। নূতন ব্যবস্থায় পৌর সঙ্ঘগুলির ক্ষেত্রে ওয়ার্ড কমিটিগুলিকে কার্যকরী ক্ষমতা দান করা হয়েছে। কোলকাতা সহ সমস্ত পৌরসভাগুলির আয়ের উৎস বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে তা যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচে—পৌরসঙ্ঘগুলির আর্থিক স্বয়ংম্ভরতার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাছাড়া আধিকারিক ও পুরকর্মচারী নিয়োগ রাজ্যসরকারের নিয়ন্ত্রণও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার পক্ষে অনুকূল নয়। তবে নূতন সংশোধনী আইনে পৌর নির্বাচনী ব্যবস্থা ও রাজ্য অর্থ কমিশনের ব্যবস্থা স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলিকে অর্থবহ করে তোলার প্রতিশ্রুতি রেখেছে। স্বাভাবিক কারণেই কলকাতা পুর নিগম গঠনের ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই, কারণ অকৃষি-ভিত্তিক বৃত্তিতে নিযুক্তির কারণে জনজাতি, উপজাতি বা মহিলা নির্বিশেষে সকলেই সাধারণ আসনগুলি প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। কিন্তু শহরাঞ্চলে এই ধরনের মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত পশ্চাৎপদতা থাকায় ১৯৯৩ সালের বঙ্গীয় পুর আইনে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। তবে সে কারণে কোলকাতা পুর নিগমে আসন সংরক্ষিত করা হয়নি, সেই একই যুক্তিতে শহরে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা তুলে দেবার পক্ষে জোরালো বিতর্ক আছে। নূতন আইনে পৌরসভাকে যে বিপুল পরিমাণ কার্যভার তুলে দেওয়া হয়েছে তা নিয়েও সমালোচনা আছে। কারণ এই বিপুল পরিমাণ দায়দায়িত্ব নির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ আর্থিক ক্ষমতা পৌরসভাগুলির নেই। প্রশাসন বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে তাই কেউ কেউ প্রস্তাব করেছেন কাজগুলির অপরিহার্যতা, অথবা একমাত্র পৌরসভার পক্ষেই করণীয় (essential) অথবা রাজ্য সরকার কর্তৃক ভারার্পিত (assigned) অথবা অন্যান্য বে-সরকারি সংস্থা (NGO) কর্তৃক করণীয়—ইত্যাদি বিষয়গুলি বিবেচনা করে পৌরসভা দায়িত্বের একটি আদর্শ তালিকা (Model list) তৈরি করা যায় এবং তদনুযায়ী রাজ্য সরকার ও পৌর প্রশাসনের মধ্যে অর্থ রাজস্বের পারস্পরিক বন্টনের ব্যবস্থা করা যায়।

১০.২৩ অনুশীলনী

১। দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ—

(ক) কোলকাতা পুর নিগমের বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করুন।

(খ) কোলকাতা পুর নিগমের মেয়র-পরিষদ (Mayor-in-Council) ব্যবস্থার কাঠামো ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।

(গ) পশ্চিমবঙ্গ পুর আইন, ১৯৯৩ সালের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গ পুর আইন ১৯৯৩ অনুযায়ী তিনটি পুর কর্তৃপক্ষ কী কী? তাদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গ পুর প্রশাসনের আয়ের উৎসগুলি কী? আপনি কী এই উৎসগুলিকে যথেষ্ট বা উপযুক্ত মনে করেন?

(চ) কোলকাতা পুর নিগমের—কার্যাবলীর বিস্তৃত আলোচনা করুন। আপনি কী মনে করেন এই বিপুল পরিমান দায়িত্ব পালনের আর্থিক ক্ষমতা কোলকাতা পুর নিগমের আছে?

(ছ) কোলকাতা পুর নিগমের কমিশনারের নিয়োগ ও কার্যাবলী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করুন।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ-

(ক) কোলকাতা পুর নিগমের বিবর্তনের ইতিহাসে শ্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা কী?

(খ) মেয়র-পরিষদ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পশ্চাতে মূল যুক্তিগুলি কী কী?

(গ) কোলকাতা পুরনিগম বোর্ড গঠিত হয় কাদের নিয়ে?

(ঘ) নূতন আইন অনুযায়ী কোলকাতা পুর নিগমের নগরপালকে কীভাবে পদচ্যুত করা যায়?

(ঙ) কোলকাতা পুর নিগমের মেয়র-পরিষদের গঠন বর্ণনা করুন।

(চ) কোলকাতা পুর নিগমের আইন অনুযায়ী বরো কমিটির গঠন ও কাজ আলোচনা করুন।

(ছ) কোলকাতা পুর নিগমের আইন অনুযায়ী ওয়ার্ড কমিটির গঠন ও কাজ আলোচনা করুন।

(জ) পৌর কৃত্যক সংস্থার (Municipal Service Commission-এর) গঠন ও কাজ আলোচনা করুন।

(ঝ) কোলকাতা পুর নিগমের মেয়রের বা নগর পালের জরুরি অবস্থাকালীন ক্ষমতাটি কী? তার উপর আপনার মন্তব্য লিখুন।

(ঞ) কোলকাতা পুর নিগমের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন।

(ট) পৌরকর্মীর প্রাদেশিকীকরণ বলতে কী বোঝায়?

৩। নৈর্ব্যক্তিক বা অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ—

(ক) বর্তমানে যে কোনো পৌরসংঘে ভোটাধিকারের বয়স কত?

(খ) কোলকাতা পুর নিগমের ওয়ার্ড সংখ্যা কত?

(গ) মেয়র-পরিষদে মোট সদস্য সংখ্যা কত?

(ঘ) 'ভূমি পুত্র' নীতিটি কী?

(ঙ) কোন্ সালে কোলকাতা পুরনিগমের নবতম আইনটি প্রণীত হয়?

(চ) কোলকাতা ও দিল্লি পুরনিগমের কমিশনারদের নিয়োগ করেন কে?

(ছ) পঃবঙ্গ সংশোধিত পুর আইন প্রণোদিত হয় কোন্ সালে? তার আগে কোন্ আইনটি পুর প্রশাসনের নীতিস্তম্ভ হিসাবে বিবেচিত হতো?

(জ) কোলকাতা পুর নিগম আইনের বিবর্তনের ইতিহাসে কোন্ প্রখ্যাত এক বাঙ্গালী ব্যক্তিত্বের অগ্রগণ্য ভূমিকা আছে ?

১০.২৪ গ্রন্থপঞ্জী

১। দি ক্যালকটা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন এ্যাক্ট, ১৯৮০।

২। দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট, ১৯৯৩।

৩। Indian Administration (World Press)-Prof. Mohit Bhattacharya.

৪। Census of India, 2001, West Bengal, Urban frame (Annexure II).

একক ১১ □ নগর প্রশাসনে রাজনীতি

গঠন

১১.০ উদ্দেশ্য
১১.১ প্রস্তাবনা
১১.২ নগর রাজনীতি বিশ্লেষণের প্রয়োজন
১১.৩ পশ্চিমবঙ্গ পৌর নির্বাচন আইন
১১.৪ পৌরসভার নির্বাচনের ফলাফল, বিশ্লেষণ ও ভোটদাতাগণের আচরণ
১১.৫ পৌর রাজনীতির স্বরূপ
১১.৬ সারাংশ
১১.৭ অনুশীলনী
১১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- নগর-রাজনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা
- নগর-রাজনীতি সম্পর্কিত গবেষণা ও সমীক্ষার এলাকা
- পৌর রাজনীতির প্রকৃতি ও মূল্যায়ন

১১.১ প্রস্তাবনা

'গ্রাম্য রাজনীতি' বা আরো হালকা ভাষায় 'গেঁয়ো রাজনীতি' (village politics) শব্দ গুচ্ছের সঙ্গে কম বেশি আমরা সকলেই পরিচিত। আসলে এই শব্দ গুচ্ছের সঙ্গে কেতাবি রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। যে সমস্ত মাধ্যমগুলির অবাধ পরিচিতি ও প্রচলন জনমত রচনায় সাহায্য করে সেগুলির অভাবে গ্রামগঞ্জে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ব্যাহত হত। তারই ফলে এক ধরনের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতা এক সময় গ্রামের মানুষের মধ্যে দেখা যেত। গ্রামগুলি তখন ছিল বিচ্ছিন্ন, মূল জাতীয় জীবনের সঙ্গে তার কোনো যোগ ছিল না, তারই সুযোগ নিয়ে চরম স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, প্রকট ধর্মান্ধতা, সংস্কারাচ্ছন্নতার প্রভাবে সমষ্টি স্বার্থ বা উন্নয়নকে ব্যাহত করার মানসিকতা দেখা দিত। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত হবার পরে গ্রামে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, গ্রামের মানুষ এখন পঞ্চায়েত প্রশাসনে সমষ্টিবদ্ধ ক্ষমতা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভর জীবনের স্বাদ পেয়েছে, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গ্রামের মানুষ এখন সংকীর্ণ মানসিকতা ও স্বার্থপরতার ঊর্দ্ধে উঠে একটি সমন্বিত জীবন যাপনের সুযোগ পেয়েছে। তাই 'গ্রামের রাজনীতি' শব্দটির মধ্যে আঞ্চলিক দূষণের যে প্রচলন এক সময়ে ছিল তা এখন আর নেই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এক ধরনের রাজনীতি এখনও পঞ্চায়েত প্রশাসনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে চলেছে—তা হলো জাতপাতের সংস্কার, অর্থনৈতিক দারিদ্র্য এবং শিক্ষা ও চেতনার

অভাব। যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধার অভাবে আলোকপ্রাপ্ত জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা ইত্যাদি। ভারতবর্ষ গ্রামপ্রধান। তাই গ্রাম-জীবনের এবং গ্রামীণ মানুষের এই অসুবিধা ও বৈশিষ্ট্যগুলি জাতীয় জীবনকে, এমনকি জাতীয়ও রাষ্ট্র-রাজনীতিকেও প্রভাবিত করে। তাই ভারতের সরকার ও রাজনীতির আলোচনায় গ্রাম-ভারতের রাজনীতিই বেশি প্রভাব ফেলে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের ব্যবহারিক রাজনীতিতে যে জাতপাত, সম্প্রদায়, ধর্ম, অর্থ ও মোহনীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবের কথা বলা হয় তা আসলে গ্রাম ভারতের কোটি কোটি অনগ্রসর মানুষেরই রাজনৈতিক আচরণের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় হলো নগর বা শহর রাজনীতি। রাজনীতি আলোচনার আগে রাজ্য শাসন ও কেন্দ্রীয় শাসন সম্পর্কেই এতাবৎকাল প্রচলিত। এমনকি পঞ্চায়েত স্তরেও সরকারের নিয়ন্ত্রণ, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষমতা অপব্যবহারের আলোচনা হয়। কিন্তু মূলত ৭০-এর দশক জুড়ে সারা ভারতবর্ষে পৌরসঙ্ঘগুলি পরিচালনায় যে অনিয়ম ও অরাজকতা দেখা দিয়েছিল তারই সূত্র ধরে পৌর রাজনীতিও এখন সরকার ও রাজনীতির আলোচনায় একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান পেয়েছে। শহর বা নগর প্রশাসন পরিচালিত হওয়ার পেছনের উপাদানগুলি কী? পৌর নির্বাচন ব্যবস্থা, পৌর প্রশাসনের নেতৃত্বের স্বরূপ, তার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, পৌর ক্ষমতা কাঠামোর সঙ্গে নেতাদের সম্পর্ক, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক, নির্বাচকদের সঙ্গে পুরপ্রশাসনের সম্পর্ক, নির্বাচনের বিভিন্ন 'ইস্যু' এবং রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী ইস্তাহার সম্পর্কে নির্বাচকদের সম্পর্ক—এই সব কিছুর বিশ্লেষণেই শহর-রাজনীতির চেহারা ও বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হবে।

১১.২ নগর-রাজনীতি বিশ্লেষণের প্রয়োজন

এটা সত্য যে ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে নগরগুলি এসেছে পঞ্চায়েতের পরে। বস্তুত পক্ষে ১৯৯২ সালে ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনীতেই প্রথম নগর পরিকল্পনা ও মহানগর পরিকল্পনা কমিটির কথা বলা হয়েছে। অথচ রাজ্য এমন কি কেন্দ্রীয় রাজনীতির কর্তৃত্বের আসন তো শহর-নগরেই গড়ে ওঠে। ফলে বিভিন্ন স্বার্থ গোষ্ঠীগুলি পৌর প্রশাসনের চারপাশেই ভীড় জমায়। পৌর রাজনীতির বিস্তৃত বিশ্লেষণে একদিকে যেমন ভবিষ্যৎ রাজ্য রাজনীতির চেহারা ফুটে ওঠে, তেমনি স্বার্থগোষ্ঠী গুলির আচার আচরণ, চাহিদা বা দাবি-দাওয়া, চুক্তির শর্তাবলী, নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা নির্দিষ্ট রাজনৈতিকদলের কর্মসূচির প্রতি তাদের আনুগত্য—এই সমস্যাগুলিরও সমাধান সূত্র পাওয়া যায়। পৌর রাজনীতির আলোচনা কর্তৃত্বের স্থানীয় ভিত্তিগুলিকে উদঘাটিত করে। সর্বোপরি পৌর স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির নির্বাচন, পৌর ভোটারদের রাজনৈতিক আচার-আচরণ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্যেরই পূর্বশর্ত। এটাই হলো শহর বা নগর-রাজনীতি বিশ্লেষণের মূল প্রয়োজন।

১১.৩ পশ্চিমবঙ্গ পৌর নির্বাচন আইন, ১৯৯৪

৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইন মোতাবেক পঃবঙ্গ বিধানসভা ২০ শে এপ্রিল, ১৯৯৪ সালে পঃবঙ্গ পৌর নির্বাচনী আইন প্রণয়ন করে। ১৯৯৪ সালের রাজ্য নির্বাচন আইনের বিধান অনুযায়ী রাজ্য নির্বাচন কমিশন জেলার ভিত্তিতে পৌর নির্বাচন আধিকারিক নিযুক্ত করবেন এবং তিনি কমিশন কর্তৃক ন্যস্ত অন্যান্য দায়িত্ব সহ কমিশনের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে সমস্ত পৌরসভার নির্বাচনী তালিকা প্রস্তুত করবেন ও সংশোধন করবেন এবং তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত পৌর সভাগুলির সমস্ত নির্বাচন সম্পন্ন করবেন। স্মরণ থাকতে পারে ১৯৬৪ সালে পঃবঙ্গে

সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার সর্বপ্রথম স্বীকৃত হয়। তার আগে ১৯৩২ সালের পুর আইনে ২১ বছর বয়সকে ভোটাধিকার প্রয়োগের বয়স হিসাবে মেনে নিলেও সম্পত্তির মালিকানা, শিক্ষা এবং বৃত্তিগত কারণে তা ছিল সঙ্কুচিত। তা ছাড়া পৌরসভার সদস্য নির্বাচিত হবার বয়স ছিল ন্যূনতম ২৫। ১৯৬৪ সালেই ২৫ বছর থেকে নামিয়ে ২১ বছর বয়স্ক সকল পুরবাসীকে পৌরসভার সদস্য নির্বাচিত হবার অধিকার দান করা হয়। পঃবঙ্গ পৌর আইন ১৯৯৪ তেও সদস্য নির্বাচিত হবার বয়স ন্যূনতম ২১। ১৯৮০ সাল থেকেই সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার কমিয়ে ১৮ করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে আরো ৮ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৮৮ সালে ৬২ তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনে ১৮ বছর বয়স্ক সমস্ত নাগরিকের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। অর্থাৎ ঐ সময় থেকেই পঞ্চায়েত পুরসভা, রাজ্য আইনসভা ও সংসদ—সব কটি নির্বাচনেই অভিন্ন ভোটার তালিকার ব্যবহার শুরু হয়।

পঃবঙ্গ পৌর নির্বাচন কমিশন পুরনিগমগুলি সহ প্রত্যেকটি পুরসভায় নূতন ওয়ার্ড গঠন করবে ও পুরানো বিদ্যমান ওয়ার্ডগুলির বিভাজন ও পুনর্বিভাজন করতে পারে। এ বিষয়ে কমিশন রাজ্য সরকার যেরূপ ধার্য করবে সেরূপ কাজ করবে। ১৯৯৪ পুর আইনেই প্রত্যেকটি ওয়ার্ড এক সদস্য নির্বাচনী এলাকা বলে ঘোষিত হয়।

কমিশনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্বাচন সংক্রান্ত আইন প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করতে পারবেন। পৌরসভা নির্বাচনের বিষয়ে ১৯৯৪ সালের পৌর নির্বাচন আইন সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিধান প্রয়োগ করে। ঠিক হয় যে নির্দিষ্ট নির্বাচন এলাকায় মোট জনসংখ্যার যে শতাংশ অধিবাসী তপশিলী জাতি বা উপজাতি, মোট আসনের ৩৩ শতাংশ আসন ঐ জনজাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং তা পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে। মোট আসনের $\frac{১}{৩}$ অংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তপশিলী জনজাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে $\frac{১}{৩}$ অংশ ঐ জনজাতি ও উপজাতীয় মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

এ ছাড়াও পৌর নির্বাচন আইনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হয়েছে—

(ক) সদস্যদের অযোগ্যতার ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা।

(খ) বুথ দখল, ব্যালট বাক্স ধ্বংস ইত্যাদি প্রতিরোধী উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

(গ) জাল ভোট প্রদান প্রতিরোধ।

(ঘ) নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব প্রদানের বাধ্যবাধকতা।

(ঙ) নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি।

১১.৪ পৌরসভার নির্বাচনের ফলাফল, বিশ্লেষণ ও ভোটদাতাগণের আচরণ

শহর রাজনীতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে গেলে পৌর নির্বাচন ব্যবস্থাদি জানার সাথে সাথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা প্রয়োজন। তা হলো—বিভিন্ন উপাদান ও মাপকাঠিতে পৌরসভার নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ ও ভোটদাতাগণের আচরণ সম্পর্কে নিরপেক্ষ সমীক্ষা। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলিকে এই ধরণের সমীক্ষার নমুনা হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে—

ক) শতকরা কত ভাগ ভোটার রাজ্য, কেন্দ্র এবং পৌর নির্বাচনে সমান উৎসাহ নিয়ে অংশগ্রহণ করে? কত

অংশ রাজ্য আইনসভা বা সংসদ নির্বাচনে যতখানি সক্রিয় উৎসাহ প্রদর্শন করে। পৌর নির্বাচনে সক্রিয়তা প্রদর্শন করে না?

খ) শিক্ষিত-অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত, বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক, নারী-পুরুষ, বৃত্তিগত পার্থক্যের কোনো প্রতিফলন ভোটারদের ভোটদানে পরিলক্ষিত হয় কিনা?

গ) পরিবার ও আত্মীয়স্বজন, মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিক মাধ্যম, স্থানীয় প্রকার, নির্বাচনী ইস্তাহার ও সাহিত্য—রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রয়োজনে ভোটদাতাগণ কোন্‌টি কতখানি ব্যবহার করেন?

ঘ) পৌর ব্যবস্থার সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক কেমন? নাগরিকরা পৌরসভার প্রশাসনকে কেমনভাবে নিয়েছে? পৌর নির্বাচনী প্রচারে কোথায় কোন্ দাবিটি অগ্রাধিকার পাচ্ছে—ইত্যাদি।

ঙ) পৌর প্রশাসনের প্রকৃতি কতখানি স্বয়ংশাসনের প্রকৃতি সম্পন্ন? রাজনৈতিক দল ও কর্মসূচির প্রাধান্য কতখানি?

চ) নির্বাচিত সদস্যদের সামাজিক অবস্থান।

এই সব বিষয়ের উপর পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ ও সমীক্ষাই নগর রাজনীতির সঠিক চিত্র উদঘাটিত করতে পারে। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীগণই এ কাজে অগ্রসর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। এমনকি সংশ্লিষ্ট পরামর্শদাতাদের সাহায্য গ্রহণ করে নগর-প্রশাসন সম্পর্কিত পাঠক্রমের পরীক্ষার বিষয় হিসাবেও এই ধরনের সমীক্ষাপত্র গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে তার মূল্যায়ন যথেষ্ট বিজ্ঞানভিত্তিক পরিসংখ্যান নির্ভর, তথ্যনিষ্ঠ, নিরাবেগ ও নিরপেক্ষ হওয়া আবশ্যক।

১১.৫ পৌর রাজনীতির স্বরূপ

থানা, ডাকঘর, দমকল প্রভৃতি সরকারি সংস্থার মতো স্বশাসিত সংস্থাগুলি প্রত্যক্ষভাবে জনগণের সেবার কাজে নিয়োজিত। সেই হিসাবে পৌর প্রশাসনও প্রত্যক্ষভাবে জনগণের কাছে পরিষেবা গত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেয়। যে ধরনের পরিষেবা পৌরসভাগুলি প্রদান করে তার অধিকাংশগুলির জন্যই কৃৎ কৌশলগত পদ্ধতি প্রকরণের প্রয়োজন আছে। প্রকৌশলগত বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই সর্বোত্তম উপায়ে এই ধরনের পরিষেবা প্রদান করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ শহরে পানীয় জল সরবরাহের কাজটির কথা বলা যায়। এখানে পৌরসংঘগুলির দায়িত্ব হবে জনগণের কাছে পানীয় জল সরবরাহ কত সুলভ করা যায়। এর জন্য রাজনৈতিক দলের ভূমিকার আগে দরকার উপযুক্ত সদস্য নির্বাচন যার এই প্রকৌশলগত সাধারণ জ্ঞানটুকু অন্তত থাকবে, সর্বোপরি প্রয়োজন জনগণের সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ। এ ছাড়াও পুরসভার হাতে থাকে জনগণের পক্ষে মঙ্গলপ্রদায়ক বিরাট কর্মসূচি যেগুলি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কোনো পরস্পর বিরুদ্ধতা থাকতে পারে না—সে পৌর সুযোগ-সুবিধা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, গণস্বাস্থ্য ইত্যাদি যাই হোক না কেন। গণ প্রশাসন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অনেকেই এই ধরনের দায়িত্ব পালনে রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকারিতাকে সমালোচনার ঊর্দ্ধে বলে মনে করেননি। তাঁদের মতে রাজনৈতিক দল নিয়ে আসে বিভাজন এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস। ১৯৬৬ সালে রুর‍্যাল-আরবান সম্পর্ক (Rural-Urban Relationship) কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল এই যে ভারতবর্ষের সমস্ত স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলি রাজনৈতিক দলাদলিতে বিপর্যস্ত। তারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়েও স্থানীয় পৌরসভার দায়িত্ব পালনের চেয়ে দলের সমর্থনের ভিত্তি বাড়ানোর কাজটাকেই বেশি গুরুত্ব দিত। ফলে পৌর প্রশাসনে দলীয় কোন্দল লেগেই থাকত। ভারতবর্ষের

৪টি প্রধান পৌর প্রশাসনের রাজনীতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়েও শ্রীনিবাসন এবং শর্মা তাঁদের পলিটিক্স ইন আরবান ইণ্ডিয়া (Politics in urban India) নামক গ্রন্থে একই সুরে বলেছেন—রাজনৈতিক দলগুলি পৌর প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে এমন মানসিকতা আমদানি করে যা পৌর প্রশাসনকে দুর্বল করে দেয়।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও পৌরসভাগুলিতে রাজনৈতিক দলগুলির হাত ধরেই জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ছে—পৌর প্রশাসনের কাজকর্মের জটিলতা সত্ত্বেও। পৌরসভার হাতে যে ব্যাপক পরিষেবার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে তার অগ্রাধিকার নিয়েই শুরু হয় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আবার স্থানীয় জনসমাজও এমন নয় যে তারা সমস্ত রাজনৈতিক মতাদর্শগত প্রশ্নের বাইরে তারা বাহ্যিক এবং আর্থ-সামাজিক অন্য একটা ঐক্যবদ্ধ অস্তিত্ব রক্ষা করে চলবে। তাছাড়া পুরসভার ভিতরে এবং বাইরে নানান কাজ ও সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে মত পার্থক্য আছে। কর্মচারীদের এক্স-গ্রেসিয়ার (Ex-gratia) প্রশ্ন আগে, নাকি নূতন রাস্তা তৈরি আগে, স্থানীয় বাজারের সংস্কার আগে, নাকি বস্তি উন্নয়ন আগে, স্থানীয় হাসপাতাল তৈরি আগে না স্থানীয় স্টেডিয়াম তৈরি আগে, এই সব প্রতিদ্বন্দ্বী দাবীগুলি রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতেই সুরাহা করতে হয়। এইভাবে অনিবার্য সমাধান সূত্র হিসাবেই পৌর প্রশাসনে রাজনীতি ঝাঁপিয়ে পড়ে। সামাজিক পরিষেবা বন্টনের কর্তৃত্বমূলক যন্ত্র হিসাবেই রাজনীতি এসে পড়ে অনিবার্যভাবে। আর একটি মত হচ্ছে—নির্বাচিত পুরসভাই নগর উন্নয়নে স্থানীয় উদ্যোগ সংহত করতে পারে সবচেয়ে বেশি। অত্যন্ত সহজে ও কার্যকরী উপায়ে ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ করতে পারে আপন আমলাতন্ত্র ও সরকারি সংস্থাগুলির সাহায্যে। বলা হয় যে এটা তখনই সম্ভব হয় যখন স্থানীয় মানুষের অভাব-অভিযোগ এবং সমস্যার প্রতি সংবেদনশীল একটি রাজনৈতিক দল পৌর প্রশাসন পরিচালনা করে যা অন্য কোনো সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়।

আবার অন্য দিকে রাজনৈতিক দলগুলির খবরদারীর সর্বব্যাপকতা স্বীকার করে নিয়েও একথা বলা যায় যে জাতীয় বা আঞ্চলিক যে স্তরেরই হোক না কেন, রাজনৈতিক দলগুলির প্রাধান্য স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে একটা উদাসীন্য লক্ষ্য করা যায়। রুর্যাল-আরবান সম্পর্ক কমিটি স্পষ্টই বলেছে যে স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার মধ্যে যখন রাজনৈতিক দল ঢুকে পড়ে, তখন স্থানীয় সমস্যাগুলি পেছনে পড়ে থাকে, রাজ্য ও জাতীয় রাজনীতির দাবীগুলিই বড় হয়ে ওঠে। এ যুক্তিটিও আবার সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। পুরসভার নির্বাচন যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন রাজ্য ও জাতীয় দলগুলির হাজার দাপাদাপি সত্ত্বেও স্থানীয় সমস্যাগুলিই গুরুত্ব পায় বেশি। বরং ঐ দলগুলি কি পরিমান স্থানীয় সমস্যা—জমি ব্যবহার সংক্রান্ত পরিকল্পনা, গরীব ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর মানুষের জন্য আবাসন বিদ্যালয় শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারলো তার উপরেই ঐ দলের রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় অবস্থান নির্ভর করবে অর্থাৎ স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধানই রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থনের ভিত্তি।

সবশেষে বলা যায় বিদ্যমান অবস্থায় পুর প্রশাসন রাজনৈতিক দলভিত্তিক। এখানে লোক বেশি পরিমানে পুর নির্বাচন ও প্রশাসনে অংশ নিতে চান এবং পুরসভার নির্বাচিত সদস্যগণও জনগণের কাছে তাদের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সজাগ কারণ তারা যে রাজনৈতিক দলের মনোনীত সেই দলের কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হয়। এ চেহারা পঃবঙ্গে আগে ছিল না। নির্বাচক মন্ডলীর আয়তন যেমন হয়েছে বিস্তৃত তেমনি পুরসভার কাজে জনগণের অংশগ্রহণও বেড়েছে। আগামী দিনগুলিতে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা অধিকতর পরিণত হবে, এমনকি রাজ্য ও পৌর নির্বাচন একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠতে পারে এবং পৌরসভাগুলির স্বয়ংশাসনের ধারণাটি একটি ব্যতিক্রমী ধারণায় পর্যবসিত হতে পারে।

১১.৬ সারাংশ

আশির দশকের শুরু থেকেই বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি প্রায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পৌরসভার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে অভিষিক্ত হচ্ছে। কিন্তু সাম্প্রতিকতম পৌরসভার নির্বাচনে বেশ কয়েকটি জায়গায় কোন্ রাজনৈতিক দল বা দলগোষ্ঠী ক্ষমতায় বসবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা যায়। এটা একদিকে যেমন প্রত্যাশিত নয়, তেমন ক্ষমতাসীন দলগুলির প্রতি সতর্কতা জ্ঞাপক। জনগণের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির সম্পর্ক যত নিবিড় হবে, আমলাতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি যত জনমুখী হবে, পৌরসভার কাজে মানুষের অংশগ্রহণ যত বাড়বে, রাজনৈতিক দলের ভূমিকাও তত বিস্তৃত হবে।

১১.৭ অনুশীলনী

১। দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :—

(ক) পঃ বঙ্গের নগর-রাজনীতি পঠন-পাঠনের প্রয়োজনীয়তা কী ?

(খ) পঃবঙ্গের নগর-রাজনীতির প্রকৃতি প্রসঙ্গে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করুন।

১১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Municipal Management and Electoral Perception—Asok Mukhopadhaya (World Press).

একক ১২ ☐ নয়া সাংবিধানিক মর্যাদা

গঠন

১২.০ উদ্দেশ্য

১২.১ প্রস্তাবনা

১২.২ ১৯৯৩ সালে পুর আইন প্রবর্তনের পূর্ববর্তী অবস্থা

১২.৩ ১৯৯২ সালের ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইন

১২.৪ ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের বিশদ আলোচনা

১২.৪.১ স্বশাসনের সংস্থাকে বলা হয় পৌরসংঘ

১২.৪.২ পৌরসংঘের গঠন

১২.৪.৩ ওয়ার্ড কমিটি

১২.৪.৪ আসন সংরক্ষণ

১২.৫ পৌরসংঘের স্থিতিকাল

১২.৬ সদস্য হবার যোগ্যতা

১২.৭ পৌরসংঘের ক্ষমতা, প্রাধিকার ও দায়িত্ব

১২.৮ কর আরোপের ক্ষমতা ও পৌর তহবিল

১২.৯ অর্থ কমিশন

১২.১০ পৌরসংঘের নির্বাচন

১২.১১ নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপে বাধা

১২.১২ জেলা পরিকল্পনা ও মহানগরী পরিকল্পনা কমিটি

১২.১৩ অর্থ কমিশন

১২.১৪ ৭৪তম সংবিধান সংশোধনের মূল্যায়ন

১২.১৫ তিনটি মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

১২.১৬ গণপ্রশাসনে বিকেন্দ্রীভূত স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্য

১২.১৭ সারাংশ

১২.১৮ অনুশীলনী

১২.১৯ গ্রন্থপঞ্জি

১২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- স্বাধীনতার পরে উপযুক্ত জাতীয় নগরায়ণ নীতি ও সংবিধান পৌর প্রশাসনের স্বীকৃতি না থাকায় পৌর প্রশাসনের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও কোনো কোনো স্থানে স্বৈরাচারিতা ও পৌর প্রশাসনের বিপর্যয়
- ১৯৯২ সালে ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইন প্রণয়নের পটভূমিকা।
- ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন প্রণয়নই কি সুশৃঙ্খল, দায়বদ্ধ, পরিচ্ছন্ন, গণতান্ত্রিক পৌর প্রশাসন প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট গ্যারান্টি ?
- স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য।

১২.১ প্রস্তাবনা

দীর্ঘদিন ধরে পৌর স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা সাংবিধানিক স্বীকৃতির মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ছিল। যেন স্বায়ত্তশাসন বলতেই বোঝায় পঞ্চায়েত বা গ্রাম প্রশাসন ব্যবস্থা। সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত শত শত শহর বা নগরের প্রশাসন কাঠামো কী হবে, তাদের কাজ কী হবে তা রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয় হিসাবে রাজ্যগুলির উপরই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে তার না ছিল কোনো সর্বভারতীয় রূপ, না ছিল স্বয়ংশাসনের অর্থবহ পরিচ্ছন্ন পরিকাঠামো এবং দায়বদ্ধতা। সর্বোপরি পৌর প্রশাসনকে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় রাজনীতির স্বাস্থ্য বৃদ্ধির 'ক্লিনিক্যাল থিয়েটার' হিসাবেই ব্যবহার করা হতো। এই অবস্থার অবসানেই ১৯৯২ সালে ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে পৌর প্রশাসনকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দান করা হয় এবং তৃণমূল স্তর পর্যন্ত প্রশাসনের বিস্তৃতির জন্য অভিনব কতগুলি ব্যবস্থার বিধান দেওয়া হয়। ঐ আইন অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৩ পুর আইন প্রবর্তিত হয় এবং তার ফলে ১৯৩২ সালের পুর আইনের আমূল পরিবর্তন সাধন করে এবং ৭৪ তম সংশোধনী আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে সম্পূর্ণ নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১২.২ ১৯৯৩ সালে পুর আইন প্রবর্তনের পূর্ববর্তী অবস্থা

ভারতীয় সংবিধানের ৪০নং ধারায় রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতির অধ্যায়ে রাজ্যগুলির হাতে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন এবং ঐ পঞ্চায়েতগুলির উপর গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসনের ভার অর্পিত হয়েছে। কিন্তু সুস্পষ্টভাবে নগর প্রশাসনের কোনো ব্যবস্থা বা জাতীয় নগরায়ণ সংক্রান্ত কোনো নীতি প্রণয়নের কথা বলা হয়নি। ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় পুর আইনের অনুসরণেই ভারতীয় সংবিধানে নগর প্রশাসনের দায়িত্ব রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় হিসাবে অর্পিত হয়েছে রাজ্য সরকারের উপর। তদনুযায়ী সংবিধানের ৭নং তপসীলের ২নং তালিকার ৫নং দফায় রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করা হয়েছে— স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ পৌর প্রশাসনের গঠন ও কাজ উন্নয়ন অছি, জেলা বোর্ড, খনি অঞ্চল কর্তৃপক্ষ এবং স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্যে অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা গ্রামীণ শাসন ("Local Government, that is to say, the constitution and powers of the municipal

corporations, improvement trusts, mining settlement authorities and other local authorities for the purpose of local self Government or village administration" (Seventh schedule, list II-state list, item-5)। তাই এরই সঙ্গে প্রচলিত আইন অনুযায়ী অন্যান্য আনুষঙ্গিক সমস্ত দায়িত্ব, যথা—নগর পরিকল্পনা, জমি অধিগ্রহণ, বাড়ী ভাড়া সংক্রান্ত সবই রাজ্যের হাতে অর্পিত হয় এবং যথারীতি বিভিন্ন রাজ্যের আর্থ সামাজিক কাঠামোর বিভিন্নতার জন্য এই আইনগুলিও বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধীন নগর ও নগর পরিকল্পনা সংস্থা (Town and country planning organisation) থাকলেও তার ক্ষমতা ছিল নিছক সুপারিশমূলক। তাই যেমন জাতীয় নগরায়ণ নীতি রচনা সম্ভব হয়নি তেমনি সারা ভারতের জন্য একটি মৌলিক ও সাধারণ নগর প্রশাসন কাঠামো গঠনও সম্ভব হয়নি। এদিকে স্বাধীনতার পরে সমগ্র দেশের উন্নয়নের জন্য একটি সমগ্র সর্বভারতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে রাজ্য সরকারগুলিও বেশি পরিমাণে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই কারণেই স্বাধীনতার পর অন্তত ২/৩ দশক ধরে ভারতীয় নগরগুলির উন্নয়ন কাঠামোর কোনো পরিবর্তন সাধন করা হয়নি। ব্রিটিশ শাসনকালেও যে কেন্দ্রীভবনের অভিযোগ ছিল তার তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন স্বাধীনতা লাভের পরেও সম্ভব হয়নি। কেবল ১৯৫৩ সালের আইনে ভোটাধিকার ২৫ থেকে ২১ শে এবং ১৯৭৮ সালে পুর আইনের সংশোধন বলে ভোটাধিকার ২১ থেকে ১৮ তে নামিয়ে আনা হয়। এই বছরেই বহু সদস্য নির্বাচন এলাকার বদলে এক সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন এলাকার বন্দোবস্ত করা হয়। যাতে প্রত্যেকটি এলাকা থেকে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব ঘটে। তার জন্য রাজ্য সরকার আইন করে নির্বাচন এলাকার সংখ্যা বাড়ায়। ১৯৮২ সালে পৌরসভার নির্বাচন এলাকার ভৌগোলিক সীমা পরিবর্তনের দায়িত্বটি স্থানীয় সংস্থার পরিচালকের (Local Board Director) হাতে অর্পিত হয়। কিন্তু সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণে একটা উদ্দেশ্যই গুরুত্ব পেত—তা হলো রাজনৈতিক স্বার্থ সাধন। পৌর ব্যবস্থার সামগ্রিক সংস্কারের কোনো পরিকল্পনা ছিল না। যখন যে কাজ করলে রাজনৈতিক স্বার্থসাধন হতে পারতো তার দিকেই নজর ছিল বেশি। পৌরসভাগুলির পরিষেবাগত মানোন্নয়নের কোনো প্রচেষ্টা ছিল না। ১৯৭২ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস ৩৯টি বিরোধী বাম-পরিচালিত পৌরসভাকে সাময়িকভাবে বাতিল ঘোষণা করে এবং বাকী বামফ্রন্ট পরিচালিত ১২টি পৌরসভা অধিগ্রহণ করে নেয়। ১৯৭৮ সালে ক্ষমতায় আসার পরে বামফ্রন্ট রাজ্যে পৌরসভাগুলির নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু ১৯৭৮ সালে বন্যা এবং ১৯৭৯ সালে আকস্মিকভাবে লোকসভা ভেঙ্গে দেওয়ার ফলে কিছু সময়ের জন্য পৌরসভার নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়। ১৯৮১ সালের ৩১ শে মে সমগ্র পঃবঙ্গের ২৭টি পৌরসভার নির্বাচন ঘোষিত হয়। এই নির্বাচনে প্রায় ৩৩% ভোট পেয়ে বামফ্রন্ট ৯২৫টি আসনে জয়ী হয় এবং ৮৭টির মধ্যে ৬৮টি পৌরসভা দখল করে নেয়। উল্লেখ করা যেতে পারে রাজ্যসরকার কর্তৃক আকস্মিক এই নির্বাচন ঘোষণার যৌক্তিকতা ও পদ্ধতিগত বিভিন্ন ত্রুটির অভিযোগ জানিয়ে কংগ্রেস পৃথক রাজনৈতিক দল হিসাবে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। বিভিন্ন কারণে এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, প্রায় ১৫ বছর পরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২০ বছর পরে, এই পৌর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। দ্বিতীয়ত, এই প্রথম একসঙ্গে ৮৭টি পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। তৃতীয়ত, এই প্রথম রাজনৈতিক দলগুলিকে স্বীয় প্রতীকে পৌর সভা নির্বাচনে অবতীর্ণ হবার অনুমোদন দেওয়া হয়। চতুর্থত, এই প্রথম ১৮ বৎসর বয়স্ক সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

দীর্ঘদিন পরে পৌরসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তাহার বিশ্লেষণ করলেই ঐ সময়ে বা তার আগে পঃবঙ্গে পৌরসভাগুলির অগণতান্ত্রিক চেহারা চোখে পরে। কংগ্রেস দলের নেতৃত্বাধীন পৌর প্রশাসনের অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারিতাই ছিল বামফ্রন্টের আক্রমণের কেন্দ্রীয় বিষয়। এ ছাড়া বামফ্রন্ট গঠনমূলক ভাবে ওয়ার্ড ভিত্তিক গণ অংশগ্রহণ, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও রাজ্য সরকার কর্তৃক পৌর সভাগুলিকে অধিকতর আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। ১৯৮১ সালের পর থেকে নিয়মিত প্রতি ৫ বছর সময় অন্তরই এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু পঃবঙ্গে পৌরসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের সাফল্যের নিরবচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও পৌরসভা পরিচালনার

ক্ষেত্রে কতগুলি সমস্যা নগর-প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছিল। পৌরসভার অধিগ্রহণ, পৌরসভাগুলির ক্ষেত্রে আর্থিক বঞ্চনা, নির্বাচিত পুর বোর্ডের সঙ্গে আধিকারিক ও পৌরকর্মীদের সম্পর্ক, পৌর নির্বাচনী ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের কারচুপি ইত্যাদি অভিযোগগুলির সত্যাসত্যকে কেন্দ্র করে পৌর প্রশাসন একটা তীব্র রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তার ফলে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার মৌলিক প্রতিশ্রুতিগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও এই ত্রুটিগুলি বিভিন্ন মাত্রায় প্রকট হয়ে পড়ে।

১২.৩ ১৯৯২ সালের ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইন

এই সমস্ত কারণেই ১৯৮৯ সালে দিল্লিতে সমগ্র ভারতবর্ষের নগর প্রশাসন প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সুবিশাল নগরপাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের প্রতিশ্রুত সিদ্ধান্তই ছিল এই যে স্বায়ত্তশাসনকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে হবে অর্থাৎ ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে হবে সেই জায়গায় যেখান থেকে ক্ষমতা উৎসারিত হয়। এই প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়নের জন্যই ১৯৯২ সালে ৭৪তম সংবিধান সংশোধন আইন প্রণোদিত হয়। এই আইনে নগর-প্রশাসন ব্যবস্থাকে সাংবিধানিক মর্যাদা দান করা হয় এবং সেই কারণেই নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়—

(ক) নির্বাচিত পৌর সংস্থাগুলির ৫ বছরের স্থায়িত্বকাল অব্যাহত রাখা।

(খ) পৌর প্রশাসন কাঠামোয় জনজাতি, উপজাতি ও মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ।

(গ) রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ তদারকি ও তত্ত্বাবধানে নিয়মিত এবং অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করা।

(ঘ) গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত পৌরসভাগুলি যাতে বাতিল না হয় সেই আশংকা নির্মূল করা।

(ঙ) ওয়ার্ড কমিটিগুলিকে বিধিবদ্ধ করা এবং আইন করে পৌরসভা ও ওয়ার্ড কমিটিগুলির কাজের ও ক্ষমতা পার্থক্যগুলি চিহ্নিত করা।

(চ) প্রতি ৫বছর অন্তর একটি অর্থ কমিশন গঠন এবং তার মাধ্যমে রাজ্য সরকারও স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির মধ্যে স্থানীয় স্তর কর রাজস্ব ও অন্যান্য রাজস্বের বিভাজন করে উভয়ের সুসম্পর্ক তৈরি করা।

(ছ) জেলা পরিকল্পনা ও মহানগর পরিকল্পনা কমিটি গঠন।

নগর প্রশাসনের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রসঙ্গে ১৯৯২ সালের ৭৪ তম সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত আইনটির বিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারে—

৭৪ তম সংবিধান সংশোধনীতে সংবিধানে ৯ নং অধ্যায়ের সঙ্গে ৯ক অংশটি সংযোজিত হয় এবং ১৯৯৩ সালের জুন মাসের ১ তারিখ থেকে তা বলবৎ হয়।

১২.৪ ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের বিশদ আলোচনা

এই কমিশনে চার ধরনের সংস্থার কথা বলা হয়েছে—

- স্বশাসনের সংস্থা।

- পরিকল্পনা রচনার সংস্থা।
- অর্থ কমিশন।
- নির্বাচন কমিশন।

১২.৪.১. স্বশাসনের সংস্থাকে বলা হয় পৌরসংঘ

পৌরসংঘ তিন ধরনের—

- নগর পঞ্চায়েত—পরিবর্তনশীল অর্থাৎ পল্লী অঞ্চল থেকে শহর অঞ্চলে রূপান্তরিত হচ্ছে এমন অঞ্চলের জন্য। পল্লী এবং পৌর এলাকার মধ্যবর্তী এলাকাগুলিতে উন্নয়নের যে তাগিদ লক্ষ্য করা যায় সেই অনুপ্রেরণাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং তাদের উন্নয়ন ও কাজের শর্তাবলীর মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়নের জন্যই নগর পঞ্চায়েত গঠিত হয়।
- পৌর পরিষদ—অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শহর এবং শহরাঞ্চলের জন্য।
- পৌর নিগম—বৃহত্তম শহরাঞ্চলের জন্য। এ ছাড়া অঞ্চলের আয়তন ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে রাজ্যপাল কোনো শহরাঞ্চল বা তার অংশকে শিল্পনগরী বলে নির্দেশ দিতে পারেন।

১২.৪.২. পৌরসংঘের গঠন

পৌরসংঘের সদস্যরা প্রত্যক্ষ নির্বাচনে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। কোনো রাজ্য আইনসভা আইন দ্বারা পৌর প্রশাসন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের, ঐ এলাকার অন্তর্ভুক্ত লোকসভা, রাজ্য সভা ও রাজ্য আইনসভার সদস্যদের এবং ওয়ার্ড কমিটির সভাপতিদের প্রতিনিধিদের ব্যবস্থা করতে পারেন।

১২.৪.৩ ওয়ার্ড কমিটি

তিন লক্ষ বা তার চেয়ে বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট পৌরসংঘের আঞ্চলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত ওয়ার্ডগুলির প্রত্যেকটির জন্য ওয়ার্ড কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক। ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনের বিধান অনুযায়ী ওয়ার্ড কমিটির গঠন, আঞ্চলিক সীমা এবং আসন পূর্ণ করার পদ্ধতি সম্পর্কে রাজ্য আইনসভা আইন প্রণয়ন করবে। ওয়ার্ড কমিটি ছাড়াও রাজ্য বিধান মন্ডল অন্যান্য কমিটিও গঠন করতে পারে।

১২.৪.৪. আসন সংরক্ষণ

৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুযায়ী পঞ্চায়েত স্তরে জনজাতি ও উপজাতিদের জন্য যে ভাবে আসন সংরক্ষিত হয়েছে ঠিক একই ভাবে যে কোনো পৌরসংঘে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে আসন সংরক্ষণ করতে হবে—

ক) নির্দিষ্ট পৌর এলাকায় মোট জনসংখ্যার যে অনুপাতে লোক জনজাতি ও উপজাতির মোট আসনের সেই আনুপাতিক আসন জনজাতি ও উপজাতীয় অধিবাসীগণের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। অন্যান্য আসনের মতো সেই আসন গুলিরও ভোটারগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে পূর্ণ করতে হবে এবং বিভিন্ন নির্বাচনের সংরক্ষিত

আসনগুলি আবর্তাকারে বিভিন্ন ওয়ার্ডের মধ্যে বন্টিত হবে। সংরক্ষিত আসনগুলির $^{১}/_{৩}$ অংশ জনজাতি ও উপজাতীয় মহিলার প্রতিনিধিত্ব সংরক্ষিত করতে হবে। একই সঙ্গে জনজাতি ও উপজাতীয় মহিলা সংরক্ষণ সহ মোট আসনের $^{১}/_{৩}$ অংশ মহিলা আসনে যাতে মহিলার প্রতিনিধিত্ব ঘটে তারও বন্দোবস্ত করতে হবে। পৌর সংঘগুলির সভাপতি পদও কীভাবে জনজাতি, উপজাতি ও মহিলার জন্য সংরক্ষিত থাকে রাজ্য আইনসভা আইন করে তারও বন্দোবস্ত করবে। অনুন্নত শ্রেণির জন্যও রাজ্য আইনসভার বিধি অনুযায়ী আসন সংরক্ষিত হতে পারে।

১২.৫ পৌরসংঘের স্থিতিকাল

প্রত্যেক পৌরসংঘ তার প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে ৫ বছর কাল বহাল থাকবে। তার আগেও কোনো পৌরসংঘ ভেঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এভাবে ভেঙ্গে দেবার আগে তাকে তার বক্তব্য পেশ করার ন্যায়সংগত অধিকার দিতে হবে এবং ভেঙ্গে দেবার তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন সম্পূর্ণ করতে হবে। ভেঙ্গে দেবার পর নূতন যে পৌরসংঘ গঠিত হবে তা কেবল অবশিষ্ট কালের জন্যই বহাল থাকবে। তবে অবশিষ্ট কাল যদি ৬ মাসের কম হয় তা হলে আর নির্বাচনের প্রয়োজন হবে না। বলবৎ হওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট বিধি সংশোধন করে এমন বন্দোবস্ত করাই যায় যাতে কোনো পৌরসংঘ ৫ বছর স্থিতিকালের আগে না ভাঙ্গে।

১২.৬ সদস্য হবার যোগ্যতা

যাঁরা রাজ্য আইন সভায় সদস্য হবার যোগ্য তাঁরাই কোনো পৌরসংঘের সদস্য হতে পারেন। তবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্থক্য হলো এই যে সংবিধান অনুযায়ী রাজ্য আইন সভার সদস্য হতে গেলে ২৫ বছর পূর্ণ হওয়া চাই। কিন্তু পৌরসংঘের সদস্য হতে গেলে ২১ বছর পূর্ণ হলেই চলবে। সদস্যপদে অযোগ্যতার প্রশ্নে সেই আইনই প্রযোজ্য যা রাজ্য আইন সভার সদস্য পদের জন্য প্রয়োগ করা হয়।

১২.৭ পৌরসংঘের ক্ষমতা, প্রাধিকার ও দায়িত্ব

পৌরসংঘগুলি যাতে প্রকৃত স্বশাসনের অধিকারী হতে পারে এবং প্রকৃত অর্থে ক্ষমতার ও দায়িত্বের যাতে বিকেন্দ্রীভবন ঘটতে পারে তার জন্য রাজ্য আইনসভা প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন পাস করে শর্তসাপেক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ব্যায়বিচার সম্পর্কিত পরিকল্পনা এবং দ্বাদশ তফশীলে বর্ণিত বিষয়গুলি সম্পর্কেও পরিকল্পনা রূপায়ণে পৌরসংঘগুলিকে ক্ষমতা প্রদান করতে পারে।

১২.৮ কর আরোপের ক্ষমতা ও পৌর তহবিল

রাজ্য আইনসভা বিধি দ্বারা কোনো পৌরসংঘকে কর, শুল্ক, উপশুল্ক (tolls) এবং ফী আরোপ, আদায় এবং উপযোজন করার দায়িত্ব দান করতে পারে। ঐ বিধিতে তার সীমা ও পদ্ধতিরও নির্দেশ দান করতে পারে। রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন কর, শুল্ক, উপশুল্ক ও ফি আদায় আরোপ এবং উপযোজনের দায়িত্ব রাজ্য সরকার

আইন করে পৌরসভাকে দিয়ে দিতে পারে। রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল থেকে পৌরসভাগুলির অনুদান দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারে। সুনির্দিষ্ট আইন অনুযায়ী পঞ্চায়েতের আদায়ীকৃত ও প্রাপ্ত সব অর্থ দিয়ে একটি পৌর তহবিল গঠিত হতে পারে সেখানে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ পুরসভার পক্ষে অর্থ জমা দিতে ও অর্থ উত্তোলন করতে পারে।

১২.৯ অর্থ কমিশন

২৪৩ ক ধারায় একটি অর্থ কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে। এই অর্থ কমিশন পৌরসভাগুলির আর্থিক অবস্থা সমীক্ষা করবে এবং নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে সমীক্ষা করবে—

(ক) রাজ্য সরকার কর্তৃক ধার্য কর, শুল্ক, উপশুল্ক ও ফ্রী থেকে প্রাপ্ত আয়ে পৌরসভাগুলির দাবির হার সম্পর্কিত নীতি।

(খ) রাজ্য সরকারের কোন কোন কর, শুল্ক, উপশুল্ক ও ফী এর অংশ পৌরসংঘগুলিকে দেওয়া যেতে পারে তার নীতি।

(গ) পৌরসংঘগুলিকে দেয় সহায়ক অনুদান সম্পর্কিত নীতি।

(ঘ) পৌরসংঘগুলির আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

(ঙ) রাজ্যপাল কর্তৃক নির্দিষ্ট অন্য কোনো বিষয়।

এই সমস্ত বিষয়গুলি ছাড়াও পৌরসংঘের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য রাজ্যপাল কমিশনের উপর নূতন দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে।

৭৪ তম সংবিধান সংশোধনের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো রাজ্য আইনসভা কর্তৃক পৌর প্রশাসনের আয় ব্যয় সম্পর্কিত হিসাব-নিকাশ পরিচালনা ও সমীক্ষার ব্যবস্থা করা।

১২.১০ পৌরসংঘের নির্বাচন

পৌরসংঘের নির্বাচক সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় যথা, নির্বাচক তালিকা প্রস্তুত করা এবং নির্বাচন পরিচালনা, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ অনুযায়ী হবে পৌরসংঘের নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের বা আইন প্রণয়নের অধিকার রাজ্য আইনসভাকে দেওয়া হয়েছে।

১২.১১ নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপে বাধা

নির্বাচন ক্ষেত্রের সীমানির্দেশ অথবা আসন বন্টনের বিষয়ে প্রচলিত আইনের বৈধতা বিচারের কোনো এক্তিয়ার এই আইন বর্ণিত আদালত ছাড়া অন্য কোনো আদালতের থাকবেনা। সংশ্লিষ্ট রাজ্য আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন অনুযায়ী যে কোনো নির্বাচনী বিতর্ক বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনের ভিত্তিতেই বিতর্কের নিষ্পত্তি করতে হবে। এ ছাড়া কোনো পৌর নির্বাচন সম্পর্ক প্রশ্ন বা বিতর্ক উত্থাপন করা যাবে না।

১২.১২ জেলা পরিকল্পনা ও মহানগরী পরিকল্পনা কমিটি

৭৪ তম সংবিধান সংশোধনে পৌরসংঘগুলিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়াও জেলা স্তরে জেলা পরিকল্পনা কমিটি ও মহানগর স্তরে মহানগর পরিকল্পনা কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। এইসব কমিটির গঠন এবং আসন পুর্নাদি সম্পর্কিত বিষয় রাজ্য আইনসভা আইন করে স্থির করবে। তবে মোট সদস্য সংখ্যার ৫ ভাগের ৪ ভাগ নির্বাচন করবেন ঐ জেলার পঞ্চায়েত ও পৌরসভার নির্বাচিত সদস্যগণ। মহানগর পরিকল্পনা কমিটি গঠনের সময় মোট সদস্য সংখ্যার ৩ ভাগের ২ ভাগ নির্বাচিত করবেন পুর নিগমের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ এবং ঐ মহানগর এলাকার অন্তর্গত পুরসভার নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ।

রাজ্য আইনসভা আইন করে স্থির করে দেবেন জেলা কমিটি জেলা পরিকল্পনা সংক্রান্ত কোন কোন কাজ করবে এবং জেলা কমিটিগুলির সভাপতি কি ভাবে নির্বাচিত হবেন।

মহানগর কমিটি গোটা মহানগর এলাকার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করবে। রাজ্য আইনসভা আইন প্রণয়ন করে এই কমিটিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের এবং অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করবে এবং মহানগর এলাকার পরিকল্পনা রচনা ও সমন্বয় সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করবে। মহানগর কমিটির সভাপতি কীভাবে নির্বাচিত হবেন। তাও রাজ্য আইনসভা আইন করে স্থির করবে। সমগ্র উন্নয়ন পরিকল্পনাটিকে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠাতে হবে।

১২.১৩ অর্থ কমিশন

২৮০ ধারা বলে নিযুক্ত অর্থ কমিশনের উপর রাজ্যের পৌর সংঘগুলির ঘাটতি পূরণের জন্য রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণে উপযুক্ত সুপারিশ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

১২.১৪ ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনের মূল্যায়ন

যে সমস্ত পৌরসংঘগুলি ৭৪ তম সংবিধান সংশোধন আইন প্রণয়নের আগেই বর্তমান ছিল তাদের প্রচলন ও পরিচালনার উপর ঐ সংশোধিত কোনো বাধানিষেধ জারি করেনি। বাস্তবিক পক্ষে তা পারেও না, কারণ স্বায়ত্তশাসন রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়। কিন্তু ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইন প্রবর্তনের এক বছরের মধ্যে ঐ সংশোধনী আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধক সংশোধনী সংযোজিত করার সুযোগ রাজ্য আইনসভাগুলিকে দেওয়া হয়েছিল। পঃবঙ্গ পুর আইনটি ১৯৯৩ সালে প্রণীত হওয়ার ফলে পূর্ব প্রণোদিত ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের প্রাসঙ্গিক সমস্ত অংশটিতেই গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, ঐ সংশোধনী আইনের সঙ্গে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করে ১৯৯৪ সালের ২২ শে মার্চ পঃবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন আইন এবং ২০ শে জুলাই পঃবঙ্গ পৌর নির্বাচন আইন প্রণয়ন করে।

১২.১৫ তিনটি মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

এই দুটি প্রশ্নের উত্তরে প্রশাসন বিশেষজ্ঞগণ তিনটি মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন—

প্রথমত, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা দানে সংবিধানের ৪০ নং ধারা এবং ৭ম তফশীলের ২নং তালিকার ৫নং দফায় একটা মর্যাদার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি তালিকাবদ্ধ করার সময় যদি পঞ্চায়েত, পৌরসভা, অছি পরিষদ, জেলা বোর্ড, খনি এলাকা বা অন্যান্য সমস্ত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে বোঝায়, তাহলে রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতির ৪০ নং ধারায় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের উদাহরণে কেবল পঞ্চায়েতের উল্লেখ কেন? এই অসম্পূর্ণতা থেকে ভবিষ্যতে অনেক বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ব্রাজিল সংবিধানের অনুকরণে আপন আপন দায়িত্ব পরিচালনীয়, কর রাজস্বের ব্যবস্থাপনায় এবং আপন কর্মীবৃন্দের নিয়োগ এবং অন্যান্য কাজের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণে স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির স্বশাসনের প্রতিশ্রুতি দান করে সংবিধানে একটি পৃথক ধারা সংযোজিত হওয়া প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, ৭ম তফশীলে বর্ণিত রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকার পাশাপাশি সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি স্থানীয় তালিকা (Local List) সংযোজিত করা প্রয়োজন এবং সেখানে ২ নং, ৩নং ও ৪নং তালিকা থেকে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিকে স্থানীয় তালিকা করা উচিৎ, নতুবা বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়াটি দুর্বল হয়ে পড়বে।

১২.১৬ গণ প্রশাসনে বিকেন্দ্রীভূত স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্য

গণ প্রশাসনে বিকেন্দ্রীভূত স্বায়ত্তশাসনের ৩ ধরনের উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়—

(ক) রাজনৈতিক ঃ তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্রের প্রসার, পৌর পরিষেবার জন্য জনগণের হাতে ক্ষমতা দান, জাতীয় লক্ষ্য সাধনের অনুকূল সামাজিক, রাজনৈতিক, নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয় প্রতিনিধিত্ব, পরিকল্পনা কর্মসূচি রূপায়ণ, গণ পরিষেবার কাজে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও জনসেবার কাজে সরকারী সম্পদের সমবন্টন।

(খ) প্রাতিষ্ঠানিক ঃ স্থানীয় সমস্যাও স্বার্থসাধনে স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির অধিকতর সচেতনতা, পৌরসভার অধিক পরিমাণ স্বয়ংশাসনের ক্ষমতা ও দায়বদ্ধতা, পরিষেবা উৎপাদন ও বিতরণে বেসরকারি ব্যক্তি ও সংস্থার সাহায্য গ্রহণ।

(গ) অর্থনৈতিক ঃ স্থানীয় স্তরে উৎপাদন ও পরিষেবা বৃদ্ধির কাজে উৎপাদন ব্যয় ও পরিষেবা সৃষ্টির তুলনামূলক সমীক্ষা, স্থানীয় স্তরে সৃষ্টি পরিষেবাগুলি যাতে স্থানীয় মানুষের উপকারে লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখা, জনগণের চাহিদা ও অগ্রাধিকার অনুযায়ী পরিষেবা সৃষ্টি ও বন্টন, পৌর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি, স্থানীয় সম্পদ ও সংগ্রহ বৃদ্ধি এবং বাড়তি সম্পদের অপচয় প্রতিরোধ, আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণে ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ সৃষ্টির কাজে অনুপ্রাণিত করা, পৌর প্রশাসনের কাজে রাষ্ট্র বা রাজ্যের অর্থ তহবিল কীভাবে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলিকে হস্তান্তর করা যায় তার জন্য উপযুক্ত নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা ভাবা।

বিকেন্দ্রীকরণের উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি যে পরিমাণে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে সেই পরিমাণেই স্বায়ত্তশাসন অর্থপূর্ণ হবে। সুতরাং সরকার, আমলা, সংবিধান ও গণ প্রশাসন বিশেষজ্ঞদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে সংহত করতে হবে বিকেন্দ্রীভূত গণতান্ত্রিক কাঠামো ও আদর্শগুলির রূপায়ণের জন্য।

১২.১৭ সারাংশ

দীর্ঘদিন পর্যন্ত ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় পুর আইন দিয়েই স্বাধীনতা লাভের পরেও পঃবঙ্গে পুর প্রশাসন ব্যবস্থা চলত। এমনকি স্বায়ত্তশাসন বলতে যে পৌর প্রশাসনকেও বোঝায় সংবিধানে স্বায়ত্তশাসনের এমন কোনো সংজ্ঞাও দেওয়া হয়নি। নিছক রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় হিসাবে রাজ্য আইন দ্বারাই পৌর প্রশাসন পরিচালিত হতো। এর ফলে স্বায়ত্তশাসনের নামেও চলছিল নানারকম অনিয়ম ও বিচ্যুতি। তারই অবসানে ১৯৯২ সালে ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইন প্রণোদিত হয় ও তার সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে ১৯৯৩ সালে পঃবঙ্গের পৌর প্রশাসন আইন সম্পূর্ণ নব কলেবরে প্রণীত হয়। ৭৪ তম সংবিধান সংশোধন আইন ও ১৯৯৩ পঃবঙ্গ পুর আইনের অভিনব বৈশিষ্ট্যগুলি হলো—পৌর সভাগুলির স্থায়িত্বকাল সুনিশ্চিত করা, পশ্চাদপদ শ্রেণীর মানুষের জন্য সংরক্ষণ, ওয়ার্ড ও ওয়ার্ড কমিটিগুলিকে বিধিবদ্ধ করা, রাজ্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক পৌর নির্বাচন নির্দেশনা, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা, অর্থ কমিশন গঠন এবং পৌরসভাগুলির আর্থিক প্রশাসনকে সুদৃঢ়, স্বয়ংনির্ভর ও পরিচ্ছন্ন করার জন্য অর্থ কমিশনকে ক্ষমতা দান, জেলা পরিকল্পনা ও মহানগর পরিকল্পনা কমিটি গঠন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সাংবিধানিক সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে গণপ্রশাসন বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন না, সর্বোপরি মনে রাখতে হবে স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণের যে আঙ্গিক সম্পর্ক আছে তার কার্যকারিতা নির্ভর করবে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গী ও সচেতনতার উপর, প্রয়োজনভিত্তিক পরিষেবা বন্টনের উপর এবং সভাগুলির আর্থিক স্বয়ম্ভরতার উপর।

১২.১৮ অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিস্তৃত আলোচনা করুন ঃ-

(ক) ১৯৯২ সালে প্রণোদিত ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের অভিনব বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

(খ) ১৯৯৩ সালের পঃবঙ্গ পুর আইন প্রবর্তনের আগে পঃবঙ্গের পৌর প্রশাসন ব্যবস্থার বিস্তৃত আলোচনা করে তার ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন।

(গ) ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মূল্যায়ন করুন।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দান করুন ঃ-

(ক) ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইন প্রণয়নের পূর্ববর্তী অবস্থাকালে পৌর প্রশাসনের তিনটি ত্রুটি চিহ্নিত করুন।

(খ) ৭০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পঃবঙ্গে পৌর প্রশাসনের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র দান করুন।

(গ) আপনার মতে ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি কী ?

(ঘ) পৌরসংঘ বলতে কী বোঝায় ?

(ঙ) পৌরসভা ও পুরনিগমের মধ্যে পার্থক্য কী ?

(চ) ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের ওয়ার্ড কমিটিগুলির সাংবিধানিক স্বীকৃতিটি কী ?

(ছ) ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইনে সংরক্ষণ সম্পর্কিত ব্যবস্থার আলোচনা করুন।

(জ) ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইনে নবগঠিত অর্থ কমিশনের কাজগুলি আলোচনা করুন।

৩। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ-

(ক) পুরসভায় সদস্য নির্বাচিত হতে গেলে প্রার্থীর ন্যূনতম বয়স কত হওয়া দরকার ?

(খ) ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইন প্রণয়নের পূর্বেও সাংবিধানের কোথায় পৌর প্রশাসনের উল্লেখ ছিল এবং এখনও আছে তা সঠিক ভাবে চিহ্নিত করুন।

(গ) পৌরসংঘ বলতে কোন্ কোন্ সংস্থাকে বোঝায় ?

(ঘ) পৌরসংঘগুলির নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব কার ?

(ঙ) একটি পুরসভার মোট আসনের কত অংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ?

(চ) একটি পৌরসংঘের স্থিতিকাল কত বছর ?

১২.১৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. The Constitution of India 2000, Govt. of India, Ministry of Law, Justice & Company Affairs.— Part IX-A The Municipalities Act 243 P----243 Z. G.
2. The West Bengal Municipal Act, 1993.
3. The Calcutta Municipal Corporation Act, 1980.

একক ১৩ ☐ মহিলা ও স্বায়ত্তশাসন

গঠন

১৩.০ উদ্দেশ্য
১৩.১ প্রস্তাবনা
১৩.২ উন্নয়ন দেশগুলিতে মহিলা প্রতিনিধিত্ব সংরক্ষণে বাধা
১৩.৩ ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় পরম্পরাগতভাবে মহিলাদের মর্যাদা ও অবস্থান
১৩.৪ গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনে মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে সাংবিধানিক ব্যবস্থা
১৩.৫ গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় মহিলা প্রতিনিধিত্ব সংরক্ষণের ইতিহাস
১৩.৬ মহিলা প্রতিনিধিত্ব সংরক্ষণে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইন
১৩.৭ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে মহিলা প্রতিনিধিত্ব সংরক্ষণ ব্যবস্থা
১৩.৮ পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত রাজ ও মহিলা সংরক্ষণ ব্যবস্থা
১৩.৯ মূল্যায়ন
১৩.১০ সারাংশ
১৩.১১ অনুশীলনী
১৩১২ গ্রন্থপঞ্জি

১৩.০ উদ্দেশ্য

ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে (Part-IV) রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতির ৪০ নং ধারায় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা হিসাবে উপযুক্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বসহ পঞ্চায়েত গঠনের কথা বলা হয়েছে এবং গ্রামভারতের বিপুল সংখ্যক মানুষের পঞ্চায়েতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে অর্থবহ করে তোলার জন্য ভারতীয় সংবিধানেও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় মহিলা প্রতিনিধিত্বের তাৎপর্য, বাস্তব অবস্থা ও মহিলা সংরক্ষণ ব্যবস্থার ইতিহাস ও গুরুত্ব এই এককে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১৩.১ প্রস্তাবনা

বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হল মহিলা। অথচ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে মহিলাদের শতকরা হার একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য। এমনকি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধাত্রী বলে পরিচিত ইংল্যান্ডে ১৯৭৪ সালে কমন্সসভায় ৬৩৫ জন সাংসদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা ছিল মাত্র ২৭ জন। কারণ হিসাবে বলা হয়, রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় পুরুষদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের দাবি ছিল সক্রিয় রাজনীতি কেবল পুরুষের জন্য। স্ত্রীজাতির মধ্যেও এ ব্যাপারে খুব একটা ইতিবাচক ভূমিকা ছিল না। ১৯৮০ সালে বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের সাংসদ সংখ্যার মাত্র ১০ ভাগ ছিল মহিলা এবং জাতীয় মন্ত্রীসভার সদস্যগণের তুলনায় এই সংখ্যা ছিল ৪%। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৫-র দশকে মহিলা উন্নয়নের দশক হিসাবে ঘোষণা করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে তথ্য প্রকাশ করেছে তা স্ত্রীজাতির প্রতি তীব্র অসম আচরণের রূঢ় বাস্তবতাকেই প্রকাশ করে। মহিলাদের অবস্থান সম্পর্কিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এই

প্রতিবেদনে বলা হয়—বিশ্বে সাম্যের মানদন্ড বিপর্যস্ত হয়েছে। মহিলাগণ যেখানে বিশ্বের সমগ্র ক্রিয়াকান্ডের দুই-তৃতীয়াংশের উৎপাদক, সেখানে তারা উৎপাদিত আয়ের শতকরা মাত্র ১০ ভাগের অধিকারী এবং উৎপাদনের শতকরা মাত্র ১ ভাগের অধিকারী। উন্নত শিল্পায়ত দেশেও পুরুষদের আয়ের অর্ধেকের চেয়েও কম হল মহিলাদের আয়।

১৩.২ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মহিলা সংরক্ষণের বাধা

মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়টি গুরুত্ব পায় বিংশ শতাব্দীতে এবং তা ১৯৭৫ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জর স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৮৫ সালে নাইরোবি সম্মেলনে সমস্ত স্তরে নির্বাচনের ক্ষেত্রে ৩৫% ভাগ মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে। সেখানে নানা ধরনের সামাজিক সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অভাব এবং আইনানুগ সমস্যা মহিলাদের সরকারি কাজে অংশগ্রহণের পথে ব্যাপক প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। মহিলাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং অগ্রাধিকারের প্রশ্নটি সামগ্রিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়। গ্রামীণ অর্থনীতিতেও মহিলাদের একটি বিস্তৃত ভূমিকা আছে। কিন্তু গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশের আলোচনার ও প্রকৃত বাস্তবতার সে ভূমিকাও উপেক্ষিত হয়েছে। যারা মহিলাদের এই ভূমিকাকে সমর্থন করেন তাদের অভিমত এই যে, ৯০-এর দশক থেকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্র ধীরে ধীরে কমে যাওয়ার ফলে কাঠামোগত সামঞ্জস্য সাধনের নতুন যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তার ফলে নারী উন্নয়ন বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। নবম পরিকল্পনাধীন সময়ে নারী উন্নয়নের উপর পর্যবেক্ষণকারী একটি কর্মীগোষ্ঠীর (Working Group) প্রতিবেদনে দেখা যায় যে প্রচন্ড বঞ্চনার মধ্যে মহিলাগণ কেবল বেঁচে আছে মাত্র। এই সময়কালের একটি পরিসংখ্যানে লক্ষ্য করা যায় যে ৯৬% ভাগ মহিলা কর্মী আছে অসংগঠিত ক্ষেত্রে। মহিলা শ্রমিকদের অধিকাংশই নিযুক্ত আছে অসংগঠিত কৃষিক্ষেত্রে এবং ৯০-এর দশক থেকে প্রকৃত অর্থে এই কৃষি মজুরীর ক্রমাগত কমে যাওয়ার ফলে মহিলারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশি। ১৯৯০ সালের ৩১ শে মার্চেও রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা যেখানে ছিল ১১%, দশ বছরের মধ্যেই তা কমে হল ৫.৮%। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, গার্হস্থ্য জগতের যে সমস্ত ক্ষেত্রে মহিলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের একচেটিয়া অধিকার থাকা দরকার সেখানেও তারা সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত। অথচ জাতীয় আন্দোলনে মহিলাদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। কেবল লবণ সত্যাগ্রহের ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায় মোট ৩০,০০০ আটক সত্যাগ্রহীদের মধ্যে ১৭,০০০ ছিলেন মহিলা। ১৯২১ সালে মাদ্রাজে মহিলাগণ প্রথম ভোটাধিকার অর্জন করে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে মহিলাগণ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ভোটাধিকার অর্জন করে এবং ১৯৪০ সালের মধ্যেই সর্বভারতীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভায় মহিলা প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা হয় ৮০ জন। ১৯৫২ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত মহিলা প্রতিনিধিত্বের হার নিম্নরূপ—

সংসদ—৮৮% (৪৪/৫৪৪)

রাজ্য আইনসভা—৯.১১%

২০০২ সালে মানব উন্নয়ন সংক্রান্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিবেদনে লক্ষ্য করা যায় যে, সারা পৃথিবীতে সংসদের নির্বাচিত কক্ষে মহিলাগণের প্রতিনিধিত্বের হার হল ১৪% এরও কম। কেবলমাত্র উন্নত ১০টি দেশে এই হার হল ৩০%। তেমনি অন্তত ১০টি দেশে সংসদে একজনও মহিলা সদস্য নেই। ১৯৯৫-২০০০ সালের মধ্যে ১০৩ টি দেশে মহিলা প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা বেড়েছে। অন্তত ১৭টি দেশে অবস্থা অপরিবর্তিত রয়ে গেছে এবং আরো বিস্ময়কর হল এই যে, ৪০টি দেশে মহিলা প্রতিনিধিত্বের হার কমে গেছে। মহিলাদের অধিকতর প্রতিনিধিত্বদানে

ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেও সদিচ্ছার অভাব লক্ষ করা যায়। ১৯৮৪ সালেই রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মহিলা প্রতিনিধি মনোনয়নের হার ছিল ৮.১% এবং ১৯৫২ সাল থেকে রাজনৈতিক দলগুলি কর্তৃক মহিলা প্রার্থী মনোনয়নে এই হারই হল সর্বাধিক। সাম্প্রতিককালে লোকসভায় বিবেচনাধীন মহিলা আসন সংরক্ষণের প্রস্তাবটিও রাজনৈতিক কৌশল ও দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জটিল ঘূর্ণাবর্তেই আবদ্ধ হয়ে আছে।

১৩.৩ ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় পরম্পরাগতভাবে মহিলাদের মর্যাদাগত অবস্থান

পুরুষদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে মহিলাদের স্তরনির্দেশ বা সম্মানই মহিলাদের সামাজিক অবস্থান সূচিত করে। জন্মের পর থেকেই সামাজিকীকরণের বিভিন্ন স্তরে একটি কন্যা সন্তান ও পুত্র সন্তান যেভাবে বেড়ে ওঠে, তাকে কেন্দ্র করেই তাদের নিয়ে গড়ে ওঠে সমাজের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের ভারতীয় সমাজে সেইভাবেই গড়ে উঠেছে পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তানদের জন্য পৃথক পারিবারিক অবস্থান—পুত্রদের ক্ষেত্রে পরিবারের বংশরক্ষা ও নরক থেকে ত্রাণের গৌরব ; আর কন্যাদের ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর বাড়ির গাছে জলসিঞ্চনের মতো অপচয় ও অপ্রয়োজনীয়তার অধঃপতিত আবদ্ধ অবস্থা। বৈদিক সমাজে নারীর মর্যাদা ছিল ; গার্হস্থ্য কাজে, ধর্মচর্চায়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে তাদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লোপামুদ্রা, অপলা প্রভৃতি সাধ্বী মহিলাগণ যাগযজ্ঞ পূজার্চনা করতেন। অসবর্ণ বিবাহের উল্লেখ পাওয়া গেলেও সাধারণভাবে জাতের বাইরে ভিন্ন গোত্রে বিবাহ এবং এক বিবাহের প্রচলন ছিল। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিতে মৃত স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। সন্তানহীন বিধবা স্বামী সম্পত্তির উত্তরাধিকার অর্জন করতেন। অবিবাহিতা কন্যা পূর্বপুরুষের সম্পত্তির অংশ ভোগ করত। বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত সকল মহিলাই স্বাধীনভাবে বৃত্তি অবলম্বন করতে পারতেন। শিক্ষিত পরিবারে মহিলাগণ লেখাপড়া শিখে সমাজে সম্মানজনক স্থান অর্জন করতেন।

মহিলাদের এই স্বাধীন ও সম্মানজনক সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে পরবর্তী সময়ে হিন্দুসূত্রের অনুশাসনে। হিন্দুসূত্র বেদের অনুসারী দাবি করলেও আসলে বেদের মূল ভাগের পরিবর্তন সাধন করেছে। এই সময় থেকেই স্ত্রী স্বামীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ; স্বামী ছাড়া স্ত্রী ধর্মীয় অধিকার সমাজ কেড়ে নেয়। মহিলা তার সামাজিক সম্মান ও বৈষয়িক উত্তরাধিকার হারায়। মনুর সুস্পষ্ট আদেশ ছিল—"যে মহিলা তার নাথকে যে পরিমাণ সেবা করবে সে তত ঈশ্বরের কাছে যাবে।" একমাত্র স্বামীর সুখ সাধনাই হল মহিলার একমাত্র কর্তব্য। তার আর পৃথক কোনো স্বাধীন জগৎ থাকবে না। মহাভারতে দ্রৌপদীর এই অবস্থাই আমরা দেখি। সে পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী। এবং শকুনির সঙ্গে পাশাখেলায় যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বাজি রাখছেন। স্মৃতিশাস্ত্রে বাল্যবিবাহ এবং সতীপ্রথার উল্লেখ লক্ষ করা যায়। বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। এইভাবে পরবর্তীকালে বা পুত্র সন্তানের সামাজিক ও পারিবারিক গুরুত্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি কন্যা সন্তানগণ সমাজের বোঝা হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে।

মধ্যযুগে এই অবস্থার আরো অধঃপতন ঘটে। সমাজে মহিলাগণের বৌদ্ধিক অবস্থান সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত হয়। গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে তারা বন্দী হয়ে পড়েন। মহিলাদের লেখাপড়া নিষিদ্ধ হয়। বাল্যবিবাহ ও সতীর প্রথার বহুল প্রচলন হয়। অনূঢ়া মেয়েরা বাড়ির এবং পিতামাতার নির্লজ্জ বোঝায় পরিণত হয়। যারা সতীপ্রথা অবলম্বন করে স্বামীর চিতায় মরতে পারতো না তাদের দারুণ কষ্টে দিনাতিপাত করতে হত। সেইসময় বহু বিবাহ ও কৌলিন্য প্রথার দরুন এক একজন পুরুষ শতাধিক মহিলার স্বামী হিসাবেও থাকতে পারতেন। মহিলাদের এই অধঃপতিত অবস্থা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্তও চলতে থাকে। রামমোহনই ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি মহিলাদের এই শোচনীয় অবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি একই সঙ্গে সতীপ্রথা এবং বহু বিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র

প্রতিবাদ শুধু করেন। পরে এই প্রতিবাদী ভূমিকার নেতৃত্ব দান করেন বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ব্রাহ্মসমাজ এবং আর্যসমাজ এগিয়ে আসে সমাজ সংস্কার এবং মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধির দাবি নিয়ে। তাই ব্রিটিশ সরকার কতগুলি সমাজ সংস্কার আইন প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়। যথা—লর্ড বেন্টিঙ্কের নেতৃত্বে ১৮২৯ সালে সতীপ্রথা নিষিদ্ধ করা, ১৮৬১ সালে হিন্দু ফৌজদারি আইন প্রণয়ন, ১৮৯১ সালে বিবাহে সম্মতিজ্ঞাপন আইন পাশ এবং ১৯২৯ সালে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন, ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন এবং ১৯২৫ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন প্রবর্তন। কিন্তু এতগুলি আইন প্রবর্তনের পরেও মহিলাদের সামাজিক অবস্থার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। কারণ, আইন প্রবর্তিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সদিচ্ছার অভাব ছিল। ১৯২৯ সালেও ব্রিটিশ সরকার মহিলা প্রতিনিধিত্বকে একটি পশ্চাদভিমুখী প্রচেষ্টা বলেই মনে করতেন।

১৩.৪ স্বাধীন ভারতে মহিলাদের মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধিতে সাংবিধানিক ব্যবস্থা

স্বাধীন ভারতবর্ষই প্রথম সামাজিক বিপ্লব ঘটানোর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে এবং ১৯৪৮ সালে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত কমিটি স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকার করে। পুরুষের সঙ্গে মহিলার ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় সংবিধানে ৩২৫ ও ৩২৬নং ধারায়। মহিলাদের সামাজিক অর্থনৈতিক ও ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি দান করা হয় সংবিধানের প্রস্তাবনায়। দেওয়া হয় চিন্তার, মতপ্রকাশের অধিকার, আইনের চোখে সাম্য এবং পুরুষের সঙ্গে সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকার। লিঙ্গজনিত বৈষম্য নিষিদ্ধ হয় এবং লোকসভা ও বিধানসভার প্রতিনিধি নির্বাচনের ও নির্বাচিত হবার সমান সুযোগ লাভ করে মহিলাগণ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত সকল মহিলা উন্নত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা লাভের সুযোগ পায়নি। অবশেষে ১৯৫৫-৫৬ সালে লোকসভায় হিন্দু কোড বিল নামক আইনটি প্রবর্তিত হলে ভারতীয় মহিলাগণ বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, দত্তকগ্রহণ, অভিভাবকত্ব ইত্যাদি বিষয়ে অধিকতর অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভে সমর্থ হয়। সেই সঙ্গে পর পর বেশ কয়েকটি শিল্প ও শ্রমিক আইন প্রবর্তন ও সংস্কারের মাধ্যমে শ্রম ও শ্রমিক ব্যবস্থায় মহিলাগণ উন্নততর জীবনযাপনে সমর্থ হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আইনগুলি হল—

(ক) ১৯৪৮ সালের কারখানা আইন (The Factories Act, 1948)

(খ) ১৯৫২ সালের খনি আইন (The Mines Act, 1952)

(গ) ১৯৪৮ সালের কর্মচারীদের রাজ্য বিমা আইন (The Employees State Insurance Act, 1948)

(ঘ) ১৯৫৬ সালের মহিলা ও বালিকাদের উপর নিন্দাই অত্যাচার নিরোধ আইন (The Suppression of Immoral Traffic on women and girls' Act, 1956)

(ঙ) ১৯৬১ সালের মাতৃত্ব জনিত সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত আইন (The Maternity Benefit Act, 1961)

(চ) ১৯৭৬ সালের সম-পারিশ্রমিক আইন (Equal Remuneration Act, 1976)

কন্যা সন্তানগণের শিক্ষাদীক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার মহিলাদের জন্য একদিকে যেমন প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ দানে সচেষ্ট হন, তেমনি মহিলাদের জন্য প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। সেই সঙ্গে শিশুদের যত্ন, শিশুস্বাস্থ্য, পুষ্টিকর খাদ্য, খাদ্য উৎপাদন, কারিগরি শিল্প ইত্যাদি বিষয়েও মহিলাদের প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে উপযুক্ত শিক্ষাদান করা হচ্ছে। ১৯৬৬ সালে শ্রম দপ্তরের অধীনে সমাজ উন্নয়ন দপ্তর নামে একটি পৃথক

দপ্তর তৈরি হয়েছে এবং এই দপ্তর মহিলা কল্যাণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই দপ্তর শহর ও গ্রামের মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গ্রামের মহিলাদের জন্য যে সমস্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় সেগুলি হল—স্বাস্থ্য পরিষেবা, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প সম্পর্কে প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, সামাজিক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ ইত্যাদি। অন্যদিকে শহরাঞ্চলে মহিলাদের জন্য সাক্ষরতা, শিক্ষা, উদ্বাস্তু মহিলাদের পুনর্বাসন, ছোটো ছোটো হস্তজাত শিল্পে উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ, জেলবন্দী মহিলাদের কল্যাণকারী কর্মসূচি ইত্যাদি সম্প্রতি সংহত শিশু উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে প্রাক্-বিদ্যালয় স্তরে শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য ও যত্ন করার জন্যও মহিলাদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, শুধু সরকার নয়, ভারতে বহু বেসরকারি সংস্থাও মহিলা উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

১৩.৫ গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় মহিলা সংরক্ষণ ব্যবস্থার ইতিহাস

বলবন্ত রাও মেহতা কমিটির সুপারিশই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার জন্ম দেয়। কিন্তু ঐ কমিটি পঞ্চায়েতে মহিলাদের অংশগ্রহণের উপর খুব একটা গুরুত্ব আরোপ করেনি। কেবল মহিলা উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য গ্রামসেবিকা এবং মহিলা সমাজ উন্নয়ন আধিকারিক নিয়োগ এবং সেই সঙ্গে পঞ্চায়েত স্তরে ২ জন মহিলা সদস্যা মনোনয়নের সুপারিশ ছিল বলবন্ত রাও মেহতা কমিটির প্রতিবেদনে। অর্থাৎ মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে এই কমিটির সুপারিশও যথেষ্ট রক্ষণশীল ছিল। সমাজ উন্নয়নে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের যে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা আছে ঐ কমিটি সে কথা ভাবতেই পারেনি। তাদের কাছে তখনও মহিলাগণ ছিল অন্তঃপুরচারিণী। স্বাভাবিক কারণেই পঞ্চায়েতে মহিলা মনোনয়নের পদ্ধতিটি একটি ব্যর্থ প্রয়াসে পর্যবসিত হয়। দেখা যায়, মনোনীত মহিলাগণ শক্তিশালী সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক গোষ্ঠীর ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। ১৯৭৮ সালে অশোক মেহতা নেতৃত্বাধীন পঞ্চায়েতরাজ কমিটি, কিন্তু পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের সুদৃঢ় ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই কমিটির সুপারিশেই বলা হয় যে, যদি পঞ্চায়েতি নির্বাচন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ মহিলা প্রতিনিধিত্ব না ঘটে, তাহলে ২ জন মহিলাকে মনোনীত করতে হবে ; অর্থাৎ পুরুষদের সঙ্গে মহিলাগণও যে প্রার্থীপদ দাখিল করে পঞ্চায়েতি শাসনে নির্বাচিত হয়ে আসতে পারেন, অশোক মেহতা কমিটিই কিন্তু প্রথম তা সুপারিশ করে। মহিলা প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে এই কমিটির আরো দুটি সুপারিশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত কোনো বিজয়ী মহিলা প্রার্থী না থাকলেও মহিলা বিজিত প্রার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন এমন ২ জন মহিলাকে পঞ্চায়েত কমিটিতে আসন দান ; দ্বিতীয়ত মহিলা ও শিশু উন্নয়ন প্রশ্নে কেবল মহিলাদের দ্বারা গঠিত একটি কমিটি গঠন। অশোক মেহতা কমিটি গ্রাম ও শিল্পের বিকাশে এই মহিলা মণ্ডলের বিশেষ গুরুত্বের কথা বললেও মহিলা প্রতিনিধিত্ব গ্রামীণ প্রশাসনে কোনো উল্লেখযোগ্য মাত্রা অর্জন করতে পারেনি এবং দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে ও সরকারি কাজকর্ম পরিচালনায় স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারের বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে যায়।

১৯৭৪ সালে প্রথম পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মহিলাদের অংশগ্রহণের এবং মর্যাদার প্রশ্ন ওঠে। সেখানেও মহিলা এবং শিশু বিকাশ ও উন্নয়নের প্রশ্নে কেবল মহিলা সদস্যবিশিষ্ট পঞ্চায়েত গঠনের কথা ওঠে। আশা করা হয় এই ধরনের কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমেই স্ত্রীজাতি তার চিরাচরিত শোষণের হাত হতে মুক্তি পাবে এবং তারা নিজেদের সমস্যাগুলির কথা সুস্পষ্টভাবে বলতে পারবে। এই সংস্থাটিকে অত্যন্ত কার্যকরী করে তোলার জন্য প্রস্তাব হয় যে, সমস্ত পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব ও সচিবগণ পদাধিকার বলে এই সংস্থার সদস্য হবেন। ১৯৭৪ সালে

গঠিত এই কমিশনের প্রস্তাব কোনো আইনী মর্যাদা লাভ করেনি। অন্যদিকে, এই কমিশনের প্রস্তাব থেকে বোঝা যায় স্বাধীনতার দু দশক পরেও পুরুষপ্রধান সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের অবস্থান ছিল অবহেলিত।

১৯৭৮ সালে অশোক মেহতা কমিটিও পঞ্চায়েত সংস্থাগুলিতে সিদ্ধান্ত নির্ণায়ক প্রক্রিয়ায় মহিলাদের সুদৃঢ় ভূমিকার কথা বলেন। এই কমিটিই মহিলাদের জন্য দুটি আসন সংরক্ষণের সুপারিশ করেন এবং তা ছাড়াও যথেষ্ট মহিলা প্রতিনিধিত্ব না ঘটলে মহিলা মনোনয়নের কথা বলেন। মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রশ্নে এই কমিটি পঞ্জাব পঞ্চায়েত সমিতি ও ১৯৬১ সালের জেলা পরিষদ আইনের চিন্তা ভাবনার সামিল হয়ে এমনও সুপারিশ করেন যে পরাজিত হলেও প্রতিদ্বন্দ্বী মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট প্রাপক দুজন মহিলা সদস্যকে সংরক্ষিত আসন দুটিতে সদস্য করা হবে। মেহতা কমিটি এই পদ্ধতিটিকে নির্বাচনের সাহায্যে মনোনয়ন বলেছেন। সাধারণ আসন সংখ্যার অতিরিক্ত এই দুটি আসন মোট আসনের সঙ্গে যুক্ত হবে। নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ আসনের সঙ্গে যুক্ত হবে এই সংরক্ষিত আসনগুলি। তাছাড়া এই কমিটি মণ্ডল পঞ্চায়েত স্তরে সমস্ত নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের নিয়ে তৈরি একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রয়োজনের কথাও বলেছেন। মহিলা ও শিশু কল্যাণ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচিই হবে এদের প্রধান আচরণ। গ্রামীণ উন্নয়নে মহিলা মণ্ডল ও মহিলাদের অধিকতর কর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে এই কমিটি গ্রামীণ শিল্পায়নের বিষয়ে মহিলাদের অংশগ্রহণের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সম্পদ সংগ্রহ এবং পরিষেবা উন্নয়নের কাজেও অশোক মেহতা মহিলা মন্ডলের সুপারিশ করেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে এত গুরুত্ব আরোপ করা সত্ত্বেও অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশগুলির কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছিল না।

বলা হয় যে, মহিলাদের যথেষ্ট রাজনৈতিক শিক্ষা এবং রাজনৈতিক দল ও মহিলা সংগঠনগুলিতে মহিলাদের সর্বাধিক অংশগ্রহণের বিষয়ে মনোযোগী না হলে মহিলাদের সামাজিক উৎপাদন ক্ষমতা মোটেই গড়ে উঠবে না। এই প্রতিবেদনে মহিলাদের রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধির প্রশ্নটিকেই আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানের মৌলিক ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচিত হয়। কিন্তু এইবারেও সংবিধানে সমানাধিকারের দোহাই দিয়ে এই কমিটি রাজনৈতিক দলগুলির উপরে যথেষ্ট মহিলা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়।

মহিলাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থাটি নিছক একটি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচিত হয় এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে অধিক পরিমাণ মহিলা প্রতিনিধিত্বের আহ্বান জানিয়েই কমিটি তার দায় সারে। এই কমিটির আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল যে, মহিলাদের সামাজিক অনগ্রসরতার প্রশ্নে তারা রক্ষণশীল ছিলেন। মহিলাদের একটি পৃথক বর্গে ভাগ করে সমাজে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মতো মহিলাদের পশ্চাৎপদ বলতে এই কমিটি রাজী হয়নি। সাধারণভাবে মহিলাদের অবস্থান ছিল পুরুষদের সমগোত্রীয়। কাজেই মহিলাদের সংরক্ষণের কোনো যুক্তিনিষ্ঠ ভিত্তি নির্দেশ তারা করতে পারেনি।

১৯৮৮ সালে মহিলাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত জাতীয় পরিকল্পনায় তৃণমূল স্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি আলোচিত হয়। ঐ উদ্দেশ্যেই রচিত একটি কেন্দ্রীয় গোষ্ঠী রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অধিকতর অংশগ্রহণকেই জাতি গঠনে, মহিলাদের সমানাধিকারের প্রধান নির্ধারক বলে গণ্য করেন। এই কমিটির সুপারিশগুলি হল—

(ক) গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে জেলা পরিষদ পর্যন্ত সমস্ত গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন সংস্থার মহিলাদের জন্য ৩০% সংরক্ষণ।

(খ) গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন সংস্থার সমস্ত স্তরের প্রশাসন বিভাগেরও ৩০% মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ।

(গ) শুধুমাত্র মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের দ্বারাই নিম্নতম স্বায়ত্তশাসন সংস্থা ও তাদের প্রশাসন দপ্তর তৈরি করতে হবে।

১৯৮৮ সালের জাতীয় পরিকল্পনায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে এই কমিটির সদস্য নির্মলা দেশপাণ্ডের মন্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন ঃ সংরক্ষণ মহিলাদের সামাজিক অবস্থানকে হেয় প্রতিপন্ন করে। কাজেই তিনি পঞ্চায়েতে অংশগ্রহণের প্রশ্নে সংরক্ষণকে উপযুক্ত পথ বলে মনে করেননি। তার জায়গায় তিনি চেয়েছিলেন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধগুলি সম্পর্কে সাধারণভাবে সকল মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি। সামগ্রীক এই চেতনার সম্প্রসারণই মহিলাদের সামজিক মর্যাদার উন্নয়ন ঘটাবে।

কিন্তু কমিটির অধিকাংশ সদস্যই নির্মলা দেশপাণ্ডের এই ধারণা সমর্থন করেননি। তাদের বক্তব্য হল আমাদের এই পুরুষশাসিত সনাতন সমাজব্যবস্থায় গার্হস্থ্য গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই মহিলাদের প্রধান কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়। মহিলারাও নিজে থেকে বেরিয়ে এসে পঞ্চায়েত প্রশাসনে অংশগ্রহণ করবে না, তাই প্রয়োজন সংরক্ষণের।

আবার যারা মহিলা সংরক্ষণের বিরোধিতা করেন তাদের যুক্তি হল—

(১) পঞ্চায়েত প্রশাসনে মহিলাদের আসন সংরক্ষণ গার্হস্থ্য কাজকর্ম, বিশেষ করে শিশু সন্তানদের লালন-পালনে বিঘ্ন ঘটাবে। পঞ্চায়েতে অংশগ্রহণের অর্থই হল জনসাধারণের সমস্যাগুলি জানা এবং তা সমাধানে সক্রিয় নেতৃত্ব দান। এর ফলে সারাদিনের একটা বড় সময় তাদের বাড়ির বাইরে থাকতে হবে এবং ঘরের কাজকর্ম, ব্যবস্থাপনা ও শান্তি ব্যাহত হবে।

(২) মহিলাগণ বাড়ির বাইরে গ্রামের সমস্যার মধ্যে যত অন্তর্ভুক্ত হবে, স্বার্থান্বেষী ও সমাজ-বিরোধীদের আক্রমণের মুখোমুখি হবে তত বেশি। এই বাধা পুরুষ প্রতিনিধি যত দক্ষতা ও বাধাহীনভাবে দূর করতে পারবে, মহিলাগণ কিছুতেই তা পারবে না। এছাড়া আছে সমাজে একশ্রেণির মানুষের হীন মানসিকতা যার শিকার হবে ঐ মহিলা প্রতিনিধিগণ এবং তার ফলে সমাজের স্থিতি ব্যাহত হবে।

(৩) মহিলা প্রতিনিধিগণ পঞ্চায়েত প্রশাসনের দায়িত্ব পেলেও বিভিন্ন ব্যাপারে তারা পুরুষদের উপর যেভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে অথবা প্রচলিত পঞ্চায়েতি ব্যবস্থাতেও পুরুষগণ যেভাবে মহিলা সদস্যাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেন তাতে মহিলাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব অর্থহীন হয়ে পড়ে।

(৪) অনেকে মনে করেন, সমাজে স্ত্রী-পুরুষ অসাম্য যে অবস্থায় এসেছে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব দান করলেই তার সমাধান হয়ে যাবে—এমন ভাবার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু এই সমস্ত যুক্তিগুলি তাঁরাই দেন যাঁরা সামাজিক স্থিতাবস্থার সমর্থক এবং তাঁর অন্তিম পর্যায়ে পুরুষশাসিত সমাজ অথবা তার চেয়েও নিকৃষ্ট কোনো জাতপাতের শাসনকেই প্রশ্রয় দেন। গোষ্ঠীপতিশাসিত আমাদের এই সমাজের বনিয়াদকে ভাঙতে হলে স্ত্রীজাতির সংরক্ষণ অপরিহার্য। মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব যেমন দরকার, তেমনি মনে রাখতে হবে যেকোনো প্রশাসনিক দায়িত্বে মহিলাদের অংশগ্রহণ এই প্রশাসনের গুণগত উৎকর্ষতা বিধান করে। রাজনৈতিক ক্ষমতায় এবং উন্নয়নের উৎসস্থলে মহিলাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ মহিলাদের সামাজিক অবস্থানকে অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ করবে এবং তার ফলে গৃহাভ্যন্তরে ভারসাম্যহীন স্ত্রী-পুরুষ যে সম্পর্ক আছে তারও রূপান্তর ঘটবে।

১৩.৬ মহিলা সংরক্ষণে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইন

১৯৯০ সালে ৬৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনের প্রস্তাবে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণকে প্রথম সাংবিধানিক মর্যাদা দেবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয় ঃ পঞ্চায়েতের সমগ্র আসন সংখ্যার ৩০% আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হবে (জনজাতি ও উপজাতি মহিলাদের জন্য ৩০% আসন সংরক্ষণ সহ) এবং পঞ্চায়েতের বিভিন্ন নির্বাচন এলাকায় অর্থাৎ বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে আবর্তাকারে তা প্রযুক্ত হবে। যেখানে জনজাতি ও উপজাতির জনসংখ্যার জন্য মাত্র দুটি আসন সংরক্ষিত সেখানে ১টি আসন ঐ পশ্চাৎবর্তী শ্রেণির মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের কথা বলা হয়। কিন্তু রাজ্যসভায় যথেষ্ট সংখ্যক সমর্থন না থাকায় এবং ব্যবস্থাটির প্রয়োগ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সারা দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ হওয়ায় সংশোধনী প্রস্তাবটি সংসদে অনুমোদিত হয়নি, যদিও নীতিগতভাবে মহিলা সংরক্ষণের বিষয়টি সার্বিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

পঞ্চায়েতে মহিলাদের আসন সংরক্ষণ ও মহিলাদের সাংবিধানিক মর্যাদা বৃদ্ধির দিকচিহ্ন হিসাবে পরিগণিত হয় ৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইন। পূর্ববর্তী ৬৪তম সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাবেতেই আনুষ্ঠানিক সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া হয় এই আইনে। এই সংবিধান সংশোধনী আইন অনুযায়ী ঃ

(১) প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব স্থিরীকৃত হবে পঞ্চায়েত ও পৌর প্রশাসনের এমন মোট আসনের ১/৩ অংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হবে। সংরক্ষিত মহিলা আসনের ১/৩ অংশ জনজাতি ও উপজাতির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হবে এবং এই সংরক্ষিত আসন পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামসভা এলাকা এবং পৌরসভার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে আবর্তাকারে বন্টিত হবে।

(২) পঞ্চায়েত ও পৌরসংঘগুলির প্রধানগণেরও (যথা, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, পৌরসংঘগুলির চেয়ারপার্সন) মোট আসনের ১/৩ অংশ জনজাতি, উপজাতির জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং তার ১/৩ অংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

সুস্পষ্টভাবেই বলা যায় ৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইনটি মহিলা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। প্রতিনিধিত্বের পূর্ববর্তী ব্যবস্থার মধ্যে একটি আমূল পরিবর্তন এনেছে। ৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইন গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে মহিলা প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা ৯,৮৮,১০৬, যা মোট নির্বাচিত আসনের ৩৫.৯২%। পঞ্চায়েত সমিতি বা তালুক স্তরে এই প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা হল ৫৯,৬৮৮ অর্থাৎ মোট নির্বাচিত আসনের ৪০.১৪% এবং সর্বোচ্চ জেলা পরিষদ স্তরে এই সংখ্যা হল ৬,০১৬ অর্থাৎ ৩৯.৩৭%।

১৩.৭ ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে মহিলা প্রতিনিধিত্ব সংরক্ষণ ব্যবস্থা

মহিলাদের সংরক্ষক বিষয়ক বিস্তৃত ব্যবস্থাদির মূল্যায়নের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্যান্য রাজ্যে এই সংরক্ষণের ব্যবস্থা ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এবিষয়ে দুটি পর্যবেক্ষক দলের সমীক্ষার সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে—

(১) Participatory Research in Asia (PRIA)

(২) National Commission on Women

প্রশাসনিক কাজে মহিলা প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাত্রা ও ভূমিকার উপর প্রথম গবেষণাকারী দলটি ভারতের ছয়টি রাজ্যে পর্যবেক্ষণ চালিয়েছে। এই ছটি রাজ্য হল—মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, কেরালা, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ এবং হিমাচলপ্রদেশ। এদের পর্যবেক্ষণ থেকে লক্ষ করা গেছে—

(ক) গ্রামসভাগুলি ডাকা হয়েছে খুব কম এবং যে অল্প সংখ্যক গ্রামসভা ডাকা হয়েছে তা ঐ মহিলা সরপঞ্চের পুরুষ আত্মীয়গণের উদ্যোগেই।

(খ) মহিলাদের অংশগ্রহণ খুব নগণ্য এবং মহিলাদের সম্পর্কিত সমস্যাগুলি আলোচনা হয়নি বললেই চলে।

(গ) কেরালায় অবশ্য ছবিটি বিপরীত। পুরুষপ্রধান শাসিত পঞ্চায়েতের চেয়ে মহিলা প্রধান শাসিত পঞ্চায়েতগুলি অনেক সক্রিয় এবং ঐ মহিলা প্রধান পঞ্চায়েতগুলি আহুত সভার সংখ্যাও বেশি এবং সভায় আলোচিত বিষয় ও সমস্যার বৈচিত্র্যও অনেক বেশি কারণ হিসাবে বলা হয়েছে মহিলাগণ অনেক বেশি সংবেদনশীল। এই প্রবণতা মধ্যপ্রদেশের মহিলা সরপঞ্চশাসিত পঞ্চায়েত সংস্থাগুলিকেও অনেক বেশি দায়িত্বশীল, সক্রিয় ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে।

(ঘ) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেখানে প্রধান হলেন একজন মহিলা, সেখানে তার সচিব হলেন একজন পুরুষ। এই সচিবগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এবং এইসব ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত প্রধানের সক্রিয়তা অনেক বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। দীর্ঘদিনের নানারকম সামাজিক প্রথা এবং রীতিনীতি এই সম্পর্কে আরো তিক্ত করেছে। তবে এইসব ক্ষেত্রেও প্রাথমিক দ্বিধাগ্রস্ততা এবং মেলামেশার প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে উঠে পঞ্চায়েত প্রধানগণ ব্লক স্তরে সরকারি কর্মভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

উপরি-উল্লিখিত পর্যবেক্ষকগোষ্ঠী (PRIA) ১৯৯৭ সালে ছ'টি রাজ্যের ১৪৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্মের নিবিড় বিশ্লেষণ করে ঐ পঞ্চায়েতগুলির কাজকর্মের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উপাদানগুলি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা লক্ষ করেছেন যে—

(ক) ব্যক্তিগত স্তরে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা, দায়িত্ব পালনের পূর্ব অভিজ্ঞতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং পারিপার্শ্বিক স্তরে পরিবার ও স্বামীর সমর্থন এবং সেই সঙ্গে পঞ্চায়েত ও জনসমাজের উৎসাহ মহিলা প্রধান কর্তৃত্বাধীন পঞ্চায়েতগুলির ইতিবাচক ভূমিকার কারণ, অন্যদিকে নিরক্ষরতা, লজ্জা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং ঊর্ধ্বতন স্তরে সরকারি কর্মচারীদের নিস্পৃহতাই মহিলা প্রধান কেন্দ্রিক পঞ্চায়েতগুলির হতাশাব্যঞ্জক ভূমিকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২০০১ সালে জাতীয় মহিলা কমিশন ৬টি রাজ্যের মহিলা-প্রধান পঞ্চায়েতগুলির কার্যক্রমের মূল্যায়ন করে বলেন যে—

রাজনৈতিক ক্ষমতায় অংশগ্রহণের ফলে ঘরে-বাইরে মহিলাদের মর্যাদা বেড়েছে। পুরুষরা তাদের সঙ্গে পরামর্শ করছে এবং নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিগণ পঞ্চায়েত প্রশাসনে উত্তরোত্তর গুরুত্ব অর্জন করছে।

শ্রীমতী নির্মলা বাচ (Nirmala Buch) নামে একজন গবেষক তাঁর লেখা Women's Experience in New Panchayats : the Emerging Leadership of Rural women নামক প্রবন্ধে তিনটি রাজ্যের সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে দেখিয়েছেন, পঞ্চায়েত স্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেড়েছে। তিনি দেখিয়েছেন পঞ্চায়েতে পুরুষদের উপস্থিতির হার যেখানে ৬৮.৪%, মহিলাদের উপস্থিতির হার সেখানে ৫৫.৪% থেকে ৭৪.৪%। পঞ্চায়েতের দায়-দায়িত্ব এবং কাজকর্ম সম্বন্ধে তাঁদের সচেতনতা এবং জ্ঞানও যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক।

ভারতবর্ষে পঞ্চায়েত স্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণের একটি রাজ্যভিত্তিক আলোচনা করা যেতে পারে।

তামিলনাড়ু ঃ গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা হল ৪১,৯৫০ অর্থাৎ সমগ্র পঞ্চায়েত আসনের ৩৩.৩%। তালুক বা মধ্যবর্তী স্তরে এই সংখ্যা হল ২,১৬৮ বা ৩৩.৩% এবং উচ্চতম জেলা পরিষদ স্তরে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা হল ২১৬ বা ৩৩.৩% পরিবার, জনসমাজ, রাজনৈতিক দল, জাতপাত, এমনকি নিজেদের গোষ্ঠীনেতাদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ পাবার ফলে প্রায় ৪০% মহিলা বাড়ির বাইরে এসে আপন আপন দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হতে পেরেছেন। সরকারি প্রতিনিধির সঙ্গে পঞ্চায়েতের মহিলা প্রতিনিধিগণের সম্পর্ক ও সহযোগিতা অবশ্য প্রশ্নাতীত নয়। বিশেষ করে পঞ্চায়েতের দলিতশ্রেণির মহিলা প্রতিনিধিগণের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীগণের দ্বারা অপমানিত ও নিগৃহীত হবার ঘটনাও ঘটেছে। নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিগণকে অনেক সময়ই পরিবার, স্বামী অথবা সমর্থনকারী জাতপাতের প্রত্যাশার কাছে নতি স্বীকার করতে হয়।

কেরলা ঃ গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা হল ৩,৯৫৪ এবং তা মোট আসনের ৩৭%। তালুক স্তরে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা হল ৫৬৪ বা ৩৬.৪৬%। সর্বোচ্চ জেলা পরিষদ স্তরে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা হল ১০৫ এবং তা সমগ্র আসন সংখ্যার ৩৫%। 'সহায়ী' নামক একটি সংস্থার সমীক্ষায় লক্ষ করা যায় যে, মহিলা প্রতিনিধিগণের ৬০% প্রতিনিধি পারিবারিক ও স্বামীর রাজনৈতিক কাজকর্মের প্রভাবেই নির্বাচিত। সমীক্ষার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন হল পঞ্চায়েত আইনের সংশোধন এবং দায়-দায়িত্বের সম্প্রসারণের ফলে মহিলা প্রতিনিধিত্ব পারিবারিক ক্ষেত্রে অনেক জটিলতার সৃষ্টি করেছে, বিশেষ করে চাকুরিরত মহিলা, গৃহস্ত্রী, পঞ্চায়েতের সদস্যা বা সভাপতি ইত্যাদি যেকোনো দুটি ভুমিকায় প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে ছোটো পরিবারে সন্তান প্রতিপালন এবং তাদের বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া বা নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বিরাট সাংসারিক সঙ্কট তৈরি হয়েছে। সমীক্ষক দলের অনেকে যেমন একদিকে মহিলা প্রতিনিধিগণের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি লক্ষ করেছেন, তেমনি অন্যদিকে জনসেবামূলক নানা কাজে লিপ্ত থাকার দরুন তাদের আর্থিক অবস্থার অবনতিও লক্ষ করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায় যে অতিরিক্ত রাজনৈতিক প্রভাব পিতামাতা ও স্বামীর বা আত্মীয়স্বজনের চাপের জন্যই তারা স্বাধীনভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ২০০০ সালে তিরুবনন্তপুরমে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণ নিয়ে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে যে সমস্যাগুলি বিশেষ আলোকপ্রাপ্ত হয় সেগুলি হল—

(ক) নির্বাচিত পদাধিকারীদের হৈচৈ এবং দড়ি টানাটানির জগতে অনেক মহিলাই আসতে চান না।

(খ) দুই একটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত অবস্থায় ঘরের কাজ অবহেলিত হবার কারণ দেখিয়ে স্বামী তার স্ত্রীকে পঞ্চায়েতের চলতি সভার মধ্যে থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসেছে।

অন্ধ্র ঃ ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের পূর্বে নিম্নবর্ণিত হারে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল—

গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা ৯ বা তার কম হলে ২ জন

" " " ১০-১৫ " ৩ "

" " " ১৫-র বেশি " ৪ "

অন্ধ্রপ্রদেশ পঞ্চায়েত আইনে ২২.২৫% হারে মহিলা আসন সংরক্ষিত রাখার কথা বলা আছে। মধ্যবর্তী মণ্ডল প্রজা পরিষদ এবং উচ্চতম জিলা প্রজা পরিষদ স্তরেও মহিলাদের আসন আইন দ্বারা সংরক্ষিত আছে এবং এইসব ক্ষেত্রে সভাপতি ও চেয়ার পার্সনদেরও ৯% আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের সরপঞ্চ

সম্বন্ধে এই সংরক্ষণ ছিল না। তারা কেবল গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে নির্বাচিত হবার সুযোগ পেতেন। ১৯৮১ সালে নরসিংহম কমিটি প্রথম পঞ্চায়েত সরপঞ্চগুলির ৫% মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের সুপারিশ করে। এই কমিটিও মধ্যবর্তী এবং উচ্চতম স্তরে পদাধিকারীদের মধ্যে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাধাপ্রাপ্ত করেছে। অন্ধ্রপ্রদেশ মণ্ডল প্রজা পরিষদের ১৮ জন মহিলা সভাপতির একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে রেড্ডি এবং কাপু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব ঘটেছে যথাক্রমে ৩৮.৯% এবং ২২.২% হারে। সচ্ছল এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে থেকে এই প্রতিনিধিত্বের হার হল যথাক্রমে ৬৬.৭% এবং ৩৩.৩%। এই সমীক্ষায় আরো দেখা যায় যে, এই সমগ্র সংখ্যার মধ্যে মাত্র ২৭.৮% মহিলা সভাপতি হিসাবে নিজে থেকে স্বাধীনভাবে সভা পরিচালনার কাজ করতে পারেন। সংবিধান সংশোধিত হবার পরে অন্ধ্রপ্রদেশে মহিলা প্রতিনিধি সংখ্যা বেড়েছে। সাম্প্রতিক একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ৭৫,৫১৩ জন মহিলা প্রতিনিধি আছেন যা সমগ্র সদস্য সংখ্যার ৩২%। তালুক স্তরে আছেন ৪,৭৭৬ অর্থাৎ ৩২.৬% এবং জেলা পরিষদ স্তরে আছেন ৩৬১ জন অর্থাৎ সমগ্র সংখ্যা ৩৩.০২%।

কর্ণাটক ঃ বিভিন্ন স্তরগুলির নাম হল জেলা স্তরে জেলা পরিষদ, মধ্যবর্তী স্তরে তালুক পঞ্চায়েত সমিতি, নিম্নতম স্তরে মণ্ডল। এছাড়া আছে ন্যায় পঞ্চায়েত। ৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইনের পূর্বে ২৫% মণ্ডল প্রজা পরিষদে এবং জেলা পরিষদের আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। তার মধ্যে মাত্র ১টি আসন সংরক্ষিত ছিল জনজাতি ও উপজাতিদের জন্য। ১৯৮৭-৯০ সালে ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল সাইন্স কর্তৃক গৃহীত সমীক্ষায় দেখা যায় যে, নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের ৬০% আসে ভোক্কালিঙ্গা এবং লিঙ্গায়েত নামক দুটি আধিপত্য বিস্তারকারী জাত থেকে। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনেই কেবলমাত্র মহিলাগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগিয়ে আসে। সাধারণ আসনে নয়। পারিবার বা তাদের স্বামীর কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থনের উপর ভিত্তি করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যগণ নির্বাচিত হন। সভায় হাজিরা দেওয়া ছাড়া অন্য সময় মহিলা সদস্যগণ জেলা পরিষদ অফিসে যান না। অনেক সময়ই তারা পুরুষ সদস্যদের গাড়িঘোড়াতেই যাতায়াত করেন ; এমনকি পুরুষ সদস্যদের পীড়াপীড়িতেই সভাকক্ষে তারা কথা বলেন, নচেৎ চুপচাপ থেকেছেন।

তবে গত দু' বছর ধরে গবেষকরা লক্ষ করছেন যে মহিলা সদস্যগণ বিভিন্ন আইনকানুন জানার চেষ্টা করছেন এবং সক্রিয়ভাবে সভা পরিচালনায় এবং বিভিন্ন সমস্যাদি সমাধানে অংশগ্রহণ করছেন। এমনকি মহিলা সদস্যদের দায়িত্বশীলতার প্রশংসা করে ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল সাইন্স স্টাডি ট্রাস্ট উল্লেখ করেন যে, বঙ্গারাপ্পা সরকার যখন পঞ্চায়েতগুলির কাজকর্ম সাময়িক বন্ধ করে দেয় তখন মহিলা সদস্যগণ সদাজাগ্রত প্রহরার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কতগুলো কমিটি তৈরি করে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম চালাতে থাকে।

মহারাষ্ট্র ঃ ১৯৮৩ সালে হ্যাজেল ডি. লিমা (Hazal D' Lima) মহারাষ্ট্রের সব কটি পঞ্চায়েতের মহিলা সদস্যদের কাজকর্মের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত তৈরি করতে পেরেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(ক) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বামীর উদ্যোগ ও প্রেরণাতেই তারা নির্বাচনে নাম দিয়েছেন, নিজেদের প্রতিভা গুণে নয়।

(খ) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ করা গেছে মহিলা সদস্যগণ আহুত সভার কর্মসূচিগুলি পর্যন্ত পড়তে পারছেন না এবং পুরুষ সদস্যদের তুলনায় হীনমন্যতায় ভুগছেন।

(গ) প্রায় ৭০% মহিলা সদস্য বৃহৎ ভূমি সম্পদের মালিক।

এর সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল মহিলা জনজাগরণের দু'একটি অনুপম ক্ষেত্র, যথা চিপকো আন্দোলন এবং ৪২-এর আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শ্রীমতী ঊষা নিকম কর্তৃক কেবলমাত্র মহিলাদের দিয়ে রচিত সংগঠন প্রস্তুত

করা। ১৯৮৯ সালে অমরাবতী জেলার মাটিখাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতটি কেবল মহিলা সদস্য দ্বারা গঠিত হয়। কিন্তু ১৯৯৫ সালে পুণে, লাটুর এবং ওসমানাবাদ জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতে মহিলা সদস্যদের পঞ্চায়েতের কাজকর্মে অংশগ্রহণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। পুণেতে মহিলা সদস্যগণের কাজকর্ম সন্তোষজনক হলেও, লাটুর এবং ওসমানাবাদে না আছে সংরক্ষণ না দেখা গেছে মহিলাদের সচেতনতা। পুণেতে মহিলা সদস্যগণ ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ তৈরি করে মদের দোকানগুলি বন্ধ করে দিতে সমর্থ হয়েছেন ; নির্বাচনের সময় সকলে মিলে মঞ্চে দাঁড়িয়ে জনগণের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। মহিলা সদস্যগণ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, মুক্ত বিদ্যালয় এবং নানা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করছেন। অন্যদিকে লাটুর এবং ওসমানাবাদে লক্ষ্য করা গেছে মহিলা সদস্যদের চরম নিষ্ক্রিয়তা এবং পঞ্চায়েতি কাজকর্মের মৌলিক ধারণার অভাব।

রাজস্থান ঃ ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল স্টাডি ট্রাষ্ট উদয়পুরের থাডোল ব্লকের ৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে লক্ষ করেছেন প্রায় সব কটি ক্ষেত্রেই পুরুষ সদস্যদের নামে, এমনকি তাদের পোস্টার দেখিয়েই, মহিলা সদস্যগণ জয়লাভ করেছেন। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যদের সুস্পষ্ট প্রতিবাদী মানসিকতা লক্ষ করা গেছে। এমনকি খাজনা অনাদায়ী থাকার জন্য স্বামী ও শ্বশুরের বিরুদ্ধে পর্যন্ত নোটিশ জারি করেছেন ; দলবদ্ধভাবে মাঠে নেমে গিয়ে আল কেটে দেবার সাহস ও স্বাধীনচিত্ততা লক্ষ্য করা গেছে। একটি ক্ষেত্রে ওলাব দেবী নামে এক সরপঞ্চের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনলে মহিলা সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। অবশেষে জাতপাতের বাহানা দেখিয়ে কোর্টে গেলে সেখানেও ওলাব দেবী স্থগিতাদেশ পেয়েছেন।

হরিয়ানা ঃ ১৯৯৭ সালে মার্গ (MARG) নামক একটি সংস্থা কামাল জেলার ১২৮ জন মহিলা সদস্যদের নিয়ে একটি সমীক্ষা করেন। এই সমীক্ষাতেও মহিলা সরপঞ্চ সহ সমস্ত মহিলা সদস্যদের মধ্যে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে একদিকে যেমন অজ্ঞতা লক্ষ করা যায়, অন্যদিকে স্বামীদের প্রভাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী শক্তিরই প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।

উত্তরপ্রদেশ ঃ গঙ্গো ক্ষিত্র (Gangoh Kshitra) পঞ্চায়েতের একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রায় ৬৫১ জন উপস্থিত মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যর সাক্ষাৎকারে দেখা যায় এর মধ্যে ৮০% দুর্বলতম শ্রেণির যাদের মধ্যে আবার প্রায় সকলেই নিরক্ষর। পঞ্চায়েতের সভায় তাদের আহ্বান জানানোই হয় না ; জানালেও আলোচনায় অবহেলিত হয় এবং তাদের এমন অবস্থা যে সভায় ডাক পেলে স্বামী বা পুরুষ সদস্যদের কাছ থেকে যাতায়াতের ভাড়া চেয়ে নিতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীর পরিচয়েই তারা পরিচিত এবং স্বামীর সমর্থন ভিত্তিই তাদের জয়ের পথ নিশ্চিত হয়। কতগুলি ক্ষেত্রে সরকারি আমলাদের কাছ থেকে মহিলা সদস্যদের সঙ্গে উন্নাসিক অসহযোগিতার অভিযোগও পাওয়া গেছে। মহিলা প্রধানগণ আর্থিক দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না বলে অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক বা তহবিল পরিচালনা দায়িত্ব তাদের দেওয়া হয় না। মীরাটের গ্রামে একদল মানুষের প্রধানপতি নামে একটা পৃথক পরিচয় গড়ে উঠেছে। এরা মহিলা প্রধানদের স্বামী এবং মহিলা প্রধানদের সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার এরা প্রয়োগ করে। এদের স্ত্রীরা প্রধান হয়েও ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকে। এমনকি সরকারি সভায় পর্যন্ত এরাই পদাধিকারী স্ত্রীদের পরিবর্তে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। সরকার আইন করে স্বামীদের প্রবেশাধিকার কেড়ে নিলেও এখনও এই অব্যবস্থার উন্নতি হয়নি।

মধ্যপ্রদেশ ঃ নিরক্ষরতা, জাতপাত এবং সামন্তপ্রথার দাপট যেখানে বেশি সেই সব গ্রাম পঞ্চায়েতে বিশেষ করে দলিতশ্রেণির মহিলা সদস্যগণের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। কারসাই গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি অনাস্থাসূচক প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে একদল দলিতশ্রেণির মহিলা সরপঞ্চকে তার স্বামী সহ অপহরণ করা হয় এবং প্রভাব বিস্তারকারী শ্রেণির মানুষদের হাতে নির্মম অত্যাচার সহ্য করতে হয়। এখানেই লক্ষ করা যায় সরপঞ্চপতিদের

আধিপত্য। এমনকি মহিলা সরপঞ্চর চিঠি লেখার প্যাড ছাপানো হয়েছে তার পতির নামে। সরপঞ্চপতিগণ পঞ্চায়েতের সভা পরিচালনা করেন। মহিলা সরপঞ্চগণ ঘর গেরস্থালি করেন। এই অবস্থা নির্মম আকার ধারণ করে যেখানে সরপঞ্চ মহিলা কোনো জনজাতি, উপজাতি বা হরিজন শ্রেণির।

গুরজরাট ঃ ছটি জেলার পঞ্চায়েতগুলিতে মহিলা সদস্যদের একটি সার্ভেতে লক্ষ করা যা যে মহিলা সদস্যদের ৬০% অশিক্ষিত, প্রায় ৯০% বিবাহিত এবং পারিবারিক প্রয়োজন ও সন্তান প্রতিপালনেই দিনের অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকে। বিশ্লেষণে একটা বিস্ময়জনক প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। পঞ্চায়েতে সেখানে অধিকাংশই নিরক্ষর, সমিতিতে এবং জেলা স্তরে অধিকাংশই সাক্ষর। 'উন্নতি' নামক একটি সমীক্ষকগোষ্ঠীর পর্যবেক্ষণে লক্ষ করা যায় আর একটি বিস্ময়জনক প্রবণতা—তা হল দরিদ্র শ্রেণির মানুষও বুঝে নিয়েছে। যে রাজনৈতিক ক্ষমতাই হল সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার।

উড়িষ্যা ঃ ১৯৯০ সালে ৩০% আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হয়। বর্তমানে প্রায় ৩৪,০০০ মহিলা সদস্য আছে। এখানেও স্বামীদের ইচ্ছা পূরণেই স্ত্রীদের পঞ্চায়েতে আসা এবং প্রায় ৬০% মহিলা সদস্যই পঞ্চায়েতের লক্ষ্য ও কাজকর্ম সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই। সরকারি কর্মচারীগণ সহযোগিতা দানে নিস্পৃহ। প্রায় ৯২% মহিলা সদস্যগণেরই 'সরকার বাবুদের' বিরুদ্ধে এই অভিযোগ।

এইভাবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মহিলা প্রতিনিধিগণের পঞ্চায়েতি কাজকর্ম ও সম্পর্কের বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় নিছক সংবিধান সংশোধনীই মহিলা সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে অর্থবহ করতে পারে না। সাংবিধানিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা একটি পদক্ষেপ মাত্র। কিন্তু এটি তখনই সার্থক হবে যখন ভূমি সংস্কার, এ দিক থেকে পশ্চাৎপদ রাজ্য বলে পরিগণিত হলেও উড়িষ্যায় ১৯৯৩ সালের ৫ই মার্চ 'পঞ্চায়েতি রাজ দিবসে' উপস্থিত মহিলা প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ও পঞ্চায়েত তহবিল ব্যবহার সম্বন্ধে যথেষ্ট সরব হতে দেখা যায়। একইভাবে ১৯৯৩ সালে কর্ণাটকে তিমুর (Timur) জেলায় UMA নামক একটি গবেষকগোষ্ঠীর সমীক্ষায় দেখা যায় সংরক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা এতই সচেতন যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হলে তারা সাধারণ আসনে পুরুষদের সঙ্গে নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পিছপা নয়।

এইভাবে বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে পঞ্চায়েতে মহিলা প্রতিনিধিত্বের যে ইতিবাচক দিকগুলি লক্ষ করা যায় তা হল—

(১) এখন পঞ্চায়েতে মহিলা প্রতিনিধিত্ব প্রায় সর্বত্রই মোট আসনের $^{১}/_{৩}$ অংশ। ফলে মহিলাগণ প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব পালনে অযোগ্য—এই অভিযোগ অপ্রমাণিত হয়েছে। মহিলা প্রতিনিধিগণ এখন পুরুষ ও সরকারি কর্মচারীদের খবরদারীর উপর টেক্কা দিয়ে জনগণের স্বার্থে কাজ করছে, পঞ্চায়েতি তহবিলের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছে।

কিন্তু নেতিবাচক দিকগুলিও লক্ষণীয়—

(ক) পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির সুপরিচালনায় সবচেয়ে বড়ো বাধা হল মহিলা প্রতিনিধিদের নিরক্ষরতা।

(খ) পঞ্চায়েতি রাজ পরিচালনায় যথেষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব। যথেষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষণ শিবিরের বন্দোবস্ত অথবা সর্বজনসমক্ষে নিজেদের যোগ্যতা প্রকাশের আড়ষ্টতা থেকেই এই ত্রুটিটি প্রকট হয়ে পড়ে।

প্রগতিশীল মহিলা আন্দোলন এবং নতুন এক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে তাদের জীবনযাত্রার প্রকৃত মানোন্নয়ন ঘটবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনে মহিলাদের নিয়োগের প্রয়োজন হয়েছিল। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অগ্রাধিকারের পরিবর্তন ঘটে। গুরুত্ব দেওয়া হয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তর্জাতিক বাধ্যবাকধতার ফলে গুরুত্ব বাড়ে মহিলাদের অর্থনৈতিক ভূমিকার। কিন্তু সমাজের পুরুষপ্রধান ও গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমাজের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ফলে মহিলাদের মাতৃত্ব ও অবৈতনিক ঘর গেরস্থালির যে সনাতনি অবস্থান ছিল তার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এখনও সেই একই ধরনের পুরুষ পিতৃতান্ত্রিকতার মানসিকতা একইভাবে বিরাজ করছে। মহিলাদের বাস্তব ক্ষেত্রে ক্ষমতার আসনে বসানোর আসল বাধা হল এই পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। অবশ্য এর মধ্যেই আশার আলো যে দেখা যাচ্ছে না তা নয়। ১৯৯৩ সালে উড়িষ্যা এবং কর্ণাটকে পৃথক পৃথক দুটি নিরীক্ষাতেই দেখা গেছে গ্রাম প্রশাসনে সক্রিয় অংশগ্রহণের দৃঢ় মানসিকতা লক্ষ করা গেছে—বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং মহিলা উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচি গ্রহণে। এগুলি হল মদ্যপান নিরোধ, গার্হস্থ্য, হিংসা দমন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, শিশুশ্রমিক প্রথা বন্ধ করা ইত্যাদি।

১৩.৮ পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতি রাজ ও মহিলা প্রতিনিধিত্ব

১৯৫৭ সালের ২৪শে নভেম্বর বলবন্ত রাও মেহতা স্টাডি টিমের প্রতিবেদনেই ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়। তদনুসারেই ১৯৫৭ সালেই পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত আইন এবং ১৯৬৩ সালে জেলা পরিষদ আইন অনুমোদিত হয়।

১৯৭৭ সালে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসীন হবার পরই ১৯৭৮ সালেই পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং পঞ্চায়েতিরাজের বাস্তব কাজকর্মে নবজাগরণের সূচনা হয়। বিকল্প যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বামফ্রন্ট নবগঠিত পঞ্চায়েতগুলিতে যে প্রাণের জোয়ার সৃষ্টি করল তার মূল লক্ষ্য ছিল—

(১) সরকার ও পঞ্চায়েতের কাজে জনগণের উদ্যোগ ও অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করে গণতন্ত্রকে জনসাধারণ স্তর পর্যন্ত সম্প্রসারিত বা বিকেন্দ্রিভূত করা।

(২) ভূমিসংস্কার, গ্রামের গরীবদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ, অনুদান, কৃষি উপকরণ, বীজ, কর্মসংস্থান প্রভৃতি পদক্ষেপের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণি শক্তির ভারসাম্য গ্রামের গরিব মানুষদের অনুকূলে পরিবর্তিত করা।

(৩) উন্নয়নের পদক্ষেপগুলিতে মানুষ তাদের সংগঠিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করবেন। বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি সরকারি ব্যবস্থা ও কর্মচারীগণের একটা ছকে বাঁধা আমলাতান্ত্রিকতার দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময়ই মহিলা প্রতিনিধিদের মর্যাদা ও সক্রিয়তাকে নিরুৎসাহিত করে।

(৪) নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন মেনে নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে এবং উপযুক্তভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাগুলি ডাকা হয় না বলে মহিলা প্রতিনিধিগণ অবহেলিত থাকে।

একটা বিষয় সুস্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার যে গ্রামের ধনী ব্যক্তিবর্গের আধিপত্য বিনষ্ট করতে না পারলে পঞ্চায়েতে মহিলা প্রতিনিধিত্বের স্বার্থসিদ্ধি ঘটবে না। সাংবিধানিকভাবে মহিলা প্রতিনিধিত্ব সংরক্ষণ করে ধনী জোতদারদের ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারে বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানানো হল—একথা ঠিক। কিন্তু এটাও ঠিক যে তারা এত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয় ; ক্ষমতা রাখার জন্য তারা বহুদূর পর্যন্ত তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তাই পঞ্চায়েতে মহিলা প্রতিনিধিত্বের সংরক্ষণ যেমন অপরিহার্য তেমনি তার পাশাপাশি থাকা দরকার—

(১) ভূমি সংস্কার।

(২) অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবিরাম প্রচার ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।

(৩) মহিলাদের সাক্ষর করে তোলা।

(৪) রাজনৈতিক দল ও জনসেবামূলক বেসরকারি সংস্থায় মহিলাদের অধিক পরিমাণে অংশগ্রহণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পঞ্চায়েত পরিচালনা ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ভূমিসংস্কার কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার অর্থনীতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের এই মৌল ব্যবস্থার পটভূমিকাতেই পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলা প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। ১৯৯৩ সালে $^{১}/_{৩}$ অংশ আসন সংরক্ষণের ফলে বর্তমানে প্রায় ১৭,০০০ মহিলা প্রতিনিধি ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে জেলা পরিষদের সভাধিপতি, কর্মাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, গ্রামপ্রধান হিসাবে মেয়েরা প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করছেন। পঞ্চায়েতের কাজে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মহিলা প্রতিনিধিদলের একদিকে যেমন সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে সাংগঠনিক নেতৃত্বদানের ক্ষমতাও তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামসমাজে যে উত্তরণের আন্দোলন চলছে তার প্রধান শরিক হয়েছেন মেয়েরা। একসময় যে মহিলারা ছিলেন সমাজের কাছে ব্রাত্য—সমাজের সুবৃহৎ আঙ্গিনায় যাদের প্রবেশের অধিকার ছিল না—তারাই এক গ্রামসমাজের উন্নয়নের প্রধান কাণ্ডারী।

ভূমিসংস্কার আন্দোলনের সাফল্য এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণকে একটা আন্দোলনের পর্যায়ে উন্নীত করার ফলে পঞ্চায়েতের মহিলাদের অংশগ্রহণ একটা গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা পেয়েছে। সাক্ষরতা কর্মসূচি রূপায়িত করার প্রশ্নে মেয়েরা অনেক বেশি সক্রিয়। স্বেচ্ছাসেবিকা হিসাবে V.T.,M.T.,R.P., R,P —সব জায়গাতেই অসংখ্য মহিলা অংশগ্রহণ করেছে। সাক্ষরতার কর্মযজ্ঞ মেয়েদের আরো সচেতন করেছে, আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে পঞ্চায়েতের কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণে। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত গ্রামীণ জনজীবনে কর্মসংস্থানের প্রশ্নে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামে সম্পদ সৃষ্টির কাজকে পঞ্চায়েত অগ্রাধিকার দিচ্ছে। পাশে পাশে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নেও গ্রাম সম্পদ সৃষ্টির কাজকে পঞ্চায়েতের অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এর ফলে কয়েক লক্ষ শ্রমদিবস তৈরি হচ্ছে। শ্রমদিবস গ্রামীণ মেয়েদের একটি ব্যাপক অংশ এই উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হচ্ছে। বিশেষত বনসৃজন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, গৃহপালিত পশুপালন, ছোটোখাটো সবজি বাগান তৈরি, মৎস্য চাষ ইত্যাদি কাজের সঙ্গে মেয়েরা নিবিড়ভাবে যুক্ত। নারীদের কর্মদক্ষতা এবং আয় বাড়ানোর প্রশ্নে পঞ্চায়েত উৎপাদনশীল কাজগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, এ প্রসঙ্গে ভোকরা প্রকল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। তাছাড়া কিছু কিছু স্বনির্ভরগোষ্ঠী প্রকল্পও গ্রহণ করা হচ্ছে যার দ্বারা মেয়েদের আয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা যায়। পঞ্চায়েতের ঋণদান প্রকল্পগুলির সমীক্ষায় লক্ষ করা গেছে যে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে মেয়েরা অনেক বেশি তৎপর এবং নিয়মিত। গ্রামীণ মেয়েদের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ করে সন্তানদের সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পঞ্চায়েতি সাফল্যের একটি দিক। পঞ্চায়েতের দায়বদ্ধতা সামাজিক। মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতেও পঞ্চায়েত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করতে পারে।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মহিলা প্রতিনিধিত্বের নেতিবাচক দিকগুলিও উপেক্ষা করা উচিত নয়। স্থানীয় উদ্যোগ বৃদ্ধি এবং জনগণের অধিক পরিমাণে অংশগ্রহণই যদি মূল উদ্দেশ্য হয় তাহলে মহিলা আসন সংরক্ষণ প্রশ্নাতীত নয়। পৌরসভায় প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে মহিলাগণ সাক্ষর ও যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন হলেও

পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে তা কিন্তু অধিকাংশ সময়েই হয় না। ফলে অধিকাংশ সময়ই নোটিশ লেখা, সভার প্রস্তাব লিখিত আকারে রেকর্ড করা, সরকারি বিজ্ঞপ্তি পড়ে বুঝে সই করা ইত্যাদি লেখাপড়ার কাজগুলি নির্বাহ করার জন্য অস্বাভাবিকভাবে স্বামীর উপর বা কোনো রাজনৈতিক দলের নেতার উপর বা নির্দেশের উপর নির্ভর করতে হয়। সেখানেই ঘটে বিচ্যুতি। মহিলা প্রতিনিধির এই অসহায়তার সুযোগ নিয়ে পঞ্চায়েত প্রশাসন, পার্টি প্রশাসন বা কনট্রাকটর প্রশাসনে পরিণত হয়। নির্বাচনী যুদ্ধেও পাশাপাশি গ্রামসভাগুলির দলীয় পুরুষ প্রতিনিধিদের উদ্যোগেই মহিলাদের জিততে হয়। স্বামী, দলীয় পুরুষ সহকর্মী ও রাজনৈতিক দলগুলিও মহিলাদের এই অসহায় অবস্থার প্রতীকারসাধন না করে তাকে তার হাতের পুতুল করেই রাখতে চায়; প্রয়োজনে কাজে লাগায়। সংরক্ষণের প্রতিবন্ধকতাগুলিও উপেক্ষা করা উচিত নয়, যা সংরক্ষণের সমস্যাকে তীব্রতর করে। সেটি দেখা যায় মূলত সাক্ষর মহিলা প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে। ছোটো পরিবারের দৌলতে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারেই সন্তান একটি বা কদাচিৎ দুটি। পুরুষ সদস্য সারাদিন রুজি রোজগারের জন্য ঘরের বাইরে থাকে বলে মহিলা সদস্যদের গার্হস্থ্য কাজকর্মে, রান্না-বান্নায় এবং সন্তান প্রতিপালনে ও তার লেখাপাড়ায় সময় কাটাতে হয়। ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া এবং সমস্ত সময়টুকু বিদ্যালয়ে কাটিয়ে বিকালে ছেলেমেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফেরা। অপেক্ষাকৃত গরীব মানুষের ক্ষেত্রে স্ত্রী এবং সন্তানগণ অনেক সময়ই বাড়ির কাছাকাছি কোনো একটি চালাঘরে বা ঘুসটিতে অথবা সংসারের বাড়তি আয়ের জন্য কাছাকাছি কোনো ঠিকা কাজে নিয়োজিত থাকেন। এইজন্য অনেক সময়ই মহিলাগণ পঞ্চায়েত প্রতিনিধি হতেই চান না। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কর্মসংস্থান প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু সচেতনতা বৃদ্ধি পেলেও বিশেষ সমীক্ষায় দেখা গেছে ঐ কেন্দ্রগুলির পিছনে কোনো রাজনৈতিক দলের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা আছে—এটা তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক অবস্থান নয়। সুনিশ্চিত ভাবেই বলা যায় গ্রামবাংলার মহিলাদের এই অর্থনৈতিক অক্ষমতা ও নিরক্ষরতা দূর না করলে মহিলা সংরক্ষণ ব্যবস্থার গুরুত্ব কমে যাবে।

১৩.৯ মূল্যায়ন

'স্বায়ত্তশাসন' ব্যবস্থাটি রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় হওয়ায় ৭৩তম সংশোধনী আইন প্রণয়নের অনেক আগেই অধিকাংশ রাজ্য আইনসভা মহিলাদের জন্য পঞ্চায়েতে আসন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে নিয়েছে। অবশ্য এই সংরক্ষণের পরিমাণ সব রাজ্যে এক নয়—মধ্যপ্রদেশে ন্যূনতম মাত্র ১০% এবং পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক ৩৩%। কিন্তু সর্বাধিক আসন সংরক্ষণই যে সমস্ত সমস্যার সমাধান নয় তা সামগ্রিক আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়েছে। আসন সংরক্ষণ কোনো সর্বরোগহর দাওয়াই নয়। প্রয়োজন হল গ্রাম-ভারতে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এবং ক্ষমতা ব্যবহারের রাজনৈতিক স্তরে (Political empowerment) মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ। এই ব্যাপারে ভূমিকা সংস্কারের ব্যাপক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার যুগান্তর এনেছে বলা যায়। কিন্তু আইন প্রণয়নের পেছনে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থায় সফল রূপায়ণের প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর করলেই মহিলা প্রতিনিধিত্ব সংরক্ষণ ব্যবস্থা অর্থবহ হবে।

১৩.১০ সারাংশ

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাফল্য কোনো দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মান সূচিত করে। দেশের মানুষের সার্বিক অংশগ্রহণই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাফল্যের চাবিকাঠি। এই পটভূমিতেই পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে

পঞ্চায়েতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব ও আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থাটি আলোচিত হল। সেইসঙ্গে চিরাচরিত পুরুষশাসিত আমাদের এই সমাজে মহিলাদের মর্যাদার আসনটি কেমন এবং তা কতখানি উন্নত হয়েছে, সাংবিধানিক সুরক্ষার বন্দোবস্ত কতখানি কার্যকর হয়েছে তা সুবিস্তৃতভাবে আলোচিত হল। বলা হয়েছে, সাংবিধানিক ব্যবস্থাই কেবলমাত্র মহিলা প্রতিনিধিত্ব ও আসন সংরক্ষণকে অর্থপূর্ণ করতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন ভূমি সংস্কারের মতো জোরদার অর্থনৈতিক পদক্ষেপ। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের মোট ১৩টি রাজ্যে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা কম-বেশি গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে গ্রাম-ভারতের দরিদ্র ও কৃষিজীবী মানুষের একটা বৃহৎ অংশ এখনও প্রাত্যহিক রুজি রোজগারের সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত ; তাদের কাছে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিত্ব বিলাসিতার নামান্তর। আবার যেখানে এই প্রতিনিধিত্বের এবং আসন সংরক্ষণের সুযোগ আছে সেখানেও নিরক্ষরতা, সামাজিক কুসংস্কার, পতিপ্রধান সমাজের মহিলা নিষ্পেষণী দৃষ্টিভঙ্গি এই সুযোগকে নিছক প্রসাধনী প্রলেপে পর্যবসিত করেছে। এগিয়ে আসতে হবে রাজনৈতিক দলগুলিকে। বিংশোত্তর সময়কালে গণতান্ত্রিক কাঠামো গঠন ও পরিচালনায় রাজনৈতিক দলের উদ্যোগই প্রধান। মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব ও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাটিও সুনিশ্চিত করতে হবে রাজনৈতিক কাঠামোর উপরতলায়।

১৩.১১ অনুশীলনী

১। একটি বা দুটি বাক্যে প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

(ক) সংসদের নির্বাচিত কক্ষে ভারতবর্ষে মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা ও হার কত ?

(খ) পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলিতে সামগ্রিকভাবে আইনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের মধ্যে মহিলাদের হার কত ?

(গ) ৯০-এর দশকে ভারতে নারী উন্নয়ন ও প্রতিনিধিত্ব কমে যাওয়ার কারণটি কী ?

(ঘ) ৯০-এর দশকে রষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে মহিলা শ্রমিকের একটি পরিসংখ্যানগত ধারণা দিন।

(ঙ) মহাভারতের আখ্যানে মহিলার পরাধীন অবস্থানের একটি উদাহরণ দিন।

(চ) মহিলাদের সামাজিক মর্যাদার উন্নয়নে প্রবক্তা তিনজন সমাজ সংস্কারকের নাম বল।

(ছ) ব্রিটিশ শাসনাধীন সময়ে মহিলাদের সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রণোদিত দুটি সমাজ সংস্কার আইনের উল্লেখ করো।

(জ) মহিলা শ্রমিকের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে স্বাধীন ভারত সরকারের প্রণোদিত দুটি আইনের উল্লেখ করো।

(ঝ) পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রবর্তক প্রথম কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন ?

(ঞ) পঞ্চায়েতে মহিলা প্রতিনিধিত্বের সর্বভারতীয় দুটি সমীক্ষকগোষ্ঠীর নাম করো।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন (অনধিক ৫০-টি শব্দে) :

(ক) ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে মহিলা সংরক্ষণের দুটি প্রতিবন্ধকতার উল্লেখ করুন।

(খ) বৈদিক যুগে মহিলাদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

(গ) ব্রিটিশ ভারতে মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা বিধানে যে সমস্ত আইন প্রণোদিত হয় সেগুলি কী কী ?

(ঘ) মহিলা প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশগুলি সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করুন।

(ঙ) পঞ্চায়েতে মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়ে ১৯৮৮ সালের কেন্দ্রিয়গোষ্ঠীর সুপারিশগুলি কী কী ?

(চ) মহিলা সংরক্ষণের বিরুদ্ধে কী কী যুক্তি প্রদর্শন করা যেতে পারে ? ঐ যুক্তিগুলি সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী ?

(ছ) ৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মূল বক্তব্য কী ?

(জ) দক্ষিণ ভারতের যে রাজ্যের মহিলা প্রতিনিধিত্ব তোমার কাছে সন্তোষজনক বলে মনে হয়েছে তার সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

(ঝ) উত্তর ভারতের যেকোনো একটি রাজ্যের পঞ্চায়েতে মহিলা প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

৩। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন ঃ (১৫০—২০০ শব্দের মধ্যে)

(ক) ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে পর্যন্ত ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের পরম্পরাগত সামাজিক অবস্থান সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

(খ) গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মহিলাদের সামাজিক অবস্থান উন্নয়নে ভারতীয় সংবিধানে যে যে ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা হয়েছে তা সুবিস্তৃত বর্ণনা করুন।

(গ) ভারতবর্ষে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় মহিলা আসন সংরক্ষণের আনুপূর্বিক ইতিহাস বর্ণনা করুন।

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় মহিলা প্রতিনিধিত্ব ও আসন সংরক্ষণ সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করুন।

১৩.১২ গ্রন্থ-পঞ্জি

(ক) Prabhat Dutta with Panchali Sen—Women in Panchayats.

(খ) Sushila Raushik (1993)—Women and Panchayati Raj.

একক ১৪ ❑ স্বায়ত্তশাসন ও পরিবেশ

গঠন

১৪.০ উদ্দেশ্য
১৪.১ প্রস্তাবনা
১৪.২ পরিবেশ পরিচয়
১৪.৩ পরিবেশ দূষণ—দূষণের বিভিন্ন কারণ
১৪.৪ পরস্পর স্বার্থবিরোধী বিশ্ব পরিচালন ব্যবস্থা
১৪.৫ সংহত পরিবেশ নীতির প্রয়োজন
১৪.৬ ভারতে পরিবেশগত সমস্যার প্রকৃতি ও ব্যাপকতা
১৪.৭ ভারতে পরিবেশগত সমস্যার ক্ষেত্রজ বিশ্লেষণ
১৪.৮ ভারতে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রক আইন
১৪.৯ ভারতে পরিবেশ সংরক্ষক কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা
১৪.১০ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলন
১৪.১১ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় পরিবেশ সংরক্ষণ
১৪.১২ পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থায় পরিবেশ সংরক্ষণ
১৪.১৩ সারাংশ
১৪.১৪ অনুশীলনী
১৪.১৫ গ্রন্থপঞ্জি

১৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আপনি পরিবেশ সংক্রান্ত সামগ্রিক জ্ঞান লাভ করতে পারবেন, যথা—

- পরিবেশ বলতে আমরা কি বুঝি, তার উপাদানগুলি কি, তার দূষণ সমস্যাগুলির শ্রেণিবিভাগ এবং কারণ।
- সমগ্র পৃথিবী জুড়ে একটি সংহত পরিবেশ নীতির প্রয়োজন কি?
- ভারতে পরিবেশ দূষণের সমস্যার বিশ্লেষণ।
- ভারতে পরিবেশ সংরক্ষক আইন ও তার ত্রুটি।
- ভারতে পরিবেশ সংরক্ষক কয়েকটি আন্দোলন এবং বেসরকারি সংস্থার পরিচিতি।
- স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতে পরিবেশ সংরক্ষণের সুযোগ।

১৪.১ প্রস্তাবনা

পৃথিবীর অধিবাসী হল মানুষ, উদ্ভিদ এবং অন্যান্য প্রাণী। এদের বেঁচে থাকা এবং বিকাশের জন্য পৃথিবীর বাহ্যিক অবস্থাকেই বলা হয় পরিবেশ। অর্থাৎ পরিবেশ হল প্রাণীর এবং উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জায়গা।

একটি জীবন্ত প্রাণী বা উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য যা যা প্রয়োজন তাই হল পরিবেশের উপাদান। যথা—সূর্যকিরণ, মুক্ত বাতাস, জল, যথেষ্ট খাদ্য, উপযুক্ত আশ্রয় এবং একটি স্বাস্থ্যকর জলবায়ু। এছাড়াও কৃষির জন্য অনুকূল জমি এবং সভ্য জীবনযাপনের উপযোগী সামাজিক অবস্থাও পরিবেশের অপরিহার্য উপাদান।

এক্ষেত্রে আরেকটি ধারণা আছে, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Sustainable Environment, অর্থাৎ টিকে থাকা এবং অগ্রগতিমুখী সামর্থ্যসম্পন্ন পরিবেশ। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তার লোকসংখ্যা এত বেড়েছে যে তা পৃথিবীর খাদ্য ও আশ্রয়ের সীমিত সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। খুব দ্রুত গতিতে প্রাকৃতিক সম্পদগুলির অবস্থার হানি ঘটছে। তাই এই প্রাকৃতিক সম্পদের বন্টন ও ব্যবহার এমনভাবে করতে হবে যাতে একই সঙ্গে পরিবেশগত ভারসাম্য এবং মানুষের উন্নততর জীবনযাপনের মতো অবস্থা উভয়ই বজায় থাকে।

সভ্যতার জন্মলগ্নে এই সমস্যা ছিল না। তখন মানুষের না ছিল খাদ্য উৎপাদনের ক্ষমতা, না ছিল আশ্রয়ের সমস্যা। মানুষ তখন খাদ্য আহরণ করত বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে। এক বনের খাবার ফুরিয়ে গেলে অন্য বনে যেত। তারপর এক সময়, আজ থেকে ১০,০০০ বছর আগে, মানুষ কৃষিকাজ শিখল, আগুন জ্বালাতে শিখল, শিখল বীজ থেকে চারা উৎপাদনের প্রযুক্তি। এই সময়টা হল কৃষি সভ্যতার গোড়ার দিক। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নদীর তীরে গড়ে উঠল কৃষি সভ্যতায় সমৃদ্ধ শহর। এই সময়েও পরিবেশগত সমস্যার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। সমস্যা শুরু হল অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে যখন শিল্প সভ্যতার বিস্তার ঘটতে লাগল। মানুষ দ্রুত কৃষিজীবন থেকে শিল্পজীবনে প্রবেশ করতে থাকে এবং সেই সময় থেকেই শিল্প সভ্যতার অনুষঙ্গ সমস্ত দূষণ সমস্যা পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করতে শুরু করে। শিল্প সমৃদ্ধির সঙ্গে শুরু হয় নগরায়ন এবং দুয়ে মিলে পৃথিবীর পরিবেশের উপর যে চাপ সৃষ্টি করেছে তারই বিস্ময় পরিণতি একবিংশ শতকের মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলেছে। মানুষের জীবন ও সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে, লোকালয় বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে। বিংশ শতকে এই ধরনের দু-দুটি বিধ্বংসী ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে—

প্রথমটি হল ঃ তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার চেরনোবিল দুর্ঘটনা ঃ পারমাণবিক চুল্লির মারাত্মক বিকিরণ থেকে নিরাপত্তার জন্য আনবিক চুল্লিগুলি এক ধরনের প্রতিরক্ষামূলক অত্যন্ত মজবুত আবরণ বা শীল্ড দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। কিন্তু প্রতিরক্ষামূলক সমস্ত ব্যবস্থা সত্ত্বেও ১৯৮৬ সালের ২৬শে এপ্রিল প্রাক্তন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ইউক্রেন নামক রাজ্য ভূখণ্ডের চেরনোবিলে আণবিক চুল্লির বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে। সারা ইউক্রেন শহর এবং আশেপাশে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে বিধ্বংসী তেজস্ক্রিয় পদার্থ। শস্যক্ষেত্রগুলি বিনষ্ট হয়। বিভিন্নরকম মারাত্মক অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত হয় মানুষ। বিরাট এলাকা জুড়ে পরিবেশ দূষণজনিত আতঙ্ক বহু মানুষকে নিরাশ্রয় করে।

দ্বিতীয়টি হল ঃ ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা ঃ ১৯৮৪ সালের ৩রা ডিসেম্বর ভূপালে ইউনিয়ন কার্বাইড নামক একটি আমেরিকান কীটনাশক ঔষধ তৈরির কারখানায় এক বিধ্বংসী দুর্ঘটনা ঘটে। মজুত ট্যাঙ্ক ফেটে মারাত্মক রাসায়নিক তরল গ্যাস (Methyl isocyanate) বহু দূরে ছড়িয়ে পড়ে। ২,৫০০ মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় এবং বিষাক্ত রাসায়নিক ধোয়াশায় অন্তত ১৭,০০০ মানুষ বোবা বা অন্যভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে।

এই দুটি ঘটনা ছাড়াও দেশে ও বিদেশে ছোটো-বড়ো আরও বহু দুর্ঘটনা ঘটেছে যা অনিবার্যভাবে পৃথিবীর শিল্পায়নের বিস্ময় পরিণতি।

১৪.২ পরিবেশ পরিচয়

পৃথিবীই হল একমাত্র গ্রহ যেখানে প্রাণী ও উদ্ভিদ বাস করে এবং বংশবৃদ্ধি করে। বাস করা এবং বংশবৃদ্ধির জন্য তারা পৃথিবী থেকে পায় পর্যাপ্ত সূর্যকিরণ, বাতাস, জল, উর্বর মাটি, ভেজা জমি, জঙ্গল এবং ঘাস। এইসব কিছুর সঙ্গে পৃথিবী মানুষের বাসযোগ্য তাপমাত্রা বজায় রাখে। অন্যান্য গ্রহে তা নয়। সেখানে তাপমাত্রা এমন বেশি বা এত কম যে তা যেকোনো প্রাণীর বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এই পৃথিবীর বাহ্যিক পরিবেশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল বায়ুমণ্ডল (atmosphere)। বায়ুমণ্ডল বলতে বুঝায় পৃথিবীর উপরিভাগের কয়েক হাজার মাইল জুড়ে গ্যাসের আবরণ। পৃথিবীর ঠিক উপরিভাগে তা খুব ঘন এবং ধীরে ধীরে তারও উপরের দিকে তা লঘু হতে থাকে।

এই বায়ুমণ্ডলকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) সমুদ্র সমতল থেকে পৃথিবীর উপরিভাগের ১০ মাইল পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে ট্রপোস্ফিয়র (Troposphere) বলে।

(২) স্ট্রেটোস্ফিয়র—ট্রপোস্ফিয়রের উপর থেকে অর্থাৎ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ১০ মাইল ওপর থেকে ১৬ মাইল পর্যন্ত হচ্ছে স্ট্রেটোস্ফিয়র (Stratosphere)।

(৩) মেসোস্ফিয়র—স্ট্রেটোস্ফিয়রের উপর থেকে অর্থাৎ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ১৬ মাইল উপর থেকে ৫০ মাইল পর্যন্ত হল মেসোস্ফিয়র। বায়ুমণ্ডলের এই স্তরের নীচের দিকেই আছে ওজন (O^3) স্তর—যা সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে পৃথিবীর মানুষকে বাঁচায়।

(৪) আয়নোস্ফিয়র—মেসোস্ফিয়রের উপরের স্তর। একে থার্মোস্ফিয়রও (Thermosphere) বলা হয়, কারণ এখানে সূর্যের তাপ খুব বেশি। এই স্তর থেকেই বেতার তরঙ্গ পৃথিবীর সমোন্নতি রেখার সর্বত্র পাঠানো হয়। যার ফলে রেডিও, টেলিফোন ইত্যাদি চলে।

(৫) এক্সোস্ফিয়র—এর বাইরে রয়েছে এক্সোস্ফিয়র (Exosphere) যেখানে বায়ুমণ্ডল খুব হালকা।

বায়ুমণ্ডলে থাকে ৪ : ১ অনুপাতে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন। তার সঙ্গে থাকে **হিলিয়ম** (Helium), **নিয়ন** (Nion), **আরগন** (Argon), **ক্রিপটন** (Krypton), **জেনন** (Xenon) জাতীয় কতগুলো গ্যাস। তাছাড়া থাকে কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন (Mithane) ওজোন (Ozone) এবং অল্প পরিমাণ জলীয় বাষ্প, হাইড্রোজেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড। জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয়। পৃথিবীর এই বায়ুমণ্ডলই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বাতাসে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে। পৃথিবীর যে অংশে প্রাণীরা বাস করে এবং প্রাণী এবং উদ্ভিদ পরস্পরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয় তাকে বলা হয় বায়োস্ফিয়র (Biosphere)। এই বায়োস্ফিয়রই জীবনকে সংরক্ষণ করে। গভীর সমুদ্র এবং উত্তুঙ্গ পর্বত উভয়ই এই বায়োস্ফিয়রের অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত প্রাণীর জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ, আলো, বাতাস, জল, খাদ্য, আশ্রয় সবই জোগান দেয় এই বায়োস্ফিয়র। কোনো একটি অঞ্চলে প্রাণী এবং উদ্ভিদের বিকাশ নির্ভর করে পরিবেশের পরিস্থিতির উপর। জলবায়ু, মাটির গঠন, জঙ্গল এলাকার বিস্তৃতি প্রাণী এবং উদ্ভিদের বিকাশকে প্রভাবিত করে। এই বায়োস্ফিয়রের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে প্রাণী এবং উদ্ভিদের মিথস্ক্রিয়ার ফলেই তৈরি হয় ইকোসিস্টেম (Ecosystem) বা বাস্তুব্যবস্থা। এই বাস্তুব্যবস্থাকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) ভূখণ্ডগত বাস্তুব্যবস্থা—এখানেই প্রাণের প্রাবল্য। মানুষ, উদ্ভিদ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ সবই এই বাস্তু এলাকার সভ্য। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এই বাস্তুব্যবস্থার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

(খ) খাঁটি জলের বাস্তুব্যবস্থা—জল ছাড়া জীবন সম্ভব নয়। কিন্তু সমগ্র জলভূমির মাত্র ৩% হল খাঁটি জল। শহরের নোংরা আবর্জনা এবং শিল্প থেকে নির্গত দূষিত তরল ও আবর্জনা অনবরত জলকে দূষিত করছে।

(গ) সামুদ্রিক বাস্তুব্যবস্থা—পৃথিবীর ৩/৪ অংশ হল সমুদ্রবেষ্টিত। এই বিশাল জলভাগে থাকে পাখি, উদ্ভিদ ও অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণী। এই জল লবণাক্ত ; সামুদ্রিক জল মিষ্টি জলের মতো কৃষিকার্যে ব্যবহারের যোগ্য নয়। এই জলভাগই হল সমুদ্র বাণিজ্যের এলাকা। তাছাড়া সমুদ্রতলে পাওয়া মণিরত্ন ও গ্যাস এই বাস্তুঅঞ্চলের গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

(ঘ) ভেজা মাটির বাস্তুব্যবস্থা—এই অঞ্চলও পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। এখানে আছে জলা জমি, বিল, পাঁকে ভর্তি পুকুর, জঙ্গল এবং সমুদ্র ফাঁড়ি অঞ্চল। এই অঞ্চলেও বহু প্রজাতির জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাস আছে। আছে নানারকমের মাছ ও শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ।

জীবনের উদ্ভব ও বিকাশের জন্য এই বায়োস্ফিয়রে কতগুলি আবর্তনশীল প্রক্রিয়া আছে। এই প্রক্রিয়াগুলি হল—

(ক) শক্তি বৃত্ত (Energy cycle)

(খ) তাপ বৃত্ত (Heat cycle)

(গ) অক্সিজেন বৃত্ত (Oxygen cycle)

(ঘ) কার্বন বৃত্ত (Carbon cycle)

(ঙ) নাইট্রোজেন বৃত্ত (Nitrogen cycle)

(চ) জল বৃত্ত (Water cycle)

এই বিভিন্ন আবর্তমান প্রক্রিয়াগুলিকে বিনষ্ট না করে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সমস্ত প্রাণী এবং জীবাণু বায়োস্ফিয়রে বাস করে এবং বংশবৃদ্ধি করে। জীববৈচিত্র্য সহ বাস্তুব্যবস্থার সংরক্ষণই হল বায়োস্ফিয়রের সংরক্ষণের উপায়। মানুষ এই বায়োস্ফিয়রের প্রধান প্রাণী। কিন্তু মানুষেরই অনেক কাজ এই বায়োস্ফিয়রের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মানুষ যেভাবে এই বাস্তুব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করছে তা মানুষেরই অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে। তাই এই বাস্তুব্যবস্থার সংরক্ষণে এগিয়ে এসেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলির সর্বোচ্চ সংস্থা। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ইউনেস্কো' (UNESCO) এই বায়োস্ফিয়রের সংরক্ষণে বিরাট কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

১৪.৩ পরিবেশ দূষণ

প্রাকৃতিক পরিবেশের ভৌতিক, রাসায়নিক এবং জৈব বিকৃতিই হল দূষণ। দূষণের ফলে বাস্তুব্যবস্থার (Ecosystem) ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং সমস্ত জীবজগৎ ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব ও বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দূষণ প্রধানত ৪ ধরনের—

(১) বায়ুদূষণ

(২) জলদূষণ

(৩) তাপদূষণ

(৪) শব্দদূষণ

(১) বায়ুদূষণ—রান্নার জ্বালানি এবং যানবাহন থেকে নির্গত জলীয় কার্বন (hydrocarbon), কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড গ্যাসই বায়ুদূষণের কারণ। কলকারখানার চিমনী থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া শিল্পক্ষেত্রগুলির আবহাওয়া বিনষ্ট করে।

এই বায়ুদূষণ থেকেই এজমা, হাঁপানি, সর্দিকাশি এবং ফুসফুসের নানারকম রোগের সৃষ্টি হয়। মোটরগাড়িতে ব্যবহারযোগ্য পেট্রোলে যে সিসা থাকে তাতে বায়ু ভীষণভাবে দূষিত হয়।

ফ্রিয়ন (Freon) গ্যাস এবং নাইট্রোজেনের সব অক্সাইডই বায়ুমণ্ডলে ওজন স্তরে ছিদ্র সৃষ্টি করে। রান্নার জ্বালানি এবং যানবাহন থেকে নির্গত গ্যাস কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বায়ুমণ্ডলে গ্রীন হাউস ইফেক্ট (Green House Effect) এবং বিশ্বের উষ্ণায়ন (Global warming) সৃষ্টি করে। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যে গ্যাস থাকে পৃথিবীর তাপ কমানোর ব্যাপারে তাদের একটা প্রধান ভূমিকা থাকে। সূর্যই হচ্ছে পৃথিবীর তাপের উৎস। সূর্যের বিকিরণের কাছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল স্বচ্ছ। বায়ুমণ্ডলে সালফার ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইড থেকে অম্লবৃষ্টি হয়। অম্লবৃষ্টি বাড়ির ও স্থাপত্যশিল্পের ক্ষতি করে।

(২) জলদূষণ—শহরের সমস্ত ড্রেনবাহিত নোংরা জল এবং শিল্প সংস্থাগুলি থেকে নির্গত বর্জ্য রাসায়নিক তরল লেক এবং নদীর জলের সঙ্গে মিশে জলকে দূষণ করে। অনেক আনবিক বর্জ্য পদার্থ জলদূষণকে বিপজ্জনক করে তোলে।

(৩) তাপদূষণ—শক্তি প্রকল্পগুলির বাড়তি বর্জ্য তাপ নদী বা হ্রদের জলে তাপদূষণ সৃষ্টি করে এবং তার ফলে ঐ নদী বা হ্রদ তীরবর্তী বন্যজীবন বা নদীর মৎস্যদের বিপদ ঘটে।

এই ধরনের দূষণ বন্ধ করতে হলে অত্যন্ত ক্ষতিকারক কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। ফ্যাক্টরি থেকে অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং আপত্তিজনক নির্গত গ্যাস যাতে নদীতে না পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে। ধোঁয়াহীন কয়লার প্রচলন বায়ুদূষণ এবং তাপদূষণ উভয়ই কমাতে পারে।

(৪) শব্দদূষণ—শব্দের আতিশয্যের মাত্রার মাপ হল ডেসিবল (Decibel)। অত্যন্ত উচ্চস্বরে ৫ ডেসিবেল বা তার বেশি শব্দ করে যদি কোনো শব্দ যন্ত্র বাজে তাহলে মানুষের কানের চিরকালীন ক্ষতি হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ৬৫ ডেসিবেলকে সর্বোচ্চ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সীমা বলে চিহ্নিত করেছেন। আমাদের বাজারহাট, স্টক এক্সচেঞ্জ, অত্যন্ত ব্যস্ত রাস্তার মোড়, কলকারখানা, গাড়ির হর্ন, জনসভা, পূজা-পার্বনে মাইক ব্যবহার, জেনারেটরের শব্দ সব কিছুই শব্দদূষণ ঘটায়। মানুষের শরীরের ও মনের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি এই শব্দদূষণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এই শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে মানুষকে সচেতন হবার আহ্বান জানিয়েছেন এবং ৪৫ ডেসিবেলকে নিরাপদ শব্দমাত্রা ঘোষণা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ আইন করে শব্দদূষণ মাত্রা ৬৫ ডেসিবেলকে বেঁধে দিয়েছেন এবং আইন ভঙ্গের বিষয়টিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করেছেন।

(৫) গন্ধদূষণ—অত্যন্ত অপ্রীতিকর বা উত্তেজক গন্ধেও দূষণ সৃষ্টি হয়। বাজারে স্তূপীকৃত পচা মাছের গন্ধ, বাসভূমির কাছাকাছি মৃত জন্তুজানোয়ার ফেলার (ভাগাড়) জায়গা থেকে হাওয়ায় ভেসে আসা দুর্গন্ধ, পৌর অঞ্চলে স্তূপীকৃত পুঁতিগন্ধময় জঞ্জালের দুর্গন্ধ, রাস্তার উপর বা স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে শৌচাগারগুলির অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধ ও সবই

আমাদের সমাজে পরিচিত গন্ধদূষণের নমুনা। আজকাল শহরে জনবসতির মধ্যেই মুরগি পালনের জায়গা (পোলট্রি), শূকর পালনের স্থান, গরু-মোষ থাকার খাটাল, মর্গ প্রভৃতিও দুর্গন্ধের উৎস হিসাবে প্রতিবেশী মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত করে।

গ্রীন হাউস ইফেক্ট—বায়ুমণ্ডলে যে সমস্ত গ্যাস থাকে তা সূর্যকিরণ থেকে জাত তাপ নিয়ন্ত্রিত করে। এই বায়ুমণ্ডল স্বচ্ছ বলে সরাসরি পৃথিবীতে আসতে কোনো বাধা হয় না। কিন্তু পৃথিবী দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (ইনফ্রা-রেড) বিকিরণ উৎক্ষিপ্ত করে। এর ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, ওজোন, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাস পৃথিবী থেকে নির্গত ইনফ্রা-রেড রেডিয়েশনকে আটকে রেখে দেয় এবং এর ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল তপ্ত হয়। এর ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠ খুব উত্তপ্ত হতে থাকে। এই প্রাকৃতিক ঘটনাটিকেই গ্রীন হাউস ইফেক্ট বলে। কিন্তু এই গ্রীন হাউস ইফেক্টের জন্যই পৃথিবী জীবন ধারণ ও যাপনের অনুপযোগী শীতল হতে পারে না—যে শীতলতায় জল জমে বরফ হয়ে যায় তার অনেক উপরে তাপমাত্রা বায়ুমণ্ডলকে উষ্ণ রাখে। কাচের ঘরে উষ্ণ অবস্থার মধ্যে শস্য উৎপাদনের যে সুযোগ তা থেকেই গ্রীন হাউস কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'গ্রীন হাউস ইফেক্টের' জন্য পৃথিবীর উষ্ণীভবন (Global warming) ঘটে। এর ফলে বায়োস্ফিয়রের মারাত্মক বিপর্যয় ঘটতে পারে। সমুদ্রজলের অধিক বাষ্পীভবনের ফলে চূড়ান্ত পর্যায়ে জলবায়ু প্রভাবিত হতে পারে। উষ্ণীভবনের ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্র জলের প্রবল স্ফীতি ঘটাতে পারে এবং তা থেকে সমুদ্র তীরবর্তী নীচু এলাকাগুলি জলমগ্ন হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন এলাকা এবং বাংলাদেশের সমুদ্র তীরবর্তী নীচু এলাকাগুলি জলের নীচে চলে যেতে পারে। কলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাই, কায়রো ইত্যাদি সমুদ্রতীরবর্তী শহরগুলি জলমগ্ন হতে পারে। গ্রীন হাউস ইফেক্টের ফলে কোনো কোনো শস্যের উৎপাদনও ব্যাহত হতে পারে।

বনভূমি ও জৈববাবস্থা ঃ

বাস্তুব্যবস্থার অন্তরঙ্গ উপাদান হল বনভূমি। বনভূমি পরিবেশ সংরক্ষণে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করে। ভারতবর্ষে সমস্ত ভৌগোলিক ভূখণ্ডের ১৯.৫% জুড়ে রয়েছে বনভূমি। ক্রমবর্দ্ধমান নগরায়ণের সঙ্গে বনভূমির অস্তিত্ব ও বিস্তৃতির একটি বিপ্রতীপ সম্পর্ক আছে। একদিকে লোকসংখ্যা বাড়ছে ; তাদের বাসস্থলের প্রয়োজন বাড়ছে ; নগরায়ণ বাড়ছে ; জঙ্গল কেটে অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য কৃষি জমি তৈরি করা হচ্ছে ; জ্বালানি সংগ্রহের জন্য জঙ্গল কেটে কাঠ সংগ্রহ করা হচ্ছে। নির্বিচার বৃক্ষচ্ছেদন যজ্ঞ চলছে। তার ফলে বায়োস্ফিয়র অনিবার্য যে প্রভাব পড়ছে তাতে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় মুক্তির সম্ভাবনা তত কমছে। এর ফলেও 'গ্রীণ হাউস ইফেক্ট' এবং 'পৃথিবীর উষ্ণীভবন' (Global warming) প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। নির্বিচার বৃক্ষচ্ছেদনের জন্য ভূমিক্ষয় হচ্ছে ; বন্যা হচ্ছে ; অতিবৃষ্টি, বন্যা এবং খরা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

বিশ্ব মানবসমাজ বনসম্পদ রক্ষার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছে। ১৯৯২ সালে রিও-ডি-জেনেরোতে ১৫৭-টি দেশের জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্মেলনেও বনভূমির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় স্তরে জাতীয় বনভূমি নির্মাণ ও জৈব ব্যবস্থা উন্নয়ন (National Afforestation and Eco-development) নামক সংস্থার উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। ভারতে বৃক্ষরোপণ এবং বনসৃজন এখন একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। প্রতি বৎসর একটি নির্দিষ্ট দিনে বৃক্ষরোপণ উৎসব পালিত হয়। তাছাড়া অন্যান্য জাতীয় দিবসগুলিতেও বৃক্ষরোপণ এখন প্রায় নিয়মিত একটি মাঙ্গলিক উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে।

ভারত সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই সামাজিক বনসৃজনের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। কেবলমাত্র বনসম্পদ ও জ্বালানির

কাঠ উৎপাদনের জন্যই নয়, সামাজিক মালিকানাধীন জমি (Community Land) এবং অনাবাদি জমিগুলিতে বিপুল সংখ্যায় গাছ লাগিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য। সামাজিক বনসৃজন বলতে বুঝায়—

(ক) পতিত জমিতে বৃক্ষরোপণ

(খ) যে সমস্ত বনভূমির বৃক্ষ নির্মূল করা হয়েছে সেখানে নূতন করে বনভূমি তৈরি।

(গ) বনভূমিকে সংরক্ষণ করার জন্য নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা।

শুধু বনভূমি নয়, গভীর বনের পশু-পাখি সংরক্ষণের জন্যও ভারত সরকার ৬৭টি জাতীয় উদ্যান, ৩৯৪টি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র এবং ১৭টি অভয়ারণ্য তৈরি করেছে।

১৪.৪ পরস্পর স্বার্থবিরোধী বিশ্ব পরিবেশ পরিচালন ব্যবস্থা ও উত্তর-দক্ষিণ পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা

আমরা যদি আমাদের এই প্রিয় গ্রহকে বাঁচাতে চাই তাহলে সমান অংশীদার হয়ে এমনভাবে পরিবেশগত পরিচালনা করতে হবে যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলি ক্রমবর্ধমান হারে পরিবেশের সম্পদ ব্যবহার করতে পারে এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বিধানের জন্য সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে না হয়। পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তের দেশগুলিতে পরিবেশগত যে অবক্ষয় তার একটা মস্ত বড়ো কারণ হল ব্যাবসা এবং বাণিজ্যে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া। ক্রমবর্ধমান এই বিশ্ববাজারই পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদকে সংহত ও নিয়ন্ত্রণ করছে। সেখানে এমনভাবে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হচ্ছে যা উত্তরের দেশগুলির পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ব্যয় নির্বাহে সহায়তা করছে ; কিন্তু বিশ্ব বাণিজ্যের এই দ্রব্যমূল্য দক্ষিণের উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় বিপত্তি ঘটাচ্ছে। এরই নাম উত্তর-দক্ষিণ বিভাজন। সাম্প্রতিককালে বিশ্বরাষ্ট্র সংস্থায় পরিবেশগত এই অসম অবস্থার নিরাকরণের প্রচেষ্টা চলছে। এই প্রচেষ্টা চলছে কেবল প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে। এই প্রাকৃতিক সম্পদের অনেকটাই বিশ্ব সম্পদ যথা—বায়ুমণ্ডল, ওজোন স্তর। এই বিষয়গুলি ব্যবহার পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির একটা মৌলিক ঐক্য থাকা দরকার—তা হল এই যে এই বিষয়গুলির উপর সকল রাষ্ট্রেরই সম্মিলিত অধিকার থাকবে, ব্যবহৃত হবে সম্মিলিত। অন্য সম্পদগুলো হল জাতীয়, যথা—জঙ্গল, জৈব-বৈচিত্র্য এবং এই বৈচিত্র্য ব্যবহার স্থানীয় স্তরে মানুষের জ্ঞান। এই দুই ধরনের সম্পদ ব্যবহারে অসাম্য দূর করার জন্যই অর্থনৈতিক উদ্যোগ এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও সামঞ্জস্যিকরণ প্রয়াজন। তৃতীয়ত, দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির দরকার আরো বাস্তুসংস্থান এলাকা (Ecological space)। এখানে উত্তরের রাষ্ট্রগুলি বিশাল এলাকায় উপনিবেশ তৈরি করে রেখেছে, দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি যার ক্ষুদ্রাংশেও প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারছে না। সেখানে পুরো ১০০ বছর ধরে বায়ুমণ্ডল ব্যবহৃত হচ্ছে উন্নত রাষ্ট্রগুলিকে শোষণ করছে। এই শোষণ নির্মূল হওয়া প্রয়োজন। এই বিশ্ব সচেতনতা শুরু হয়েছিল পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলির একশ্রেণির মানুষের মধ্যে যারা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সঙ্গে পরিবেশ সচেতনতার একটা সমন্বয়সাধন করতে চেয়েছেন। তাদের মতে গণতান্ত্রিক শাসন কেবল প্রতিনিধিত্বমূলক হলেই হবে না, তার পরিবেশ সচেতনতাও থাকতে হবে। গোটা ৭০ এবং ৮০-র দশক জুড়ে এই আন্দোলন হয়েছে উন্নত দেশগুলিতে যারা ঐ সমস্ত দেশের গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় একটা দায়বদ্ধতা দাবি করেছেন। তারা দাবি করছেন যে একদল লোক নির্বাচিত হলেই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের দায় সারা হয়ে গেল, তা নয় ; সিদ্ধান্তগুলির দ্বারা যারা উপকৃত হচ্ছেন পরিবেশগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারের সঙ্গে সেই নাগরিকদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। উত্তরের পরিবেশ আন্দোলনের এটাই একটা বিরাট বৈশিষ্ট্য।

১৪.৫ পরিবেশ নীতির প্রয়োজন

উন্নত বা উন্নয়নশীল পৃথিবীর যেকোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই টিকে থাকার সামর্থ্যসম্পন্ন অর্থনৈতিক যোগ্যতা লাভের ক্ষেত্রে বিরাট বাধা হল পরিবেশগত অবক্ষয় এবং ক্রমহ্রাসমান প্রাকৃতিক সম্পদ। অটুট অর্থনৈতিক উন্নয়ন লাভের পূর্বশর্তই হল দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং স্বাভাবিক জীবন ধারণের মানের উন্নতি। কিন্তু উন্নয়নশীল যেকোনো রাষ্ট্রেই এই ধরনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার পাশাপাশি ঘটতে থাকে পরিবেশগত অবক্ষয়। পরিবেশগত এই অবক্ষয় দূর করা কোনো বিশেষ শিল্পসংস্থার দায়ের মধ্যে পড়ে না, সমগ্র দেশেরই অর্থনৈতিক আবহাওয়া বিপর্যস্ত হয় এই পরিবেশগত অবক্ষয়ের জন্য এবং যেকোনো একটি বা দুটি শিল্পসংস্থার পক্ষে তাই এই অবস্থার প্রতিকার সাধনের জন্য দরকার জাতীয় নীতির। বর্তমানে সব রাষ্ট্রের, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির কাছে খুব বেশি প্রয়োজন হল জাতীয় পরিবেশ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই অর্থনৈতিক বিকাশের কৌশল গ্রহণ। পরিবেশগত সমস্যাগুলি নির্ভর করে অর্থনৈতিক বিকাশের মাত্রা বা শিল্পায়নের প্রকৃতির উপর, নগরায়ণের মাত্রা এবং জননীতিগুলি ফলশ্রুতির উপর। উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলি হল—পানীয় জলের অপ্রাচুর্য ও নিরাপত্তাহীনতা ; অপ্রচুর স্বাস্থ্যব্যবস্থা ; নগরাঞ্চলে বায়ুদূষণ ; ভূমিক্ষয় ; জ্বলন্ত জৈবস্তূপ যথা—পোড়া কাঠ, কয়লা ও গোবর থেকে দূষণ এবং শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থ থেকে দূষণ। তুলনামূলকভাবে শিল্পায়ত দেশগুলির সমস্যা হল কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) নির্গমন, পেট্রোরাসায়নিক ধোঁয়াশা, ওজোন স্তরের বিপর্যয়, অম্লবৃষ্টি এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক বর্জ্য পদার্থের নির্গমন। এইভাবে ক্রমবর্ধমান কৃষি, শিল্প এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ একই সঙ্গে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটায় তেমনি পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা।

১৪.৬ ভারতে পরিবেশগত সমস্যার প্রকৃতি ও ব্যাপকতা

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দুর্যোগটা কি ? পৃথিবীর মোট ভূখন্ডের ২% নিয়ে ভারত পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার ১৬% এর বোঝা বইছে। তুলনামূলকভাবে চীনের ভূখণ্ড ভারতের চেয়ে ৩গুণ বেশি ; আমেরিকাকে যে পরিমাণ মানুষের বোঝা বইতে হয় ভূখণ্ড হল তার ৩ গুণ। পৃথিবীর ৭০% বাস করে গ্রামে এবং তার ৩৮% দারিদ্র্যসীমার নীচে। অথচ এই বিপুল জনসংখ্যার চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পানীয় জল পায় না অথবা স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পায় না। কৃষি আবহাওয়া পরিপুষ্ট পৃথিবীর অর্ধাংশ জলের অভাব, নীচু মানের জৈব পদার্থের উৎপাদন, বৃষ্টির পরিমাণের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ করা যায়। আর শহরের ক্ষেত্রে ৩১% লোক বস্তিবাসী, যেখানে জলের, আবর্জনা নিষ্ক্রমণ এবং আবাসনের কোনো সুবন্দোবস্ত নেই। ৯০-এর দশকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোগত সামঞ্জস্য সাধনের প্রক্রিয়ায় (SAP) গ্রহণ করার ফলস্বরূপ শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের যে বাড়তি জোয়ার এসেছে তার ফলে বেশ কিছু পরিবেশগত সমস্যাও তৈরি হচ্ছে, যথা—বিষাক্ত রাসায়নিক ও পারমাণবিক বর্জ্য। এইভাবে ভারতে দু'ধরনের পরিবেশগত সমস্যা দেখা যাচ্ছে—একদিকে জল, পয়ঃপ্রণালী, কৃষির রসায়নীকরণ সম্পর্কিত চিরাচরিত দূষণ, শিল্পদূষণ, অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থের দূষণ।

১৪.৭ ভারতে পরিবেশগত সমস্যার ক্ষেত্রজ বিশ্লেষণ

ভারতে পরিবেশগত সমস্যার ক্ষেত্রজ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে—

(১) ভূমি সম্পদ— সরকারি হিসাব অনুযায়ী ৩০৪ মিলিয়ন হেক্টর কৃষিযোগ্য জমির মধ্যে প্রায় ১৭৫ মিলিয়ন হেক্টর পরিবেশগত অবক্ষয়ের আওতায় পড়েছে এবং এই অবক্ষয় ঘটছে খুব দ্রুত গতিতে। প্রতি বছর ২.৫ মিলিয়ন হেক্টর অর্থাৎ মোট জমির ১% নিষ্ফলা জমিতে পরিণত হচ্ছে। ২৭ মিলিয়ন হেক্টর পরিমিত জমি হয় বন্যায়, অথবা লবণাক্ত হয়ে অথবা অম্লজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। আমাদের জাতীয় ভূখণ্ডের ভূমিক্ষয়জাতীয় ক্ষতির পরিমাণ হল বছরে ৬হাজার মিলিয়ন টন। সারা বিশ্বে ক্ষতির ১৮.৪%। এই বিশাল পরিমাণ ভূমিক্ষয়ের ফলে আমরা ৬ মিলিয়ন টন পুষ্টিবিধায়ক খাদ্য হারাচ্ছি যা প্রতি বছর মাটিতে যে পরিমাণ সার দেওয়া হয় তার চেয়েও বেশি। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলি হল বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থান।

(২) বনসম্পদ –প্রতি বছর ১.৫ মিলিয়ন হেক্টর পরিমিত জমি বৃক্ষশূন্য/বনমুক্ত হয়ে যাওয়ায় অনুৎপাদক হয়ে পড়ছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী সারা পৃথিবীর ১১% বনভূমি ভারতে আছে। যেভাবে বনভূমিতে বৃক্ষচ্ছেদন চলছে তাতে আগামী ৪০/৫০ বছরের মধ্যে ভারতে কোনো জঙ্গল থাকবে না। এখনই বৃক্ষশূন্যতার ফলে বন্যা, খরা, ভূমিক্ষয় এবং আরো নানা ধরনের প্রতিকূল আবহাওয়া তৈরি হচ্ছে। প্রতি বছরই যে বন্যা হচ্ছে তার কারণও তাই। ১৯৮০ সালের জাতীয় বন্যা কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী বন্যা ও খরা প্রতিরোধে বছরে প্রায় ১,৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়। এছাড়া আছে বিশাল পরিমাণ জীবন ও সম্পত্তিনাশের হিসাব। নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদনের এবং নূতন নূতন কৃত্রিম সেচ প্রকল্পের ফলে জন্ম নিচ্ছে অত্যন্ত ক্ষতিকারক কিছু বিদেশি গাছ (যথা—Parenthenium. cchhornia, salvinia ইত্যাদি) যারা সারা দেশেই বিরাট বিপদের সৃষ্টি করছে।

(৩) জলসম্পদ—উপরিভাগের ৭০% জলই দূষিত এবং তার মূল কারণ হচ্ছে বাড়ির নোংরা আবর্জনা। গঙ্গা এখন আর পবিত্র জল বহন করে না। গঙ্গাতীরবর্তী পৌর শহরগুলির সমস্ত নোংরা জল ও আবর্জনা ড্রেনবাহিত হয়ে গঙ্গায় গিয়ে পড়ে। একটি সরকারি হিসাব অনুযায়ী গঙ্গাতীরবর্তী ২৭টি শহর থেকে প্রতিদিন ১,২০০ মিলিয়ন লিটার নোংরা জল গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে। এছাড়া প্রায় ৬৪টি গঙ্গাতীরবর্তী শিল্পসংস্থা থেকে প্রায় ১মিলিয়ন লিটার নোংরা এবং বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ গঙ্গায় পড়ছে।

(৪) বায়ুদূষণ—অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অনিবার্য ফলশ্রুতি হল পরিবেশ দূষণ এবং ভারতের ক্ষেত্রে দূষণের প্রত্যক্ষ উৎস হল গার্হস্থ্য বর্জ্য পদার্থ, সেচ, তাপবিদ্যুৎ, শিল্পায়ন এবং মোটর গাড়ি থেকে নির্গত দূষিত গ্যাস। শিল্পায়ন যানবাহন ব্যবস্থা এবং জ্বালানি থেকে বিরাট পরিমাণ পরিবেশ দূষণ হয়। এরই ফলে বাতাসে প্রচুর পরিমাণ সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড এবং সিসার পরিমাণ বাড়ছে। রাজ্য পর্ষদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের যৌথ এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ১৯৮৩ সালের পর থেকে সিসাযুক্ত স্পিরিট ব্যবহার প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ বেড়ে গেছে এবং তার ফলে বিহারে রাস্তার মোড়ে যেখানে যান চলাচল বেশি সেখানে চারদিকের বায়ুতে সিসা কলকাতা ও দিল্লীর চেয়ে প্রায় ৮ থেকে ১০ গুণ বেশি। এর কারণ পূর্ব এবং উত্তরে তৈল শোধনাগারগুলি যেভাবে টেট্রা ইথাইল সিসা (TEL) মিশ্রিত মোটর স্পিরিট তৈরি করে তাতে প্রতি লিটার স্পিরিটে ০.২৭% থেকে ০.৪৪% সিসা থাকে। এরই জন্য কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ পেট্রোল শিল্পগুলিকে এমনভাবে 'টেল' (TEL) মিশ্রিত স্পিরিট তৈরির নির্দেশ দিয়েছে যাতে প্রতি লিটারে ০.১৫ গ্রামের বেশি সিসা না থাকে। তাছাড়া জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য ১৯৬৪ সালে যে সালফার ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিল ১.৪১ মিলিয়ন টন, ১৯৭৯ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৩.২০ মিলিয়ন টন। আশঙ্কা করা যায় আগামী দিনে শিল্পায়ন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই দূষণ

আরো বাড়বে। ভারতের সমস্ত বড়ো বড়ো শহরে এই দূষণের মাত্রা উদ্বেগজনক। কলকাতার একটি পরিবেশ সংরক্ষক সংস্থার হিসাব অনুযায়ী কলকাতার জনবহুল ও রাস্তার সংযোগস্থলগুলিতে যেখানে প্রতি বর্গমিটারে দূষিত গ্যাস থাকার কথা ১০০ মাইক্রোগ্রাম, সেখানে তার পরিমাণ পাওয়া গেছে ৭০০/৮০০ মাইক্রোগ্রাম। এমনকি স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল এলাকাতে বাতাসের প্রতি বর্গমিটার ঘনত্ব হচ্ছে ২০০/৩০০ মাইক্রোগ্রাম।

আবাসন—

মানুষের সংখ্যা যত বাড়ে সম্পদ তত কমে। অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হয় তত বেশি। জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ, দূষণ—সবই পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোত সম্পর্কে আবদ্ধ। ভারতে পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার ১৬% লোক বাস করে ; অথচ সমগ্র পৃথিবীর মাত্র ২.৪% ভূখণ্ড জুড়ে রয়েছে ভারত। এর ফলে উদ্ভব ঘটেছে আবাসন ও বস্তি সমস্যার। প্রায় ২১ মিলিয়ন ভারতবাসী এই গৃহ সমস্যায় ভুগছে—গ্রামে ১৬ মিলিয়ন এবং শহরে ৫ মিলিয়ন। বস্তিবাসী লোকের সংখ্যা ২৮ মিলিয়ন থেকে ১৯৯০ সালে বেড়ে হয়েছে ৫৫.২ মিলিয়ন। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়েই বেড়েছে পানীয় জল এবং পয়ঃপ্রণালী এবং স্বাস্থ্য সমস্যা। ভারতবর্ষে মাত্র ৫% লোকের জন্য পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা আছে এবং নতুন যে শৌচাগারগুলি তৈরি হয়েছে মাত্র ৩% লোক সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। ভারতের মাত্র ৮টি শহরে পরিপূর্ণ পয়ঃপ্রণালী প্রথা আছে। জ্বালানি সংগ্রহের জন্য শুষ্ক এলাকায় কোনো কোনো মহিলাকে যে পরিমাণ হাঁটতে হয় সারা বছরে তা প্রায় ১,৪০০ কিমি অর্থাৎ কলকাতা থেকে দিল্লি।

১৯৯২ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় মাথাপিছু অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশ দূষণজনিত ক্ষতির একটা অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক আছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ২০২৫ সালের এই সমীক্ষাটি নিম্নরূপ—

প্রতি ১০টি গৃহের ৪টি গৃহে ব্যবহার্য জলের নিরাপত্তা থাকবে না।

প্রতি ৪টি গৃহের মধ্যে ১টি গৃহে যথেষ্ট স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থাকবে না।

আগামী ৩৫ বছরে শহরে জনবহুল জায়গায় সালফার ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাবে ৭০% ভাগ। আগামী ৩৫ বছরে শহরে মাথাপিছু আবর্জনার পরিমাণ বেড়ে হবে ১০০ কেজি থেকে ২০০ কেজি।

এই সমস্ত গ্লানিগুলির একটিই মাত্র প্রতিবিধান। তা হচ্ছে আগামী দিনগুলিতে উল্লেখযোগ্য হারে লোকসংখ্যা কমানো এবং গ্রাম ও শহরে স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধির আন্দোলন তৈরি।

১৪.৮ ভারতে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে আইন

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানব পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৭২ সালে প্রথম পরিবেশ সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির নাম হল National Committee on Environmental Planning and Coordination (NCEPC) । বৃহত্তর উন্নয়ন প্রচেষ্টায় পরিবেশের উপর প্রভাব বিষয়েই এই কমিটি সরকারকে সাহায্য ও পরামর্শ দেবে। দুঃখের কথা, কার্যক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মের উপর এই কমিটির কোনো প্রভাবই ছিল না। এই বছরেই (১৯৭২ সাল) বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন পাশ হয়। এই আইনে সংরক্ষিত বিধানগুলি হল—প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ উপদেষ্টা পর্ষৎ গঠন ; বন্য প্রাণী ও পাখি শিকার নিষিদ্ধ করা ; অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করে পশু ও পাখি সংরক্ষণে কতগুলো

এলাকাকে চিহ্নিত করা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল প্রত্যেক রাজ্যের বনদপ্তরের সাহায্য নিয়ে এখনও পর্যন্ত এই আইন বাস্তবায়িত হয়নি এবং বন্য পশুপাখি নির্বিচারে শিকার যেমন চলছিল তাই চলছে। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রথম আইন পাশ হয় ১৯৭৪ সালে—জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন বা সংক্ষেপে জল আইন, ১৯৭৪। এই আইনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পর্ষৎ গঠন করে উভয়ের সমন্বিত প্রয়াসে জলদূষণ নিয়ন্ত্রণের এবং দূষণ সম্পর্কিত বিতর্ক সমাধানের কথা বলা হয়। রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে কেন্দ্রীয় পর্ষৎ জলাশয় ও কুয়োর জলের মান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে পারবে। ১৯৭৭-৭৮ সালে জল আইন সংশোধিত হয় এবং তার দ্বারা শিল্প ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা ব্যবহৃত জলের জন্য জলকর স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। এইভাবে রাজ্য পর্ষৎগুলি অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত করা হয়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও জল আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ সম্বন্ধে রাজ্য সরকারগুলি যথেষ্ট মন্থর গতি। কারণগুলি হল—(ক) রাজ্য জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আর্থিক অক্ষমতা ; (খ) ব্যবস্থা কার্যকরী করার ব্যাপারে ব্যক্তিগত অধিকারের অভাব ; (গ) জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সংকীর্ণ এলাকা এবং বিভিন্ন শিল্প কর্তৃক জলদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত দক্ষ উপদেষ্টা ও বিশেষজ্ঞের অভাব। আশ্চর্য হল দুটি প্রধান ক্ষেত্রে আইনটি ব্যবহৃত হল না—(১) গার্হস্থ্য ও পৌর অঞ্চলে ব্যবহারের ক্ষেত্রে। যেখানে থেকে সমগ্র বর্জ্য পদার্থের ৯৯% ভাগ আসে। (২) ড্রেন থেকে নির্গত ময়লা যা সমগ্র বর্জ্য দূষণের ৭০%। এছাড়া আইনের মধ্যেই রয়েছে ফাঁক। সরকারি কর্তৃপক্ষ আইন ভঙ্গকারীকে ধরতে পারে না, পারলেও তাকে শাস্তি দিতে পারে না।

১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইনের দ্বারা পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে অনেক কার্যকরী করা হয় এবং বিচারবিভাগকে হস্তক্ষেপের অনেকখানি ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই সংশোধনী আইন প্রণয়নের ফলে পরিবেশজনিত সমস্যা সমাধানে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েরই অনেকখানি দায়িত্ব বাড়ে। তাছাড়া এই আইনের বলেই বন ও বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাজ্য তালিকা থেকে কেন্দ্রীয় তালিকায় হস্তান্তরিত হয় এবং প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়নের ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

পরবর্তী পদক্ষেপ হল ১৯২৭ সালের ভারতীয় বন আইনের সংশোধন। এই সংশোধনী জাতীয় বন আইন, ১৯৫২ নামে পরিচিত। এই সংশোধনীতে সমগ্র ভারত ভূখণ্ডের ৩০% বনভূমি হিসাবে রাখার ব্যবস্থা হয় এবং রাজ্য সরকার যাতে বাণিজ্যিক কারণে বনসম্পদ ব্যবহার করতে না পারে এবং সংরক্ষিত মর্যাদা থেকে কোনো বনকে অসংরক্ষিত করতে না পারে তার ব্যবস্থা হল এই আইনে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও সংহত পরিকল্পনার অভাবে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বনভাগ ভারত ভূখণ্ডের ২০% বেশি হতে পারেনি। এরই জন্য ঐ সময় শুরু হয় সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প। কিন্তু প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ এবং রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে বিরোধের ফলে পরিচালকবর্গের দূরদৃষ্টির অভাবে সামাজিক বনসৃজন প্রকাশিত ফল লাভে সমর্থ হয়নি।

তেওয়ারী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৮০ সালে একটি পৃথক পরিবেশ দপ্তর গঠিত হয় এবং ১৯৮৫ সালে তা পরিবেশ ও বনসংরক্ষক মন্ত্রকের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই দপ্তরের কাজ হল—উন্নয়নমূলক কাজগুলির পরিবেশের উপর প্রভাব মূল্যায়ন করা, অত্যন্ত বিপজ্জনক এলাকার পরিবেশ পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৮১-র তিনটি ত্রুটি ছিল—সমস্ত দায়িত্ব ভারার্পিত হয় জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উপর। এই পর্ষৎ নিজেই দায়িত্বের বোঝায় ভারাক্রান্ত ছিল এবং আপন দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত যথেষ্ট আঙ্গিক ক্ষমতা ও দক্ষতা ছিল না। তাছাড়া, চলমান বস্তুর উপর এই আইনের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তৃতীয়, দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইনে বাস্তব সাফল্যের কোনো পরিমাপকের বন্দোবস্ত করা হয়নি। ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কতগুলি নূতন পরিবেশ আইন পাশ হয়। তার মধ্যে প্রথম হল—১৯৮৬ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (Environmental Protection Act, 1981) এই আইন জল এবং বায়ুদূষণ রোধে পূর্ববর্তী বিকেন্দ্রিভূত ক্ষমতার অস্তিত্ব বাতিল করে

কেন্দ্রকে অনেক নূতন ক্ষমতা প্রদান করে। এখন থেকে পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী হলে বনদপ্তর কোনো শিল্পসংস্থাকে সরাসরি বন্ধ করে দিতে পারে এবং এই আইনের দ্বারা উপযুক্ত প্রতিবিধানের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিবেশ দূষণকারী সংস্থার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার দেওয়া হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে এই আইনে শব্দ দূষণের কথা বলা হয়নি।

ভূপাল দুর্ঘটনার পরে আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন হল—কারখানা (সংশোধিত) আইন, ১৯৮৭ (Factories Amendment Act, 1987) এই আইনের দ্বারা কলকারখানায় অত্যন্ত বিপজ্জনক দ্রব্য ব্যবহারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলা হয় ; অন্যথায় কঠোর শাস্তির ব্যবস্থাও করা হয়। এই আইন প্রবর্তিত হওয়ার পরে স্থানীয় বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ, প্রশাসক এবং শ্রমিকদের প্রতিবেদন থেকে বিপজ্জনক এবং বিস্ফোরক তথ্যাদি পাওয়া যায়। এই আইনের দ্বারা কলকারখানার কর্মীদেরও কারখানা পরিচালনায় দূষণ সৃষ্টিকারক ব্যবস্থা ও দ্রব্যাদির বিরুদ্ধে কারখানার পরিদর্শককে তথ্যাদি সরবরাহের অধিকার দান করা হয়। কারখানায় ব্যবহার্য বহু রাসায়নিক দ্রব্যের বিস্ফোরণ মাত্রাও স্থির করে দেওয়া হয় এই আইনে।

ভূপালে গ্যাস দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে পরিবেশসংক্রান্ত তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ আইনটি হল—বিপজ্জনক শিল্পে শ্রমিক বিমাকরণ আইন, ১৯৯১—এই আইনের দ্বারা অত্যন্ত বিপজ্জনক দ্রব্য ব্যবহার করার সময় রাষ্ট্রের লাইসেন্সপ্রাপ্ত শিল্প কারখানার ব্যক্তিগণ যদি কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে তাহলে তাদের দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক সাহায্য দিতে হবে।

১৯৯২ সালে পরিবেশ সংরক্ষক দ্বিতীয় সংশোধনী আইন পাশ হয়। এই আইনের দ্বারা প্রত্যেক শিল্পসংস্থাকে প্রতি বছর মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে হিসাবপরীক্ষক কর্তৃক অনুমোদিত একটি পরিবেশগত প্রতিবেদন দানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যথেষ্ট প্রশিক্ষণের ও মডেল অডিট রিপোর্টের কোনো তথ্য সামনে না থাকায় এই ব্যবস্থাটি প্রায় অকার্যকরই থেকে যায়।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এ কথা বলা যায়,১৯৭২-৯২ সময়কালের মধ্যে পরিবেশ সংকান্ত কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন ও নীতি গহণ করা হয়েছে, যদিও সরকারের আইনের উদ্দেশ্য ও বাস্তব ফলশ্রুতির মধ্যে এখনও যথেষ্ট ফারাক লক্ষ্য করা যায়।

ভারতে অনুসৃত পরিবেশ নীতির মূল ত্রুটি-ভারতে অনুসৃত পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ও নীতিগুলির কয়েকটি বিশেষ ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, অগ্রাধিকারের ত্রুটি অথবা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণার অভাব সমগ্র উদ্দেশ্য কি স্থিতাবস্থা বজায় রাখা নাকি পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিষ্কার কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ তা বোঝা যায় না। ড্রেন থেকে নির্গলিত নোংরা বা আবর্জনা নিয়ন্ত্রণে ভারতে একটি সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ; কিন্তু তা কার্যে পরিণত করা খুব কঠিন। যথা—চলমান দূষণকারী ব্যবস্থাগুলি এখনও ঐ আইনের আওতায় আসেনি, যদিও বড়ো বড়ো শহরগুলিতে যানবাহনই হল সবচেয়ে বেশি দূষণ সৃষ্টিকারী। তাছাড়া শহরের যে আবর্জনা যা মোট আবর্জনা স্তূপের ৯০% তাকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা হয়েছে। জরুরি পদক্ষেপ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক আইনের অভাবও ভারতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার একটি ত্রুটি। যে দূষণ করবে সঙ্গে সঙ্গে তার কাছ থেকে শাস্তি হিসাবে আর্থিক ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো ব্যবস্থা ভারতে করা হয়নি (Polluter Pay Principle) । নতুন নতুন প্রকৌশলগুলিরও যথেষ্ট পরিবেশ অনুকূল প্রভাব আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা দরকার। যেহেতু ব্যবস্থা নির্ধারণে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয়, সেজন্য মন্ত্রকও যথেষ্ট কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে না। আইনগুলির বিধানও এত সামগ্রিক যে গার্হস্থ্য, শিল্পমধ্যস্থ ফার্ম এবং একটি সমগ্র শিল্পের মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না এবং তদনুরূপ ব্যবস্থাও অবলম্বন করতে পারে না।

এইভাবে ১৮৫৩ সালের বোম্বে ও কোলাবা দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে একেবারে ভূপাল দুর্ঘটনা পর্যন্ত পরিবেশ সংরক্ষক ২০০০টি আইন পাশ হয়েছে। কিন্তু সাফল্যের মাত্রা খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

১৪.৯ ভারতবর্ষে পরিবেশ সংরক্ষক বেসরকারি সংস্থা

উল্লেখযোগ্য বেসরকারি পরিবেশ সংরক্ষকগোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রধান হল—তেহ্‌রী বাঁধ বিরোধী সমিতি, বিশ্‌থপীঠ মুক্তি বাহিনী (Vishthapith Mukti Vahini), নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন (Narmada Bachao Andolan, the UNTACH) ইত্যাদি। এই গোষ্ঠীগুলি অধিকাংশই অরাজনৈতিক, যদিও এর নেতৃত্ব ও সমর্থন দানকারী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রাজনৈতিক দলীয় আনুগত্য লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ স্থানীয়; অর্থ সংস্থানের উপায় স্থানীয় এবং আন্দোলনের কৌশল হল বন্ধ, ধর্মঘট, মোর্চা অথবা রাজনৈতিক দল বা গণ মাধ্যমগুলির সঙ্গে যৌথ জনমত তৈরি। উদ্দেশ্যগুলি হল—

- পরিবেশগত ধ্বংস রোধ।
- জনস্বাস্থ্য ও জননিরাপত্তা বিধায়ক ব্যবস্থা।
- কৃষিযোগ্য বা বাসস্থান জলে নিমজ্জিত যাতে না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন।
- প্রাণী এবং উদ্ভিদকুলের ধ্বংস রোধ করা।
- উন্নয়নশীল প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

১৪.১০ পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে কয়েকটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বেসরকারি সংস্থার আন্দোলন ও প্রয়াস

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল বাঁধ বিরোধী (Anti dam) নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন (NBA)। এটি এরই মধ্যে Right Livelihood Award লাভ করেছে, যে পুরস্কারটি নোবেল পুরস্কারের মতো সমাদৃত। ৯,০০০ কোটি টাকার নর্মদা বহু স্বার্থ সাধক প্রকল্প যেভাবে গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টক থেকে আরবসাগর পর্যন্ত ৯০০ মাইল, প্রায় ১ লাখ লোক যাদের মধ্যে অধিকাংশই আদিবাসী, গৃহ ও জীবিকা থেকে বঞ্চিত হবে। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন বাবা আমতে; বর্তমানে মেধা পাটকার এই আন্দোলনটিকে একটি সর্বভারতীয় আন্দোলনের রূপদান করেছেন। আন্দোলনের নেতৃত্ব একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিকে পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য করেছে, অন্যদিকে তেমনি যেকোনো প্রকল্প নিছক উন্নয়নের নামে পরিবেশকে বিপর্যস্ত না করে সেদিকে জনমত তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। শেষপর্যন্ত সুপ্রীমকোর্ট সরদার সরোবর বাঁধ নির্মাণে সবুজ সঙ্কেত দিলেও এই আন্দোলন যে জনগণের পরিবেশ সচেতনতাকে বৃদ্ধি করেছে এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঁধ বিরোধী দ্বিতীয় বেসরকারি আন্দোলনগোষ্ঠীর নাম হল তেহরী বাঁধ বিরোধী সমিতি। ৩,৪৬৫ কোটি টাকার তেহরী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে গাড়োয়াল-হিমালয় অঞ্চলে ভাগীরথীর উভয়তীরে ২৬০ মিটার উঁচু বাঁধ তৈরি করে প্রায় ৩৫০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ তৈরিই ছিল এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রায় ৩০ বছর আগের এই প্রকল্প ১৯৯১ সালে বনদপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু ১৯৯১ সালের অক্টোবরে প্রবল ভূকম্পে প্রায় ২,০০০ জনবসতি

এলাকা ধ্বংস হয় এবং ৮০০ লোক মারা যায়। তারপর থেকেই এই প্রকল্পের নিরাপত্তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়। তেহরী বাঁধ বিরোধী শিবির সরকারি প্রয়াসের প্রবল বিরোধিতা প্রদর্শন করতে থাকে। তারপর থেকেই এই প্রকল্পটি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও পরিবেশবিদদের মধ্যে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও যে সমস্ত এলাকা ও প্রকল্পকে ঘিরে সরকার ও পরিবেশবিদদের মধ্যে প্রবল বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি হল—বোম্বের ১২৫ কিমি উত্তরে দাহানু কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প ; বিহারে সুবর্ণরেখা প্রকল্প ; উড়িষ্যার বালিয়াপাল জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা কেন্দ্র ; নারোরা, কাকরাপাড়া ও কাইগা আণবিক শক্তি কেন্দ্র এবং তামিলনাড়ু ইস্টকোস্ট রোড প্রকল্প। চিল্কায় মৎস্যজীবীদের স্বার্থে মাছের বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নতুন এক প্রকল্প গৃহীত হয়। কিন্তু নতুন এই প্রযুক্তি প্রয়োগে এবং মাছের বংশবৃদ্ধির জন্য যে প্রোটিন খাদ্য ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হবে তাতে হ্রদের ক্ষতি হবে। এই আশঙ্কায় উড়িষ্যার চিল্কায় মৎস্যজীবীদের স্বার্থে চিল্কা বাঁচাও আন্দোলন এবং পশ্চিমবঙ্গে নিম্ন দামোদর প্রকল্প। এছাড়াও ভারতের জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য আরো অনেক সংগঠন ও আন্দোলন এবং তাদের শাখা-প্রশাখা সারা ভারতে কাজ করে চলেছে। আছে সম্প্রদায়ভিত্তিক কতগুলো গোষ্ঠী। যথা—(1) National Fisher Workers Federation: (2) The Association for the Propagation of Indegenous Genetic Resources: (3) The Foundation for the Revitalisation of local Health Traditions: (4) Academy of Development Studies at Karjal, Maharastra.

মৎস্যজীবীদের স্বার্থে প্রথমটি একটি সর্ব ভারতীয় সংগঠন। গভীর সমুদ্রে অত্যধিক যন্ত্রনৌকা ব্যবহারে মৎস্য উৎপাদন এবং সামুদ্রিক পরিবেশ যাতে নষ্ট না হয় তা দেখাই এই ফেডারেশনের প্রধান উদ্দেশ্য।

চিরাচরিত কৃষিপ্রথা ও খাদ্যশস্য ও বীজ রক্ষাই দ্বিতীয় সংস্থাটির উদ্দেশ্য।

ওষধি সংরক্ষণ এবং গাছ-গাছড়া থেকে প্রস্তুত ঔষধের ব্যবহার সম্প্রসারণ হল তৃতীয় সংস্থাটির মূল লক্ষ্য।

চতুর্থ সংস্থাটি কেন্দ্রীয় কৃষি প্রকল্পের সঙ্গে সম্প্রদায় ভিত্তিতে বীজ ভাণ্ডার গড়ে তোলে এবং বিভিন্ন শস্য প্রকল্পের উৎপাদনের হার ও বৈশিষ্ট্য রেকর্ড করে।

সমাজসেবীদের এই সমস্ত আন্দোলন সরকারি প্রকল্পগুলির সঙ্গে পরিবেশ সংরক্ষণের একটা ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করছে। এই সমস্ত প্রকল্পের ফলে গরীব মানুষ বিশেষ করে উপজাতীয় যাতে নিরাশ্রয় না হয়ে পড়ে তার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে এবং পরিবেশ সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলনগুলির আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাম হল—চিপকো আন্দোলন (Chipko Movement) বন সংরক্ষণ সম্পর্কে এটিই প্রথম প্রকৃত গণআন্দোলন। বনবাসী মানুষের স্বার্থ বিরোধী ১৯৩০ সালের বন আইনের বিরুদ্ধেই এই আন্দোলন সংগঠিত হয়। ব্রিটিশ শাসকগণ কঠোর হাতে আন্দোলনকারীদের দমন করলেও স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরে ১৯৭০ সালে গান্ধীবাদী একজন সমাজসেবীও সর্বোদয় কর্মী সরলা বেনের নেতৃত্বে এই আন্দোলন আবার একটি গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। এই আন্দোলন একসময় এত জোরদার হয় যে মানুষের প্রতিরোধের সামনে পুলিশ ও কনট্রাকটারদেরও পিছু হটতে হয়। ১৯৭৭ সালে এই আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। উপজাতি অধ্যুষিত উত্তরাঞ্চলে হিমালয়ের বহু এলাকায় জঙ্গল নিলামে বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে উপজাতীয় মহিলারা ঘর ছেড়ে এসে বন পাহারা দেবার জন্য সমবেত হয় এবং সরকারি প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ পর্যবসিত করে। এই আন্দোলনের সঙ্গে নেতৃপদে বিভিন্ন সময়ে যুক্ত হন—সুন্দরলাল বহুগুণা, চন্ত্রিকা প্রসাদ, সরলা বেন এবং মীরা বেন প্রমুখ সমাজসেবীগণ।

১৪.১১ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় পরিবেশ সংরক্ষণ

স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাধীনে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টিকে দুভাবে আলোচনা করা যেতে পারে—প্রথমত, কৃষি ও সেচ উন্নয়ন এবং পরিবেশ। দ্বিতীয়ত, পঞ্চায়েত ও পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিবেশ সংরক্ষণজনিত আনুষ্ঠানিক কাজ ও দায়-দায়িত্ব। প্রথমটি অনিবার্যভাবেই এটি গ্রামীণ সমস্যা এবং গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির এই সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করতে পারে।

কৃষি উৎপাদনের একটা নিয়ম আছে। উৎপাদনের উপাদান বাড়ালে উৎপাদন বাড়ে ঠিকই ; কিন্তু সেটাও একটা সীমা পর্যন্ত। তাকে অর্থনীতির নিয়মে "Economic break even point" বা উৎপাদনের ভারসাম্য অবস্থা বলা যেতে পারে যেখানে প্রান্তিক ব্যয় এবং প্রান্তিক উপকার সমান। এই ভারসাম্য বিন্দুতে পৌঁছেও যদি আরো উপাদান যোগ করা যায় তাতে ঐ জমির উৎপাদক ক্ষমতা কমে যাবে। ফলে ঐ জমির জৈব-ভৌত অবস্থা বিপর্যস্ত হবে। অনেক সময় ব্রেক পয়েন্টে পৌঁছানোর পূর্বেই এমন বিপর্যয় ঘটতে পারে ; বাড়তি কিছু উপাদান, যথা—সেই জমি যদি নীচু হয় এবং জমিতে যথেষ্ট পলি মাটির সরবরাহ থাকে, জলসেচের উপযুক্ত বন্দোবস্ত থাকে তাহলে ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছানো পর্যন্ত উৎপাদন বাড়তেও পারে। নিবিড় সেচ প্রকল্পও কিন্তু এই ভারসাম্য বিধানে সব সময় সহায়তা করে তা নয়। ভারতে এই সেচ প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ভারতে সেচ এলাকাভুক্ত ২৫% জমি হয় জলমগ্ন থাকে অথবা লবণাক্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ কৃষি উৎপাদনের পদ্ধতি প্রকরণ পরিবেশ দূষণগত সমস্যা তৈরি করতে পারে। যদি উৎপাদন ও উপাদানের নিয়মমাফিক অনুপাতটি মানা না হয় এবং ঐ এলাকার জৈব-ভৌতিক চাহিদার তোয়াক্কা না করে সমানে জমির ক্ষমতা ও প্রয়োজন বিচার না করে উৎপাদন শুরু হয়। পরিবেশ দূষণের দ্বিতীয় কারণ হল—ফসলের পরিবর্তন। যথা—রবি শস্যের পরিবর্তে খরিফ শস্যের উৎপাদন।

পতিত বা অনাবাদী জমি উদ্ধার করে অনেক সময় উৎপাদন বৃদ্ধির কথা শোনা যায়। কিন্তু অনেক সময় অনাবাদী এই নীচু জমিগুলি বৃষ্টির জল ধরে রাখে। তাদের উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করলে জলো জমির পরিমাণ কমে যাবে, বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, গরু-ছাগলের খাদ্য কমে যাবে, প্রচুর ফসল নষ্ট হবে। সব মিলিয়ে উৎপাদন কমে যাবে, বাড়বে ছদ্ম বেকারের সংখ্যা। এইভাবে বিকল্প ফসল ফলাবার বা পতিত জমি উদ্ধার করে উৎপাদন বাড়াবার নির্বিচার কৃত্রিম প্রচেষ্টায় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, নচেৎ তার ফলে প্রকৃতি ও পরিবেশকেই নষ্ট করা হয়।

এক এক এলাকার জৈব ভৌত পরিস্থিতি এক একরকম। তা বিচার না করে নেহাৎ প্রযুক্তিগত কৌশলের সাহায্য নিয়ে যদি ফসল পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয় তাহলে চূড়ান্ত পর্যায়ে তা পরিবেশকেই নষ্ট করবে। যে জমি নিবিড় উৎপাদন সহ্য করতে পারবে সেখানেই কেবল উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা করা যায়, নচেৎ তা জমির উৎপাদনশীলতাকে স্থায়ীভাবে নষ্ট করবে। পঞ্জাবে ৬০-এর দশকে 'সবুজ বিপ্লব নামে' যে উচ্চ ফলনশীল বীজ (HYV) ব্যবহার করা হয়েছিল পরিবেশের উপর তার প্রভাব নিয়ে প্রবল বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছে। দেখা গেছে গম বা ধানের উৎপাদন বেড়েছে ঠিকই কিন্তু অন্য উৎপাদন কমেছে। ধানগাছের বোঁটা বা গুচ্ছ ছোটো হয়ে গেছে, ঘর ছাইবার জন্য অথবা গোরুর খাবারের জন্য যে খড় তার পরিমাণ কমে গেছে। জৈবসারের পরিবর্তে রাসায়নিক সার এবং মানব শক্তির পরিবর্তে যন্ত্রশক্তি—এটাই যেন সবুজ বিপ্লবের প্রধান কথা ছিল। খড়ের গুণগত ও পরিমাণগত সংকোচন যে জৈব স্তরের (Bio-mass) পরিবর্তন ঘটাতে পারে সেদিকে কোনো নজরই ছিল না। ভাবা হয়েছিল কেবল রাসায়নিক সার প্রয়োগ করেই সেটিকে পুষিয়ে নেওয়া যাবে। তাছাড়া খাদ্যশস্য, ডাল, তৈলবীজ চাষের প্রচলিত পদ্ধতি তার ফলে ডালে বাড়তি প্রোটিন এবং খাদ্যশস্যে বাড়তি ক্যালোরি যুক্ত হয়। সে দিকটি কিন্তু উপেক্ষিত হল। ডাল জাতীয়

শিম্ব সংক্রান্ত (leguminous) খাদ্য উৎপাদন নাইট্রোজেনের ব্যবহারকে সীমাবদ্ধ করে রাখে। তাই পরিবেশের উপরও এই ডাল চাষের একটি ভূমিকা আছে। সবুজ বিপ্লবের কেবল ধান বা গম চাষের নির্বাচন পদ্ধতি মাটির অবক্ষয়ের কারণ ঘটায়। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সবুজ বিপ্লবের নামে গমবীজের যে জিনটি উদ্ভাবিত হয়, যা নোরিন ১০ (Norin 10) নামক একটি জাপানী প্রজাতি থেকে তৈরি অথবা একটি তাইওয়ান প্রজাতি থেকে উচ্চ ফলনশীল যে ধানবীজ তৈরি হয় তারা হয়তো রাসায়নিক সারকে খুব নিপুণভাবে খাদ্যে রূপান্তরিত করতে পারে, কিন্তু পুরানো জিনটির বৈচিত্র্য অনেক বেশি। তাই তার বাস্তুব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও উৎপাদকতা তৈরির ক্ষমতা অনেক বেশি। তাছাড়া এই নতুন পদ্ধতি ফসলে পোকা ও নানারকম রোগের উপদ্রবও সৃষ্টি করে তুলনামূলকভাবে বেশি। পোকা এবং বিভিন্ন ধরনের গাছের রোগ সারানোর জন্য কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার সামগ্রিক ব্যয়কে বাড়িয়ে দেয়।

সবুজ বিপ্লবে যে উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার করা হয়েছে তার উৎপাদন বাড়ানোর জন্য অতিরিক্ত হারে যেভাবে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম ব্যবহার করা হয়েছে তার ফলে পরবর্তীকালে জমির মাটির মৌলিক উপাদান দস্তা, লোহা, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি কমে যাওয়ার ফলে জমির পুষ্টিবিধায়ক খাদ্যাণু (micronutrient) কমে যায় এবং জমির সামগ্রিক উৎপাদকতা হ্রাস পায়। জৈব সার ব্যবহারে কিন্তু এই ঘাটতি দেখা যায় না। জৈব সারের মাধ্যমে জমির পুষ্টি তৈরি হয় এবং এই পুষ্টি পুনরায় মাটিতে মিশে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্ত এবং নিরবচ্ছিন্ন থাকে। সবশেষে বলা যায় উচ্চ ফলনশীল বীজের ক্ষেত্রে ফসলের যে অসম্ভব জলতৃষ্ণা ঘটে তা মেটানোর জন্য মাটির উপরের এবং তলার সমস্ত জল ব্যবহার করতে হয়। এর ফলে ঐ অঞ্চলে জলের ভারসাম্য নষ্ট হয়। প্রচলিত চাষবাসের ব্যবস্থা সেচের যতটুকু সুযোগ আছে তার সদ্ব্যবহার করলেই হয়। কিন্তু নতুন এই ব্যবস্থার নবতর আধুনিক বীজের উৎপাদকতার জন্য প্রচুর পরিমাণ জল ব্যবহারের প্রয়োজন হয় এবং এই বাড়তি জল বাস্তুব্যবস্থার মধ্যে যে প্রাকৃতিক সুরক্ষা আছে তাকে বিনষ্ট করে। বাস্তুব্যবস্থায় জলের যে বৃত্ত আছে তাকে বিনষ্ট করে।

একইভাবে কৃষিব্যবস্থায় নিবিড় সেচের প্রয়োজনে যে বড়ো বড়ো জলভাণ্ডার বা বাঁধ তৈরি হয় তাতে যে খাত বেয়ে বৃষ্টির জল ঐ জলাধারে পড়ে সেখানে প্রবল ভূমিক্ষয় হয়, আবার পলি জমে জমে জলের আগমনপথ রুদ্ধ হয়। জলাধারের মজুত জলের পরিমাণ কমতে থাকে। নদীকে নাব্য রাখার জন্য অন্যদিক থেকে লিঙ্ক খাল কেটে নিয়ে এসে ফেলতে হয়। পঞ্জাবের পং বাঁধ থেকে ভাক্রা বাঁধ পর্যন্ত বিপাশা ও শতদ্রুর মধ্যে এরকম একটি লিঙ্ক খাল করতে হয়েছে। এইসব কিছুর ফলে ঐ এলাকার পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বড়ো বড়ো জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি তৈরি করার সময় প্রবল শক্তিসম্পন্ন ডিনামাইট বিস্ফোরণ এবং নির্বিচার বৃক্ষছেদনের ফলে ঐ অঞ্চলে প্রাকৃতিক ঝর্না ও ছোটো ছোটো জলের নালীগুলো বন্ধ হয়ে যায়।

নুড়ি ও পাথরের টুকরো, নদীখাতের পলি নদীবাহিত হয়ে বাঁধ বা জলাধারে আটকা পড়ে পড়ে নদীখাত সরে যায় ; পরিত্যক্ত সেই নদীখাতে আশ্রয় নেয় উঁচু থেকে গড়িয়ে পড়া ইট, পাথর। এই অবস্থাটি মাছের বংশবৃদ্ধির পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক।

এইভাবে বাঁধ বা জলাধারগুলি পরিবেশের উপর নিম্নলিখিত প্রভাবগুলি ফেলে—

(১) নদীউপত্যকা থেকে জলাধার পর্যন্ত নদীপথের উপরের দিকে নদীর গতিপথ পরিবর্তন।

(২) পলিস্তরের প্রভাবে নদীপথের নীচের দিকে বাঁধ, বদ্বীপ, মোহনা, নদীর পাড় প্রভৃতি সংস্থান পাল্টে যায়।

(৩) নদীজলের তাপ, খাদ্যাণু, পঙ্কিলতা, ভারী ধাতব পদার্থ, খনিজ বস্তু ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটে।

(৪) নদীজল মধ্যবর্তী বস্তু ও প্রাণী আটকে যাওয়ার জন্য জৈব বৈচিত্র্য ব্যাহত হয়।

(৫) নদীজলের প্রবাহ ও পরিমাণ ঋতুবিশেষে হঠাৎ পরিবর্তন হয়।

(৬) বন্যা হওয়ার ফলে নদীর আশেপাশে পলি জমে এবং ঐ অঞ্চলের বাস্তুব্যবস্থার স্বাভাবিক যে পরিবর্তন হতে পারতো বাঁধ হওয়ার ফলে তা আটকে যায়।

বাঁধ নির্মাণ ও তার যৌক্তিকতা বিষয়ে ভারতের ক্ষেত্রে একটি তীব্র সমালোচনার বিষয় হল—বাস্তুত্যাগী মানুষের সংখ্যা ও পুনর্বাসনের সমস্যা। বাস্তুব্যবস্থার উপর এর কুপ্রভাবও কম নয়। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে ঠিকই ; কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। সমস্যাটি আরো প্রকট হয় যখন দু-তিনটি রাজ্য একটি বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্রত্যেক রাজ্যই বাঁধের সবটুকু সুবিধা আদায় করে নিতে চায়, কিন্তু বাস্তুত্যাগী মানুষের পুনর্বাসনের কোনো দায়িত্ব নিতে চায় না। এই বাস্তুহারা মানুষগুলোর অধিকাংশই গ্রামের গরীব মানুষ। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি সমীক্ষাসূত্রে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে ১১০ টি প্রকল্পে ১৬লক্ষ ৯৪ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৮লক্ষ ১৪ হাজারই হল উপজাতীয় গোষ্ঠীর এবং বাকি মানুষগুলোর মধ্যে অধিকাংশ জনজাতিগোষ্ঠী। আশঙ্কা করা হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে নর্মদা এবং তার শাখানদীগুলির উপর পরিকল্পিত বাঁধগুলি ২৫বছরে প্রায় ১ লক্ষ লোককে বাস্তুহারা করবে, ৩ লক্ষ ৫০ হাজার বন এলাকা এবং ২লক্ষ হেক্টর কৃষিজমি জলপ্লাবিত করবে। এইভাবে বাঁধ প্রকল্পগুলি বিশেষ করে নদীর উজানে (downstream) বিপুল এলাকার পরিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্ট করে। পশ্চিমবঙ্গে ফারাক্কা বাঁধ যেভাবে গঙ্গা ও পদ্মার জলবন্টন করেছে তাতে গঙ্গার ভাগে জল কমেছে। ফলত পলি পড়ে কলকাতা বন্দরের জাহাজ চলাচল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

গ্রামে পরিবেশ দূষণের আর একটি উত্তেজক অনুপাত হল কীটনাশক ঔষধ। কীটনাশক ঔষধ মাটির জলের সঙ্গে মিশে গিয়ে জলের সম্পূর্ণ ব্যবস্থাকেই দূষিত করে। জলের খাদ্যাণু নষ্ট হওয়ায় জলের মধ্যে মাছের বংশবৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কীটনাশক ঔষধ এক ধরনের বিষ। কৃষকদের ঘরে ঘরে এর ব্যবহার। পরিবারের সকলে মিলে নির্বিচারে ব্যবহার করে। এর ফলে শিশুদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে ; এমনকি বিশেষজ্ঞদের মতে মানুষের সন্তান প্রজনন ক্ষমতা পর্যন্ত কমে যায়। এর ক্ষতিগুলো হয় সাধারণ কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না থাকায়। স্থানীয় ভাষায় বোতলে নাম লেবেল থাকা দরকার। এমনকি অনেক সময় এই ঔষধ ব্যবহারের পর হাত মুখ ভালো করে ধোয়ার অভ্যাসও নেই। ঐ কাপড়-চোপড় পরেই ঘরে ঢোকে এবং বাড়ির নানা সদস্যদেরও সংক্রামিত করে। হয়তো যে পাত্রে তা ব্যবহার করা হয়েছে ঐ পাত্রেই পানীয় জল সংরক্ষণ করা হল, কীটনাশক ঔষধ থেকে দুরারোগ্য রোগ, এমনকি ক্যানসার পর্যন্ত হয়। শিশুদের বেড়ে ওঠার ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করে এবং রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

আজকাল কীটনাশক ঔষধের বহু বিকল্প বেরিয়েছে। যেমন— Integrated Pest Management (IPM) এর দ্বারা প্রাকৃতিক জৈব উপাদানগুলি দ্বারাই পোকামাকড় মারার একটা অ-রাসায়নিক ব্যবস্থা তৈরি হয়। এই ব্যবস্থাগুলি হল—শস্যের আবর্তাকার চাষ। একাধিক শস্যের ফলন অথবা যে সময়ে পোকামাকড়ের বংশবৃদ্ধি হয় তার আগে বা পরে ফলন। প্রধান চাষ থেকে দূরে এমন সব গাছ লাগানো যেখানে পোকামাকড় আকৃষ্ট হবে। তাই রাসায়নিক ব্যবস্থার পরিবর্তে জৈব নিয়ন্ত্রণ (Biological control) প্রয়োজন। জৈব নিয়ন্ত্রণ বলতে বুঝায় প্রাকৃতিক শিকার, পরগাছা এবং রোগ নিয়োগ যা পোকামাকড়ের ক্ষতি করার মারাত্মক নিয়ন্ত্রণে রাখবে। ভারতে এবং চিনে শস্য, তুলা, ধান এবং আখ গাছের পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য এক ধরনের পরগাছা বোলতা (Trichorgamma) তৈরি করেছে। এর জন্য নিশ্চিতভাবে আমাদের জৈব প্রযুক্তিবিদ্যার আশ্রয় নিতে হবে যার দ্বারা এক ফসলের জিন অন্য ফসলে রূপান্তরিত করা যায়। কিন্তু এই জিন রূপান্তরের বিপদগুলিও অবহিত হওয়া দরকার। পরিবর্তিত/রূপান্তরিত

জিন নিয়ে তৈরি যে চারাগাছ বা সূক্ষ্ম অঙ্গাণু প্রাকৃতিক জৈব ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করতে পারে। প্রচলিত চারাগাছ বা শস্যাদির সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ঘটিয়ে নতুন ফসল প্রচলিত বাস্তুব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটাতে পারে। তাছাড়া জৈব প্রযুক্ত ব্যবহারের অন্য একটি বিরাট অসুবিধা হল বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকার সম্পর্কিত বিধি যার দ্বারা জৈব প্রযুক্তি দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যটিকে 'প্যাটেন্ট' দেওয়া হয়। 'জিন' দ্রব্যগুলো সব আসে বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে। অথচ উন্নত প্রযুক্তি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের মালিকানা নিয়ে উন্নত দেশগুলিই এই 'জিন' দ্রব্যগুলো থেকে প্যাটেন্ট বানায়। কথা উঠেছে তার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেবার। উদাহরণ স্বরূপ ভারতের ক্ষেত্রে নিম এবং বাসমতি চাল নিয়ে প্যাটেন্ট বিতর্কের উল্লেখ করা যায়। ১৫৭টি দেশ নিয়ে রিও ডি জেনেরোতে ১৯৯২ সালে জৈব বৈচিত্র্যের উপর যে সমাবেশ হয়েছিল তাতেও এই ক্ষতিপূরণের উল্লেখ ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল আগামী ২৫ বছরে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বর্ধিত জনসংখ্যাকে টিকিয়ে রাখতে হলে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হবে এবং জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার ছাড়া তা কখনও সম্ভব হবে না। প্রশ্ন হল উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যে পরিমাণ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত বৈচিত্র্য আছে তা কি জৈব প্রযুক্তি ব্যবহারের পক্ষে উপযুক্ত ? দ্বিতীয়ত, জৈব প্রযুক্তি ব্যবহারে নতুন জিন আবিষ্কার করা যেতে পারে ; কিন্তু তখন পুরানো কীটপতঙ্গ, পোকামাকড় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে নতুন কোনো সমস্যা তৈরি করবে না—তার গ্যারান্টি কোথায় ? সুতরাং সমাধান হল কোনটির প্রান্তিক ব্যয়ের উপর প্রান্তিক সুবিধা বেশি সেটি বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে—জৈব প্রযুক্তি আবিষ্কৃত নতুন সামগ্রীটি বনাম প্রাকৃতিক দ্রব্যের চূড়ান্ত প্রত্যাশিত ব্যবহার কোনটি বেশি ফলপ্রসূ হবে। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় জৈব প্রযুক্তি নয়, একটু যত্নসহকারে এবং আরো নিপুণ দক্ষতা নিয়ে কৃষি সম্পদকে ব্যবহার করলে অধিকতর পরিমাণ কৃষিজমি ব্যবহার না করেও অথবা সার এবং জল দেওয়ার ব্যবস্থা না করেও আরো প্রায় ৩ কোটি লোকের খাওয়ার বন্দোবস্ত করা যায়।

উপরের দীর্ঘ আলোচনাকে ভিত্তি করেই পরিবেশ সংরক্ষণে গ্রামভারতে পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থার ভূমিকার আলোচনা করা যেতে পারে। স্মরণ করা যেতে পারে ভারতে ৭০% লোকই গ্রামে বাস করে এবং এখনও ভারতে সামগ্রিক জাতীয় আয়ের ৫০%-এর বেশি আসে কৃষি ব্যবস্থা থেকে।

১৪.১২ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েতরাজে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত ব্যবস্থা

১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনের ১৯,২০ এবং ২১ নং ধারায় গ্রাম পঞ্চায়েতকে সামগ্রিকভাবে যে দায়িত্বগুলি অর্পণ করা হয়েছে তার মধ্যে কতগুলি অবশ্যই পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই নির্দেশিত। যথা—

সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার—

(১) পানীয় ও ব্যবহার্য জল সংরক্ষণ ;

(২) স্বাস্থ্য রক্ষা এবং আবর্জনা ও নর্দমা পরিষ্কার ;

(৩) গ্রামের কৃষি এলাকার সেচ ও কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্য জলাধার সংরক্ষণ ;

(৪) কৃষিব্যবস্থার সম্প্রসারণ ; জ্বালানি এবং গো-খাদ্য সংরক্ষণ ;

(৫) পতিত জমিকে চাষযোগ্য করা ; গ্রামের জমি ও অন্যান্য সম্পদের সমবায়িক পরিচালনার বন্দোবস্ত করা।

উল্লেখযোগ্য এই যে পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে প্রত্যেক সমিতির অধীনে 'জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ' নামে পৃথক স্থায়ী

কমিটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত সংশোধনী আইনে কেবলমাত্র 'জনস্বাস্থ্য' নামে যে কমিটি ছিল ১৯৯২ সালের সংশোধনীতে সেই স্থায়ী কমিটিকেই 'জলস্বাস্থ্য ও পরিবেশ' নামে অধিকতর গুরুত্ব ও দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। একইভাবে জেলা পরিষদ স্তরেও 'জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ' নামে একটি স্থায়ী কমিটি আছে। পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ কর্তৃক ভারার্পিত দায়িত্ব পালন করাই হবে এই স্থায়ী কমিটিগুলির কাজ।

পূর্বের আলোচনায় গ্রামে পরিবেশ দূষণের মূল এলাকাগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। গ্রাম ও শহরের পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্র ও এলাকাগুলি অভিন্ন হয়। ফলে পঞ্চায়েত ও পৌরসভার ক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণ সংরক্ষণ সম্পর্কিত কাজগুলিও আলাদা আলাদা। গ্রামে জনঘনত্ব থাকে কম ; বহুতলবিশিষ্ট বাড়ি থাকে না ; জলনিকাশির স্বাভাবিক সুযোগ যেটুকু থাকে তার উপর নজর রাখলেই চলে। গ্রামে পরিবেশ দূষণের মূল ক্ষেত্র দুটি—কৃষিব্যবস্থা ও পানীয় জল। কৃষিব্যবস্থার ক্ষেত্রে দূষণ ঘটে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় উন্নতমানের কৃষি উপাদান ব্যবহার করতে গিয়ে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে আগামী ২৫ বছর পর উন্নয়নশীল দেশগুলির বিপুলায়তন জনসংখ্যার স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্যও খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হবে এবং জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার ছাড়া তা সম্ভব নয়। ৬০-এর দশকে সবুজ বিপ্লব নামে এই ধরনের উচ্চ ফলনশীল কৃষিব্যবস্থা বা জৈব প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটে। একটা প্যাকেজ হিসাবে পঞ্জাব, রাজস্থান, হরিয়ানা ও হিমাচলপ্রদেশের গম চাষের ক্ষেত্রে মূলত প্রযুক্ত হলেও এই জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার যে কৃষি এলাকার বাস্তুব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করতে পারে তার বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির স্তরে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশসংক্রান্ত যে স্থায়ী কমিটি আছে সেখানে সরকারি একজন কৃষি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে পরিবেশ দূষণ বিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। শুধু সমিতি স্তরে নয়, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে এই সচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন। জৈব প্রযুক্তি ব্যবহারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করা উচিত—

(১) এক এক এলাকার জৈব-ভৌত পরিস্থিতি এক একরকম। তা বিচার না করে নেহাৎ জৈব প্রযুক্তিগত কৌশলের সাহায্য নিয়ে যদি ফসল পরিবর্তন বা উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করা হয় চূড়ান্ত পর্যায়ে তা পরিবেশকেই নষ্ট করবে।

(২) উৎপাদন ও উপাদানের নিয়মমাফিক অনুপাত যদি না মানা হয় তাহলে পরিবেশ দূষণগত সমস্যা তৈরি হবে।

(৩) পতিত বা অনাবাদী জমি উদ্ধার করে কৃষি উৎপাদনে লাগালেই চূড়ান্ত পর্যায়ে তার সুফল ফলবে একথা বলা যায় না ; কারণ এই জমিগুলি একদিকে যেমন জমা জল ধরে রাখে তেমনি শুকনো মরশুমে গরু ছাগলের বিচরণ ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করে। তাই এইভাবে পতিত জমি কাজে লাগিয়ে বা বিকল্প ফসল ফলাবার প্রচেষ্টায় হিসাবটি পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন।

(৪) উচ্চ ফলনশীল বীজ প্রয়োগে হয়তো গম বা ধানের উৎপাদন বাড়ে, অন্য ফসলের উৎপাদন কমে।

(৫) জৈব সারের পরিবর্তে রাসায়নিক সার এবং মানবশক্তির বিরুদ্ধে যন্ত্রশক্তি এই হল জৈব প্রযুক্তির প্রধান কথা। প্রচলিত কৃষি প্রদ্ধতি ডালে যে বাড়তি প্রোটিন এবং খাদ্যশস্য যে বাড়তি ক্যালোরিযুক্ত হয় তা কিন্তু জৈব প্রযুক্তিতে উপেক্ষিত হয়।

(৬) সবুজ বিপ্লব কেবল গম বা ধান চাষের ফলে মাটির অবক্ষয় ঘটায়।

(৭) জৈব প্রযুক্তি দ্বারা নতুন তৈরি ফসলের জিনটি অভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু প্রাকৃতিক ফসলের জিনে আছে একটি বৈচিত্র্য। তা কিন্তু জৈব প্রযুক্তিতে ধ্বংস হয়।

(৮) জৈব প্রযুক্তিতে যে কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করা হয় তার ক্ষতিকারক দিকগুলি অনেক বেশি। উন্নত প্রযুক্তিতে যেভাবে নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম এবং ফসফরাস ব্যবহার করা হয় তার ফলে জমির মৌলিক খাদ্যানুগুলি কমে যায়। তুলনামূলকভাবে জৈব সারের ব্যবহারে জমির পুষ্টিসাধন করলে ঐ পুষ্টি মাটিতে পুনরায় মিশে যায় এবং পুষ্টি আবর্তটি নিরবচ্ছিন্ন থাকে।

(৯) নতুন জৈব প্রযুক্তি অনুযায়ী আধুনিক বীজের উৎপাদকতা বৃদ্ধির জন্য যে পরিমাণ বাড়তি জলের প্রয়োজন হয় তা প্রাকৃতিক জলবৃত্তকে নষ্ট করে। লভ্য সুযোগটুকুকে ব্যবহার করে সেচের কাজ চালালে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা হয়।

(১০) বড়ো বড়ো জলাধার বা ড্যামগুলিও বিভিন্নভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে। কিন্তু সেগুলি বৃহদাকারে এবং কখনও কখনও দুটি তিনটি রাজ্যের সমন্বিত প্রয়াসে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে পরিচালিত হয়। তাই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সরকারগুলির প্রতিরোধমূলক কোনো ভূমিকা থাকে না। কিন্তু ঐ প্রকল্পগুলি গ্রহণের ফলে বিপর্যস্ত জৈব-ভৌত ব্যবস্থার ভারসাম্য বিধানের জন্য স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। পূর্বেই এই ভারসাম্যহীনতার একটা সংখ্যা গাণিতিক হিসাব দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষে মোট ১১০টি বাঁধ প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ১৭লক্ষ মানুষের অধিকাংশই গ্রামে বসবাসকারী দরিদ্র কৃষক, জনজাতি এবং উপজাতিগোষ্ঠীর লোক। এছাড়া এই ছোটো বড়ো বাঁধ প্রকল্পগুলি বহু বনভূমি ও কৃষি জমি প্লাবিত করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে। জাতীয় স্তরে কোনো কেন্দ্রীয় প্রকল্প হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে যখন এই ধরনের কোনো বাঁধ বা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি করে চলে যায়, তখন পেছনে রেখে যায় প্রচুর আঘাত, প্রচুর ক্ষতি। এই ক্ষতিপূরণ করার দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলোর। সবচেয়ে বড়ো চাপ পড়ে পুনর্বাসন সংক্রান্ত সমস্যা সামলাতে গিয়ে। কারণ এক রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্থ এবং বাস্তুহারা লোক পুনর্বাসনের জন্য অন্য রাজ্যে যেতে হয় এবং সেই রাজ্যের পৌরসভা বা পঞ্চায়েতের আর্থিক ক্ষমতার উপর চাপ পড়ে।

(১১) গ্রামের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, বিশেষ করে পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী কমিটি (জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ) তার কর্মাধ্যক্ষর নেতৃত্বে আর একটি বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে পারে। কৃষিকার্যে বর্তমান জৈব প্রযুক্তি ব্যবহারের একটি মস্ত বড়ো বোঝা হল কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার। বিভিন্নভাবে এই কীটনাশক ঔষধ প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে এই কীটনাশক ঔষধ মাটির জলের সঙ্গে মিশে গিয়ে জলস্তরকে দূষিত করতে পারে। সেই দূষিত জল ব্যবহারে মানুষের সমূহ ক্ষতি সাধিত হতে পারে। শিশুদের স্বাস্থ্য হানি ঘটে এবং মহিলাদের সন্তান প্রজনন ক্ষমতা দুর্বল হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের আহূত সংসদের সভায় এই বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে কৃষকগণকে সতর্ক করে দেওয়া যায়। কীটনাশক ঔষধ সংরক্ষণ, ব্যবহারকালীন সতর্কতা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজন সচেতনতা শিবির করে জনগণকে অবহিত করা উচিত।

আজকাল অনেক পঞ্চায়েত এলাকায় দূষিত পানীয় জলের কথা শোনা যায় এবং তা থেকে আন্ত্রিক বা পেটের আরো নানারকম অসুস্থতা অনেক সময় স্থানীয় পর্যায়ে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলার জলে আর্সেনিকের পরিমাণ আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বোপরি বহু গ্রামে পানীয় জল এখনও সুলভ নয়। বহু পথ অতিক্রম করে পানীয় জল বয়ে নিয়ে আসতে হয়। তারপর দেখা যায়, ঐ জল সংরক্ষণের আধারটিও পরিষ্কার নয়। এই সমস্ত বিষয়ে পঞ্চায়েত স্তরে আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত। জলের পাইপগুলো যাতে অন্তত ৮০ফুট তলা থেকে জল তুলতে পারে তা দেখা উচিত। এমনকি যে স্তরে জলে আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে জলের পাইপ তার থেকে আরো নীচে পাঠিয়ে পরীক্ষা করা উচিত। এ দায়িত্বগুলি নিশ্চিতভাবে গ্রামের পঞ্চায়েত সংস্থাগুলিকেই করতে হবে। মুর্শিদাবাদ জেলার আন্ত্রিকের প্রকোপ খুব বেশি। দেখা যায় সেখানে মাটির ৮/১০ ফুট

নিচে থেকেই জল তোলা হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই পাশাপাশি কোনো দূষিত পুকুরের জলের স্তর আর পাইপগুলির গভীরতা একই থাকছে। ফলে ঐ পুকুরের জলও পাইপ বেয়ে উঠছে এবং তা নির্বিচারে খাচ্ছে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় হল এখনও সুদূর গ্রামাঞ্চলে পুকুরের জলকেই পানীয় জল হিসাবেই ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব কিছুর বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে। পালস পোলিও বা নিরক্ষরতা দূরীকরণে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতগুলির যে বিরাট ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়, সেই পরিমাণে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কিত সচেতনতা সৃষ্টির তেমন কোনো প্রয়াস দেখা যায় না।

(১২) বনসৃজন প্রকল্প—আটের দশকের গোড়ার দিকে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বামফ্রন্ট সরকার প্রথম ব্যাপক বনসৃজন প্রকল্প রূপায়ণের কাজ শুরু করে। এর উদ্দেশ্য ছিল নতুন করে বনভূমি তৈরি ; কারণ সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে বনভূমির পরিমাণ ছিল মোট ভূভাগের ১৩%। জেলা পরিষদের মাধ্যমে পঞ্চায়েতগুলিকে বৃক্ষরোপণের জন্য টাকা দেওয়া হচ্ছে। ১৯৯২ সালের পঞ্চায়েত সংশোধনী আইনে ২০নং ধারার ১৯নং (R) উপধারায় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সামাজিক বনসৃজন ও খামার অঞ্চলে বনভূমি তৈরির ক্ষমতা দান করা হয়েছে। একইভাবে ১০৯নং ধারায় পঞ্চায়েত সমিতিগুলির উপরও একই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

১৪.১৩ উপসংহার

ভারতবর্ষের পরিবেশ সম্পর্কিত জাতীয়নীতি, পরিবেশজনিত বাস্তব সমস্যা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের গঠিত বিভিন্ন সংগঠন এবং আন্দোলনের ইতিহাসের আলোচনা থেকেই পরিবেশ সংরক্ষণে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির ভূমিকার স্বরূপ উপলব্ধি করা যেতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্বটি এককভাবে কোনো একটি প্রশাসনিক কর্তৃত্বের নীতি ও প্রশাসনিক পরিচালনার উপর ন্যস্ত করা উচিত নয়। এই দায়িত্ব যতখানি বিশ্বায়ত, ততখানি লোকায়ত এবং স্থানীয় উন্নত দেশগুলির সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার এবং তার প্রভাব ও শর্তাবলি বিশ্বব্যাংক বা আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থার ঋণের প্রভাব এবং শর্তাবলি, উন্নত দেশগুলির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক নীতি বিশ্বের পরিবেশকেই বিপর্যস্ত করে তোলে। সাম্প্রতিককালে কৃষিজ দ্রব্যের ভরর্তুকিকে কেন্দ্র করে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মেক্সিকোর কানকুন শহরে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সম্মেলনে উন্নত দেশগুলির যে বিতর্ক লক্ষ্য করা গেছে তার যেমন একটা অর্থনৈতিক মাত্রা আছে, তেমনি আছে একটা পরিবেশগত দিক। কিন্তু তাই বলে এই দায়িত্বটি কেবল বিশ্বরাষ্ট্র সংস্থার নয়। জাতীয় স্তরেও প্রতিটি রাষ্ট্রকে আপন আপন জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে নীতি প্রণয়ন করতে হয় এবং রাজ্য ও স্থানীয় প্রশাসন দপ্তরকে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে আপন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হয়।

১৪.১৪ অনুশীলনী

১। নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ আকারে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ—

(ক) পরিবেশ কী ? পরিবেশের উপাদানগুলি কী কী ?

(খ) পরিবেশ দূষণ কয়প্রকার ও কী কী ? প্রত্যেক দূষণের বিস্তৃত আলোচনা করুন।

(গ) বিশ্ব পরিবেশ ব্যবস্থা পরিচালনায় উত্তর-দক্ষিণ ভারসাম্যহীনতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

(ঘ) ভারতে পরিবেশগত সমস্যার প্রকৃতি ও ব্যাপকতা বিশ্লেষণ করুন।

(ঙ) দূষণ নিয়ন্ত্রণে ভারত সরকার প্রণোদিত বিভিন্ন আইনী ব্যবস্থার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করুন। এই ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি নির্দেশ করুন।

(চ) ভারতবর্ষে পরিবেশ সংরক্ষণকারী কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার নাম করুন ও তাদের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি বিস্তৃত ব্যাখ্যা করুন।

(ছ) গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের স্বার্থে পরিবেশ সংক্রান্ত কোন্ কোন্ বিষয়গুলিতে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করুন।

(জ) সবুজ বিপ্লব কী?। এই বিপ্লবে ব্যবহৃত ব্যবস্থার মূল কথা কী? এর ত্রুটিগুলি আলোচনা করুন।

২। সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন বিভাজনগুলি কী কী?

(খ) বায়োস্ফিয়র কী?

(গ) 'গ্রীন হাউস ইফেক্ট' কী?

(ঘ) ভারতে অনুসৃত পরিবেশনীতির প্রধান ত্রুটি কী?

(ঙ) ভূপাল গ্যাস দূর্ঘটনা অথবা 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের' উপর টীকা লিখুন।

(চ) সবুজ বিপ্লবের পরিবেশ সংক্রান্ত প্রধান ত্রুটি কী?

(ছ) বাঁধ বা জলাধার নির্মাণ কীভাবে ভারতবর্ষে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা তৈরি করেছে লিখুন।

(জ) কৃষিকাজে কীটনাশক ঔষধের বিকল্প কি?

(ঝ) জৈব প্রযুক্তি বলতে কি বোঝায়? জৈব প্রযুক্তি ব্যবহারের একটি অসুবিধার উল্লেখ করুন।

(ঞ) পঞ্চায়েতের উপর ভারার্পিত পরিবেশ সংক্রান্ত দায়িত্বগুলি কী কী?

(ট) কীটনাশক ঔষধ ব্যবহারে কী কী ক্ষতি হতে পারে? পঞ্চায়েত কিভাবে এই ক্ষতিগুলি দূর করতে পারে?

(ঠ) পশ্চিমবঙ্গে বনসৃজন প্রকল্পের রূপায়ণ সম্বন্ধে যাহা জানেন লিখুন।

৩। দু-এক কথায় উত্তর দিন ঃ

(ক) আণবিক চুল্লি বিস্ফোরণজনিত বিরাট দুর্ঘটনাটি কবে কোথায় ঘটে?

(খ) লিথোস্ফিয়র কাকে বলে?

(গ) বায়োস্ফিয়র কী?

(ঘ) বাস্তুব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

(ঙ) বিশ্বের উন্নায়ণ বলতে কী বোঝেন?

(চ) পশ্চিমবঙ্গে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রক আইনে কোন্ সীমা পর্যন্ত শব্দ অনুমোদিত?

(ছ) ভারতবর্ষে সমস্ত ভূখণ্ডের তুলনায় বনভূমি কত অংশ?

(জ) 'চিপকো আন্দোলন' কাকে বলে?

(ঝ) ভারতবর্ষে দুটি উল্লেখযোগ্য জলাধার প্রকল্পের নাম করুন।

(ঞ) ভারতে কৃষিজমির ভূমিক্ষয় ঘটে কী কী কারণে?

(ট) গঙ্গা দূষণের ভয়াবহতার দুটি উদাহরণ দিন।

(ঠ) টেল (TEL) কী?

(ড) বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিবেদনে আগামী দিনের যে ভয়াবহ পরিবেশ চিত্রের আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে তার দুটি উদাহরণ দিন।

(ঢ) ভারতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন থাকা সত্ত্বেও নির্বিচারে বন্যপ্রাণী শিকার চলছে—এর কারণ কী?

(ণ) ভারতবর্ষে জলদূষণ আইনের ব্যর্থতার কারণ কি বলে মনে করেন?

(ত) ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ফলে প্রণোদিত পরিবেশসংক্রান্ত আইনগুলি কী কী?

(থ) 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের' নেতৃত্ব দান করছেন কে?

১৪.১৫ গ্রন্থপঞ্জি

1. Rumki Basu-*The Global Environment and the United Nations, National Publishing House, New Delhi.*

2. Jayasri Roychoudhury-*An introduction to Development and Regional Planning, Orient Longman,*

3. Nilanjana Dutta & P. K. Dutta--*The Environment and its Problems, Sarat Book Distributors.*

4. *The West Bengal Municipal Act, 1993.*

5. *West Bengal Panchayet Act, 1973.*

একক ১৫ □ মানবাধিকারের বিকাশ ও বিস্তার

গঠন

১৫.০ উদ্দেশ্য
১৫.১ প্রস্তাবনা
১৫.২ মানবাধিকার বিকাশের ইতিহাস
১৫.৩ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা
১৫.৪ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও মানবাধিকার
১৫.৫ জাতিপুঞ্জের ভূমিকার মূল্যায়ন
১৫.৬ ভারতীয় সংবিধানে মানবাধিকার সুরক্ষার অঙ্গীকার
১৫.৭ ভারতে মানবাধিকার কমিশন গঠনের যৌক্তিকতা
১৫.৮ মানবাধিকার কমিশনের গঠন ক্ষমতা ও কার্যাবলি
১৫.৯ ভারতীয় মানবাধিকার কমিশনের মূল্যায়ন
১৫.১০ সারাংশ
১৫.১১ অনুশীলনী
১৫.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন—

- মানবাধিকার কী ?
- মানবাধিকার বিকাশের ইতিহাস।
- জাতিসংঘ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা।
- মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘোষণা।
- মানবাধিকার রক্ষায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল্যায়ন।
- ভারতীয় সংবিধান ও রাজনীতিতে মানবাধিকার সুরক্ষার প্রয়াস ও ভূমিকা।
- ভারতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের যৌক্তিকতা, গঠন, কার্যাবলি ও মূল্যায়ন।

১৫.১ প্রস্তাবনা

বিশাল মানব পরিবারের সদস্য হিসাবে রাষ্ট্র বা যেকোনো গণকর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিজেকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মৌলিক যে অধিকারগুলির দরকার হয় তাকেই মানবাধিকার বলা হয়। এই অধিকারগুলি মানুষকে তার

আপন সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবনা অনুযায়ী বেড়ে ওঠার সুযোগ দেয়। মানুষের সমাজ জীবন বা রাজনৈতিক জীবনের থেকেও এই অধিকারগুলি প্রাচীনতর। প্রাকৃতিক আইন বা প্রাকৃতিক সম্পর্কিত প্রাচীন তত্ত্বই হল মানবাধিকারের উৎস। তারপর সংগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক জীবনে এসে শাসক সম্প্রদায়ের স্বৈরাচার থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য মানবাধিকারের সমস্যা অধিকতর প্রকট হতে থাকে। কিন্তু মানবাধিকারের অস্তিত্ব তারও পূর্ববর্তী। সভ্যতার ইতিহাস শুরুর প্রথম দিন থেকেই মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই শুরু করেছে প্রকৃতি ও পরিবেশের বিরুদ্ধে। এই লড়াই এর মধ্য থেকেই তৈরি হয় কিছু নিয়মকানুন—দুর্বলতর মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে। তারপর রাষ্ট্রসমাজ তৈরি হলে আরও উচ্চতর নিয়মকানুন মানবকর্তৃত্বের স্বৈরাচারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য কিন্তু মানবাধিকারের নীতি প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা থেকে জন্মগ্রহণ করেছে ; জন্মগ্রহণ করেছে ক্ষমতা বৃদ্ধির আদিমতম আকাঙ্ক্ষা থেকেই এবং তারই অনিবার্য পরিণতি হিসাবে দেখা দিয়েছে যুদ্ধ। দুর্বল রাষ্ট্রের বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সবল রাষ্ট্র বা গোষ্ঠী যুদ্ধ। এইভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগে যুদ্ধই ছিল অধিকার রক্ষার সুনির্দিষ্ট পন্থা। যুদ্ধ পরিচালনারও নিয়ম ছিল। মনুস্মৃতি (২০০ খ্রিঃ পূর্ব থেকে ১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে), মহাভারত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং শঙ্করাচার্যের শুক্রনীতিসার গ্রন্থে যুদ্ধের নিয়মকানুনগুলি লক্ষ্য করা যায়। এই নিয়মকানুনের অস্তিত্বই প্রমাণ করে মানুষের কিছু প্রয়োজন ও মৌলিক সুযোগ-সুবিধা মেনে নিয়েই সংগঠিত হত যুদ্ধ ; আর তা থেকেই প্রমাণ মেলে যে অধিকার বোধ ও তার অস্তিত্ব সভ্যতার উৎসেরই সমসাময়িক।

১৫.২ মানবাধিকার বিকাশের ইতিহাস

সংগঠিত রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে মানবাধিকার রক্ষার প্রথম সুনির্দিষ্ট প্রয়াস হিসাবে ইংলণ্ডের রুনী মিড নামক জায়গায় ১২১৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা জন ও সামন্ত প্রভুদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির উল্লেখ করা যায়। এই চুক্তিই ইতিহাসে 'ম্যাগনা কার্টা' বা মহাসনদ নামে পরিচিত। রাষ্ট্রকর্তৃত্বকে উন্মুক্ত মাঠে নিয়ে এসে সামন্ত প্রভুদের স্বার্থানুকূল অধিকার রক্ষায় কতগুলি চুক্তিতে সই করতে বাধ্য করা হয়েছিল। মধ্যযুগ ছিল রাজা ও খ্রিস্টান ধর্মগুরু পোপের মধ্যে ধর্মান্ধ আধিপত্য বিস্তারের যুগ। সামন্তপ্রথা এবং এই ধর্মীয় মতান্ধতা ও ক্ষমতা লিপ্সা মধ্যযুগে মানুষের অধিকারকে পর্যুদস্ত করেছে বার বার। সাধারণ মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি অমানবিকভাবে সঙ্কুচিত করা হয়েছে। তারই প্রকাশ ঘটেছে ক্রীতদাস ও বেগার শ্রমদান প্রথায়। এই সময়ই ফরাসিদেশে ও ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটি জায়গায় সংগঠিত হয় কতগুলি বিপ্লব এবং তারই মধ্যে থেকে মানবাধিকার চেতনা স্বচ্ছতর রূপ পেতে থাকে। দার্শনিক রুশো বলেছেন—"মানুষ জন্ম থেকে স্বাধীন ; কিন্তু সর্বত্রই তার শেকল পরা।" রুশোর এই দার্শনিক উপলব্ধিই ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফরাসি বিপ্লবের বৌদ্ধিক প্রেক্ষিত রচনা করে। রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচারিতার প্রতিরোধ হিসাবে বিপ্লবের বাস্তবতায় মানুষ প্রত্যয় লাভ করে ; মানুষের অধিকার চেতনা দৃঢ়তর হয়।

সপ্তদশ শতকে অধিকার চেতনার ব্যাপক প্রকাশ ঘটে ইংরাজজাতির মধ্যে। তারই বহিঃপ্রকাশ হল—অধিকারের আবেদন, ১৬২৮ (Petition of Rights) এবং অধিকারের বিল, ১৬৮৯ (Bill of Rights)। এই দুই চুক্তিই হল ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ১৭৯১ সালের আমেরিকার অধিকারের বিলের মূল অনুপ্রেরণা। ফরাসি জ্ঞানালোকের প্রভাবও ছিল মার্কিন স্বাধীনতা সংগ্রামে। ফরাসি বিপ্লব এবং স্বাধীনতা ঘোষণাই সদ্য স্বাধীন অনেক রাষ্ট্রকে মানবাধিকার বিধিবদ্ধ করায় উদ্বুদ্ধ করে।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র ইউরোপ এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকার কোনো কোনো

স্থানে অধিকারের চেতনা একটা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা লাভ করতে থাকে। গ্রীকদের উপর তুরস্কের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান কল্পেই ১৮৭২ সালে গ্রেট ব্রিটেন ফ্রান্স ও রাশিয়া সামরিক জোট গঠন করে। সুস্পষ্টভাবেই এই জোট মানবাধিকার রক্ষারই প্রয়াস। এর ফলেই ১৮৩০ সালে গ্রীস স্বাধীন হয়। মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি পড়ে তোলে তীব্র প্রতিরোধ। তার ফলেই সিরিয়া, ক্রীট, তুরস্ক ও বল্কান দেশগুলির নির্যাতিত অগণিত মানুষের মুক্তি ঘটে। ধর্মীয় অধিকার লাভের অনুপ্রেরণাই ছিল মানুষের এই মুক্তি লাভের মূল কারণ।

শিল্পবিপ্লবের পর থেকেই শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে সংঘবদ্ধ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তারই ফলশ্রুতি হল ১৮৯০, ১৯০৫ এবং ১৯০৬ সালের বার্লিন কনভেনশন। উল্লেখ করা যেতে পারে এই সমাবেশেই শিল্পসংস্থায় মহিলাদের নৈশ শ্রম এবং দেশলাই নির্মাণে বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের নিষিদ্ধ হয়। ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী তৈরি হয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ (International Labour Organisation) । পরবর্তীকালে মানবাধিকার সুরক্ষা ও সম্প্রসারণে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ বা সমিতি গঠনে সুস্পষ্ট অধিকার অর্জন করে। এই আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থান অনুপ্রেরণাতেই ভারতবর্ষে পর পর শ্রম ও শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কিত কতগুলি ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়। যথা —১৯২৬-এর শ্রমিক সংঘ আইন, ১৯২৩ সালের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন, ১৯৪৭ সালের শিল্পবিরোধ আইন, ১৯৪৮-এর ন্যূনতম মজুরী আইন, ভারতীয় কারখানা আইন ইত্যাদি।

ভারতবর্ষে মানবাধিকার চেতনার অস্তিত্ব ও বিকাশের ইতিহাস অপেক্ষাকৃতভাবে সাম্প্রতিক। ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা, ১৮৪৩ সালে ক্রীতদাস প্রথা, ১৮৭১ সালে নবজাত শিশু মহিলা সন্তান হত্যা নিষিদ্ধ ; ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহের প্রবর্তন ঘটে এবং ১৯২৯ সালে বাল্যবিবাহ বন্ধ হয়। এই ব্যবস্থাগুলি সনাতন হিন্দুসমাজের কুসংস্কার ও পরাধীন মানসিকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ; ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয় ভারতীয় ফৌজদরী আইন (Indian Penal Code) এবং তার সঙ্গে প্রণোদিত হয় জেল ও বন্দী আটক সম্পর্কিত একগুচ্ছ সংস্কার আইন।

১৫.৩ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা

১৯১৯ সালের ভার্সাই চুক্তি (Treaty of Versailles) অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই ৪০ জন সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে ১৯২০ সালের ১০ই জানুয়ারি জাতিসংঘ (League of Nations) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩২ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয় ৫৫। যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে পৃথিবীকে মুক্তি দেওয়াই ছিল জাতিসংঘের মূল উদ্দেশ্য। যাবতীয় গোপনীয়তা ও স্বার্থান্ধ ক্ষমতালিপ্সার পথ পরিত্যাগ করে ন্যায়ের ভিত্তিতে পরস্পরের সঙ্গে সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপন করার অঙ্গীকার গ্রহণ করে এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সংস্থা গঠন করে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সারা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে এশিয়া ও আফ্রিকায় অনেকগুলি গণবিক্ষোভ সংগঠিত হয়। ১৮১৪ সাল থেকেই ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্তির জন্য কতগুলি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯২৬ সালে জাতিসংঘ এই দায়িত্ব গ্রহণ করে। ক্রীতদাস প্রথার অবসান এবং নারী ও শিশুদের নিয়ে অমানবিক ব্যাবসা বন্ধ করার ব্যাপারে জাতিসংঘ উদ্যোগী হয়। তার আগে ১৯২৩ সালে জাতিসংঘ ইতালি ও গ্রিসের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা করেছে। ১৯২৫ সালে গ্রিস ও বুলগেরিয়ার মধ্যে সফল মধ্যস্থতা করে দুই রাষ্ট্রের পারস্পরিক উত্তেজনা প্রশমন করেছে। সংখ্যালঘুদের এবং ম্যাণ্ডেট অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারী মানুষের স্বার্থরক্ষায় জাতিসংঘ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে শ্রমিকদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনে জাতিসংঘের ছত্রছায়াতেই আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন গড়ে উঠেছে। এই শ্রম সংগঠন একদিকে যেমন শ্রম কল্যাণসাধনে নিজ নিজ রাষ্ট্রে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে উদ্যোগ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে, তেমনি যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক

ব্যাধি প্রতিরোধে বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানকল্পেও জাতিসংঘ সাধ্যমতো প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। কিন্তু কার্যকরী সাংগঠনিক ক্ষমতা ও তৎপরতার অভাব, জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে সদস্য রাষ্ট্রগুলির অধিকতর আগ্রহ, বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, একনায়কত্ব ও ফ্যাসীবাদের নির্লজ্জ আবির্ভাব ও প্রসার জাতিসংঘের ব্যর্থতাকেই প্রকট করে তোলে।

১৫.৪ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও মানবাধিকার

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অবদান সার্বজনীন স্বীকৃতির দাবি রাখে। বস্তুতপক্ষে পর পর দুটি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ এবং অমানবিক নাৎসী অত্যাচারের অভিজ্ঞতাই পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষকে মানবাধিকার সংরক্ষণে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উপযুক্ত প্রয়াস গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। ১৯৪৫ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ রচনাকালেই আলোচিত হয় যে তার সভ্য রাষ্ট্রগুলি তাদের নিজস্ব সংবিধানে মানবাধিকার সংক্রান্ত নীতিগুলিকে কার্যকর করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই বছরেই সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে কিউবা, মেক্সিকো ও পানামার মতো রাষ্ট্রগুলি প্রত্যেক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে মানবাধিকার সম্পর্কিত ব্যবস্থা ঘোষণার দাবী রাখে। ১৯৪৫ সালে পানামা সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ মানবিক মৌলিক অধিকার সম্পর্কে একটি খসড়া প্রস্তাব পেশ করে। অবশেষে সাধারণ সভার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে ৪৮টি (৫৮টি উপস্থিত সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে) সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থন ও সাক্ষর নিয়ে "মানবাধিকার সম্পর্কিত বিশ্বজনীন ঘোষণার" খসড়া প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ ৬টি সমজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে। বিপক্ষে কেউ ভোট দেয়নি। মানবাধিকার সংরক্ষণের বিষয়টিকে অর্থবহ করার জন্য সাধারণ পরিষদ ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে একটি কমিশন গঠন করে। এই কমিশনটির নাম হল মানবাধিকার বিষয়ক কমিশন (Commission on Human Rights), এই কমিশনের প্রথম সভানেত্রী হলেন শ্রীমতী ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট। এই কমিশনের সদরদপ্তর জেনেভায় অবস্থিত। মানবাধিকার সংক্রান্ত সার্বজনীন ঘোষণার প্রস্তাবনায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—মানুষের অন্তর্নিহিত মর্যাদাবোধ এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য সমান হস্তান্তরবিহীন অধিকার অর্জনই হল এই ঘোষণার উদ্দেশ্য। বলা হয় যে এই ঘোষণাটি সকল মানুষ ও জাতির অধিকারের একটি মানদণ্ডরূপে বিবেচিত হবে। এই ঘোষণাকে কার্যকর করার জন্য প্রতিটি ব্যক্তি, সামাজিক সংস্থা, জাতীয় সরকার সকলক্ষেত্রে মানুষের অধিকার, স্বাধীনতা রক্ষা ও সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য সচেষ্টা থাকবে। মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদকে। তারই অধীনে মানবাধিকার কমিশন আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯২ সাল পর্যন্ত এই কমিশনের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫৩। মানুষের মৌল অধিকারগুলিকে মর্যাদা দেওয়া এবং সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অবসানই হল মানবাধিকার কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই কমিশনের দায়িত্বগুলি হল—মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তদন্ত করা ; নীতি সম্পর্কিত নির্দেশনা দান ; অধিকারবিষয়ক বিভিন্ন ঘোষণা ও সম্মেলন আহ্বান করা। উল্লেখ করা দরকার মানবাধিকার কমিশন কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, রাষ্ট্র কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগই তদন্ত এবং পর্যালোচনা করে।

মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণার ৩০টি ধারায় প্রধান অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাগুলি চিহ্নিত হয়েছে। ঘোষণায় উল্লিখিত অধিকারগুলি হল—জীবন, স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার, দাসত্ব থেকে মুক্তি ; স্বৈরাচারী আটক ও গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও উপযুক্ত আদালতে নিরপেক্ষ বিচারের অধিকার ; দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নিরপরাধ হিসাবে গণ্য হবার অধিকার ; আবাসস্থলের অলঙ্ঘনীয়তা ও পত্রালাপের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার ;

চলাচল ও বসবাসের অধিকার ; বিবাহ ও পরিবার গঠনের স্বাধীনতা ; সম্পত্তির অধিকার ; চিন্তা বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ; মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ; শান্তিপূর্ণভাবে জমায়েত হবার অধিকার ; সমিতি বা সংগঠন করার অধিকার ; নির্বাচন করা ও নির্বাচিত হবার অধিকার ; সামাজিক নিরাপত্তা ; উপযুক্ত জীবনযাত্রার মানের নিশ্চয়তা বিধান ; শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক অধিকার ; সরকারি চাকুরী লাভের ক্ষেত্রে সমানাধিকার ; কর্মকালীন বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার ; ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকার ; রোগ, অক্ষমতা, বার্ধক্য ও বৈধব্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং সর্বোপরি অভাব থেকে মুক্তির স্বাধীনতা।

এই অধিকারগুলিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা "সকল মানুষ ও জাতির পক্ষে সাফল্যের সাধারণ মান" হিসাবে উল্লেখ করেছে এবং সকল রাষ্ট্র, জাতি, ব্যক্তিগোষ্ঠী, বেসরকারি সংস্থার কাছে ঐ অধিকারগুলি মর্যাদা রক্ষার আবেদন জানিয়েছে।

মানবাধিকারের ঘোষণায় উল্লিখিত অধিকারগুলি বিশ্লেষণ করলে সুস্পষ্ট হয় যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারগুলি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। গণহত্যা (Genocide) প্রতিরোধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রয়াস মানবাধিকারের ঘোষণাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্ভবকাল থেকেই এই উদ্যোগ শুরু হয়। দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনার পর ১৯৮২ সালে ৮১-টি রাষ্ট্রের স্বাক্ষরসহ গণহত্যা নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত সনদে গৃহীত হয় এবং মানবাধিকার ঘোষণা চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ গণহত্যা প্রতিরোধে নিজ নিজ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করে। গণহত্যার ক্ষেত্রে অপরাধকারী রাষ্ট্র বা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার দান করা হয়েছে নিরাপত্তা পরিষদকে। গণহত্যা বলতে বোঝানো হয়েছে কোনো জাতি, নৃতাত্ত্বিকগোষ্ঠী, জাতপাত অথবা ধর্মীয়গোষ্ঠীকে হত্যা করা ; তাদের অথবা তাদের সদস্যদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ; কোনো গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও বংশবৃদ্ধি নিরোধ করার জন্য জোর করে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ ; এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীতে সন্তান পাচার ইত্যাদি। গণহত্যা প্রতিরোধ হল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের প্রথম সফল প্রতিশ্রুতি। বলা হয় যে, অপরাধী রাষ্ট্রের বিচার হবে অধিকার ভঙ্গকারী রাষ্ট্রের উপযুক্ত আদালতে বা এমন কোনো আন্তর্জাতিক আদালতে যার উপর চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির নিয়ন্ত্রণ আছে। চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলি এই অধিকার সুরক্ষায় সহায়তা করার জন্য অপরাধীর বিচারের জন্য বিদেশি রাষ্ট্রের কাছে অর্পণ করতেও দায়বদ্ধ থাকবে। এই ব্যবস্থাকেই ইংরেজিতে Extradition বলে। চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলি এই অপরাধে অভিযুক্ত হলে আন্তর্জাতিক আদালতে (International Court of Justicc) তার বিচার হবে।

১৯৫২ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহিলাদের অধিকার সুরক্ষায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে পুরুষের সঙ্গে নারীকেও সমান শর্তে ভোটদানের ও ভোটপ্রার্থী হবার অধিকার দিতে হবে এবং সকল সরকারি কাজে মহিলাদের সমান সুযোগ দিতে হবে। ১৯৬২ সালে এক কনভেনশনে মহিলাদের বয়স, বিবাহে সম্মতি ও বিবাহ বৈধীকরণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে এই সংস্কারগুলি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষ এবং ১৯৭৬-১৯৮৫ সময়কালকে আন্তর্জাতিক মহিলা দশক হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

১৯৫৮ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে কর্মসংস্থানে সকলপ্রকার বৈষম্যের বিলুপ্তি ঘোষণা করে এবং সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহ নিজ নিজ রাষ্ট্রের বিশেষ অবস্থা ও সীমাবদ্ধতা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯৫১ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ শিশুদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি আলোচনা করে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে শিশুদের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করে। ১৯৫৯ সালের ২০শে নভেম্বর সাধারণ পরিষদ ঘোষণা করে : নিরাপদ ও সুখী ভবিষ্যৎ রচনার জন্য প্রতিটি শিশু প্রয়োজনীয় সমস্ত অধিকারও স্বাধীনতার অধিকার পাবে শুধু তাই নয়, শিশুর বেড়ে ওঠার সমস্ত প্রতিশ্রুতি সুনিশ্চিত করে প্রতিটি রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করবে। ১৯৬০ সালে সম্মিলত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, সামাজিক ও সংস্কৃতি শাখা (UNESCO) শিক্ষার অধিকার ও শিক্ষায় সার্বজনীন অংশগ্রহণের অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়।

১৯৬৫ সালে সকলপ্রকার বৈষম্য দূর করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহুত হয়। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্মেলনে উপস্থিত সকল রাষ্ট্রই আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জাতপাত সংক্রান্ত কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ না করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে এবং প্রচলিত আইনে এই ধরনের কোনো সুযোগ থাকলে তা সংস্কার ও বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সঙ্গে এই ধরনের বৈষম্য সৃষ্টিকারী প্রচার ও মতামত আদান-প্রদানও নিষিদ্ধ হয়। ১৯৭১ সালে মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সুরক্ষা সুনিশ্চিত হয়। উল্লেখ করা যায় ১৯৮১ সালটি আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বর্ষ হিসাবে পালিত হয়।

১৯৬৮ সালে তেহরাণ সম্মেলনে তথ্য-প্রযুক্তি ও আধুনিক বিজ্ঞানের প্রসার মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, জাতির সংহতির ও সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে যে সংকট সৃষ্টি করেছে তার সম্যক আলোচনা করে মানবাধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যাগুলি সমাধানের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়।

১৯৫৭ সালে দাস প্রথা, দাস ব্যবসা এবং ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা নিষিদ্ধ হয়।

১৯৬০ সালে মানবাধিকার কমিশন রাজনৈতিক আশ্রয়দানের অধিকারের বিষয়ে একটি ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করে। এইভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তার বিশেষীকৃত সংস্থাগুলি মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাকে কার্যকর করার জন্য অনেকগুলি ইতিবাচক ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপক প্রয়াস গ্রহণ করেছে। প্রতি বছর ১০ই ডিসেম্বর তারিখটি 'মানব অধিকার দিবস' হিসাবে পালিত হয়। মানবাধিকার সম্পর্কে জাতিপুঞ্জ বর্ষপঞ্জি প্রকাশ করে।

১৫.৫ মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জের ভূমিকার মূল্যায়ন

মানবাধিকার রক্ষায় সামগ্রিক এবং নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার দিক প্রকট করে তোলে। এক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হল—সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও তার বিচার বিশ্লেষণের অভাব। কেউ কেউ মানবাধিকার সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের তৎপরতার অভাবকেও দায়ী করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া, দক্ষিণ রোডেশিয়ায় বহুকাল ধরে প্রচলিত বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জ কোনো কার্যকর ভূমিকা অবলম্বন করতে পারেনি। তাছাড়া জাতি বিদ্বেষ আবার প্রাধান্য পাচ্ছে।

এছাড়া দারিদ্র্য, গৃহহীনদের সমস্যা, শিক্ষার অভাব যেভাবে উন্নয়নশীল দুনিয়ার সমস্ত প্রগতিমূলক প্রচেষ্টা স্তব্ধ করে দিচ্ছে, তা মানবাধিকার প্রচেষ্টাকেও উপহাসে পরিণত করেছে। একমাত্র দক্ষিণ এশিয়াতেই ৪০ কোটি মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করে। প্রতিদিন প্রায় ১লক্ষ মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে। গত শতাব্দীর শেষে প্রায় ৮কোটি মানুষ দূষিত জল পান করতে বাধ্য হচ্ছে। প্রায় ১.৫০ কোটি মানুষ প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ নিরক্ষরতা, কুশিক্ষা, কুসংস্কারে জীর্ণ। ২,০০০ সালের মধ্যে

বিশ্বকে নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করার ঘোষণা এখনও পর্যন্ত সফল করা সম্ভব হয়নি। এরই জন্য 'সকলের জন্য শিক্ষার' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়াও সন্ত্রাসবাদ এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাসবাদ মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া আছে জাতিবিদ্বেষ ও জাতিদাঙ্গা। আবিসিনিয়া, সোমালিয়া, বসনিয়া, হার্জিগোভানিয়া, কম্বোডিয়া, অ্যাঙ্গোলা, রুয়াণ্ডায় আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও জাতিগত দাঙ্গায় কয়েক লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাম্প্রতিকতম ঘৃণিত অপরাধ হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আফগানিস্তানের উপর উদ্ধত আক্রমণ এবং শিশু বৃদ্ধ মহিলা সহ নির্বিচার গণহত্যা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতবর্ষের জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ভূখণ্ডে প্রায় প্রতিদিন যে নির্বিচার নৃশংস গণহত্যা চলছে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগকে তা ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত করছে। শুধু রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে প্রতিবেশী পাকিস্তান রাষ্ট্র নয়, ভারত সরকারও এই সন্ত্রাসবাদ দমনে যে নিরাপত্তাবাহিনী নিয়োগ করেছে তাদের অমানবিক কার্যাবলিও ইতোমধ্যে ভারতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৫.৬ ভারতীয় সংবিধানে মানবাধিকার সুরক্ষার অঙ্গীকার

মানবাধিকার সুরক্ষা ও জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠায় ভারতে সংবিধান রচয়িতাগণ বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হন। সংবিধান রচনা করার সময় গণপরিষদ যেসমস্ত রাষ্ট্রের সংবিধানের উল্লেখ ও পর্যালোচনা করেছেন তা নয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রয়াসেরও প্রশংসা করেছেন। মানবিকতা ও মানবাধিকারকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতিগুলির বিভিন্ন বিধান। জওহরলাল নেহেরু সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন ঃ মহাত্মা গান্ধীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতার নীতি প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে সফল করাই ভারতীয় সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য। এর মধ্যে আছে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও সমস্ত প্রকার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শোষণ থেকে নিষ্কৃতি দানের প্রতিশ্রুতি। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই ভারতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার এবং চিন্তার, মতপ্রকাশের, বিশ্বাসের ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও সুযোগের সমতা লাভ ও তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা ও জাতির ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতভাবে রক্ষার অনুকূল ভ্রাতৃভাব বর্ধিত করার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতির অন্তর্গত মানবাধিকার সংক্রান্ত অনেকগুলি আইন প্রণোদিত হয়েছে। যথা—অস্পৃশ্যতা বর্জন আইন, ১৯৫৫ মানুষের উপর অবৈধ নির্যাতন নিরোধ আইন, ১৯৫৬ ; ১৯৬১ সালের যৌতুক অবলুপ্তি আইন (১৯৮৪ ও ১৯৮৬-তে সংশোধিত)। মানবাধিকার সুরক্ষায় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ও দুর্বলশ্রেণির মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য ১৯৯২ সালে তৈরি হয় সংখ্যালঘু কমিশন, ভাষা কমিশন, অনসূচিত জনজাতি ও উপজাতি কমিশন, এবং ১৯৭৩ সালে মহিলা মর্যাদা সুরক্ষা সংক্রান্ত একটি কমিশন।

ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতিগুলির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের উল্লেখ আছে ; কিন্তু মৌলিক অধিকারগুলি যেখানে আদালতে বলবৎযোগ্য, সেখানে রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য নয়। মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির এই বৈষম্য দূর করে মানুষের অধিকারকে আরও কার্যকর ও অর্থপূর্ণ করার জন্য প্রায় চারদশক ধরে বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। এই সক্রিয়তার ফলে মৌলিক অধিকারের ২১ নং ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার পূর্নাবয়ব একটি অধিকারে পরিণত হয়। ১৯৭৮ থেকে শুরু করে ১৯৯৩ সালের মধ্যে ২১নং ধারায়

উল্লিখিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে আরও যেসমস্ত অধিকারগুলি অন্তর্ভুক্ত হয় সেগুলি হল—

(ক) ব্যক্তিগত জীবনযাপনে গোপনীয়তার অধিকার।

(খ) আটক ও বিচার প্রার্থীদের অধিকার।

(গ) জীবনধারণের অধিকার।

(ঘ) মানবিক মূল্য ও মর্যাদার অধিকার।

(ঙ) সরকারি আশ্রয় ভবনে বসবাসকারী শিশু ও মহিলাদের অধিকার ও তাদের সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ জীবনের অধিকার।

(চ) বিনা পয়সায় আইনী পরামর্শ পাবার অধিকার।

(ছ) যেকোনো অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির অধিকার।

(জ) আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকার।

(ঝ) জীবনের অধিকারের সঙ্গে শিক্ষারও অধিকার।

মানবাধিকার সুরক্ষা ভারতবর্ষের একটি জ্বলন্ত সমস্যা। ১৯৮০ সালে পঞ্জাব এবং আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদী চরমপন্থী কাজকর্মকে ঘিরে মানবাধিকার সুরক্ষার বিষয়টি ভারত সরকারের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ চরমপন্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা মিটিয়ে নেবার কথা বলেন। ১৯৯০ সাল থেকে কাশ্মীর উপত্যকায় মানব অধিকার লঙ্ঘনের নিরবচ্ছিন্ন অপপ্রয়াস কোনোভাবেই বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। একদিকে সন্ত্রাসবাদীদের ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে নিরাপত্তারক্ষা কর্মীগণের নির্বিচারে আটক ও হত্যা—এর মধ্যে দিয়ে কাশ্মীর মানবাধিকারের বিষয়টি এখন আন্তর্জাতিক মহলেও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৫.৭ ভারতবর্ষে মানবাধিকার কমিশন গঠনের যৌক্তিকতা

সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতির সুবিস্তৃত তালিকা এবং ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত এই অধিকারগুলির সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা পৃথক একটি মানবাধিকার কমিশন গঠনের যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিল। বিচারপতি ভি. আর. কৃষ্ণা আয়ার (V.R.Krishna Iyer) একটি পৃথক মানবাধিকার কমিশন গঠনের যৌক্তিকতাকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে বলেছিলেন—এই প্রচেষ্টা এক ধরনের আন্তর্জাতিক ভিক্ষাবৃত্তি, দৃষ্টিভ্রম, প্রসাধনী সংযোগ এবং জনগণের কাছে লোভ উদ্রেককারী আইফেন ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বিকল্প হিসাবে সুপ্রীম কোর্টেরই একটি মানবাধিকার শাখা খোলার কথা বলেন।

অন্যদিকে টি. কে. থমমেন (Justice T. R. Thomnen) প্রমুখ বিচারকগণ মানবাধিকার কমিশন গঠনের যাথার্থ দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন এবং বলেন—এই কমিশন আইন ও অধিকার সংরক্ষণ ব্যবস্থার যেকোনো বিচ্যুতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন এবং অম্বুডসম্যানের (Ombudsman) মতো কাজ করবেন। অম্বুডসম্যান হল মূলত একটি ফরাসী ব্যবস্থা যার দ্বারা সংবিধানের দ্বারা দায়িত্ব ও মর্যাদাপ্রাপ্ত কর্তৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তি বা সংস্থার কাজকর্ম ও দায়বদ্ধতার উপর নজর রাখা হয়। এই কমিশন কোনো আদালত নয় ; ধনী-দরিদ্র, সাক্ষর অথবা নিরক্ষর, অগ্রসর

অথবা পশ্চাৎবর্তী সকল মানুষের অধিকার রক্ষার সতর্ক প্রহরা। এছাড়াও যেসমস্ত কারণে মানবাধিকার কমিশন গঠনকে সঠিক বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলি হল—

প্রথমত, আদালতের বিচার প্রক্রিয়া অনেক সময়সাপেক্ষ। সেই ক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (NHRC) সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্টের গুরুত্বপূর্ণ রায়গুলি উপযুক্তভাবে কার্যকর হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সেসমস্ত মানুষ তাদের মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে না, মানবাধিকার কমিশন তাদের অধিকার সংরক্ষণে অভিভাবকত্ব করতে পারে।

তৃতীয়ত, একটি পৃথক কমিশন গঠিত হবে মানবাধিকার রক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গুরুত্ব পাবে এবং সেই সঙ্গে সরকারের কাজেও বিচ্যুতি ঘটলে তা সংশোধন করতে পারবে।

চতুর্থত, ভারত সরকার ১৯৭৯ সালের ১০ই এপ্রিল পৌর, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দুটি আন্তর্জাতিক সনদে সই করেছেন ; অথচ তা কার্যকর করার জন্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত কোনো উপকাঠামো ছিল না।

পঞ্চমত, ১৯৭৫-৭৭ এই দুবছর জরুরি ব্যবস্থা জারির ফলে সংগঠিত গুণ্ডা, সেনাবাহিনী ও দুর্বৃত্তদের অত্যাচারে আইনের অনুশাসন ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি মানুষের বিশ্বাস কমতে থাকে ; আদালতগুলি যথাসাধ্য এর প্রতিকার সাধনে তৎপর থাকলেও একটি পৃথক কমিশন মানুষের অনেক প্রত্যাশা পূরণ করবে বলেই মনে হয়েছিল।

ষষ্ঠত, আদালতে শরণাপন্ন হতে গেলে সাধারণ মানুষকে যে প্রক্রিয়াগত জটিলতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় এবং একটি অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যে বিলম্ব ঘটে এই জাতীয় একটি কমিশন সেই সমস্যার অনেকটা সুরাহা করবে।

এই সমস্ত যুক্তির ভিত্তিতেই রাষ্ট্রপতি ১৯৯৩ সালের ১৪ই মে মানবাধিকার কমিশন সংক্রান্ত একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করেন। এরপরে বিলটি উভয় কক্ষের সমর্থন লাভ করে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করেন ১৯৯৪ সালের ৮ই জানুয়ারি। সরকারী গ্যাজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় ১০ই জানুয়ারি ১৯৯৪। অবশ্য ১৯৯৩ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বরের অতীত প্রথোন্মতা নিয়েই মানবাধিকার কমিশন আইন প্রযুক্ত হয়।

মানবাধিকার কমিশনের পক্ষে আর একটি জোরালো যুক্তি হল আন্তর্জাতিক অপরাধ ও ক্ষমা সংক্রান্ত এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের (Amnesty International)-সমস্ত মানদণ্ড এই আইন মেনে নিয়েছিল। যথা—সরকারের নিয়ন্ত্রণ বিহীনতা, অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্নযোগ্য ব্যক্তিগণের নিয়োগ, আন্তর্জাতিক চুক্তি ও তার প্রয়োগে আনুকূল্য প্রদান, মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনে প্রচলিত আইনের সংশোধন করার ক্ষমতা ; পুলিশ, সেনাবাহিনী ও আধা-সামরিক বাহিনীর কাজকর্মের অনুসন্ধানের ক্ষমতা ; নিজস্ব তদন্তকারী সংস্থা গঠন ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণের ক্ষমতা ; সাক্ষীদের উপস্থিতি ও যেকোনো দলিল, নথিপত্র বা প্রমাণ বাধ্যতামূলক উপস্থাপনের ক্ষমতা ইত্যাদি।

১৫.৮ মানবাধিকার কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি

গঠন—এন. এইচ. আর. সি. (NHRC) -র দুই নং অধ্যায়ে নিয়োগের পদ্ধতি, নিযুক্ত ব্যক্তিদের পদচ্যুতির পদ্ধতি, কার্যকাল ও কাজের শর্তাদি, নিজেদের কর্মপ্রক্রিয়া ও কর্মচারীদের কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৯৩ সালের জাতীয় মানবাধিকার সুরক্ষা আইনের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ৩নং ধারায় কমিশন গঠনের পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে।

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির মর্যাদাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তিকে এই কমিশনের চেয়ারপার্সন নিযুক্ত করা হয়। অন্যান্য সদস্যরা হলেন—

(১) সুপ্রীম কোর্টে বর্তমান অথবা প্রাক্তন বিচারপতি স্থানীয় একজন ব্যক্তি।

(২) হাইকোর্টের বর্তমান অথবা প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি স্থানীয় একজন ব্যক্তি।

(৩) মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দু জন ব্যক্তি।

(৪) (ক) সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারপার্সন ;

(খ) অনুসূচিত জনজাতি ও উপজাতি ;

(গ) কমিশনের চেয়ারপার্সন।

জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন কমিশনের প্রধান কর্মসচিব হিসাবে সদস্যদের মধ্যে একজন সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত হবেন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত একটি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ করবেন।

কমিশনের চেয়ারপার্সন ও অন্যান্য সদস্যগণ ৫ বছরের জন্য নিযুক্ত হবেন ; কিন্তু ৭০ বছর বয়স হয়ে গেলে তারা পুনর্নিয়োগের সুযোগ পাবেন না।

সংশ্লিষ্ট আইনের ৩নং অনুচ্ছেদে কমিশনের নিম্নলিখিত ক্ষমতা ও কার্যাবলির কথা বলা হয়েছে—

(১) নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তদন্ত করবেন ;

(ক) মানবাধিকার লঙ্ঘন অথবা সংশ্লিষ্ট অপপ্রয়াস ;

(খ) সরকারি কর্মচারী কর্তৃক মানবাধিকার সংরক্ষণে গাফিলতি ;

(গ) রাজ্যসরকারের অনুরোধক্রমে রাজ্যসরকারের স্বাস্থ্য, জীবনধারণের মান উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিষেবা গ্রহণের জন্য আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের অবস্থা প্রত্যক্ষ করা ;

(ঘ) কোনো সাধারণ আইন বা সাংবিধানিক আইনে প্রদত্ত মানবাধিকার উপযুক্ত সংরক্ষিত হচ্ছে কিনা দেখা।

(ঙ) সন্ত্রাসবাদ সহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন কারণগুলো অনুসন্ধান করা ;

(চ) মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি ও বিষয়ের পর্যালোচনা করা ও তাদের সঠিক প্রয়োগের জন্য সুপারিশ করা ;

(ছ) মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক গবেষণা কার্যের পরিচালনা ও প্রসার ;

(জ) সমাজের সমস্ত মানুষের মধ্যে মানবাধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানবাধিকার সংরক্ষণে বিভিন্ন রক্ষাকবচগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার করা এবং সভা, সেমিনার ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

(ঝ) উপরিলিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করা।

উল্লেখ করা যেতে পারে সাক্ষীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে বা যেকোনো দলিল অথবা প্রামাণ্য সূত্র উপস্থাপনের ব্যাপারে কমিশন যেকোনো দেওয়ানী আদালতের মতোই তদন্ত ও অনুসন্ধান কার্যপরিচালনার অধিকারী।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের একই পদ্ধতি অনুসরণ করে রাজ্য সরকারগুলি রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠন করবে। রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের ক্ষেত্রেও সমরূপ গঠন প্রক্রিয়া, কর্মকাল, কাজের শর্তাবলি, কাজ ও ক্ষমতার তালিকা অনুসরণ করা হয়েছে। শুধু সুপ্রীম কোর্টের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট, কেন্দ্রীয় সরকারের কমিটির পরিবর্তে রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটি এবং তদন্ত ও গবেষণা ক্ষেত্রে সপ্তম তপশিলে বর্ণিত দুই ও তিন নং তালিকায় সীমাবদ্ধ থাকবে।

সমস্ত অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য রাজ্য সরকার মনে করলে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সম্মতিক্রমে প্রতিটি জেলায় একটি করে মানবাধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কিত সেশন্‌স্‌ কোর্ট তৈরি করতে পারে।

১৫.৯ ভারতীয় মানবাধিকার কমিশনের মূল্যায়ন

১৯৯৩ সালের ১২ই অক্টোবর মানবাধিকার কমিশনের প্রথম চেয়ারপার্সন নিযুক্ত হন বিচারপতি রঙ্গনাথ মিশ্র। ঐ সময় ভারত সরকারের একজন সেক্রেটারির পদমর্যাদা নিয়ে সেক্রেটারী জেনারেল হন বিচারপতি আর. ভি. পিল্লাই (R. V. Pillai), এম. এন. ভেঙ্কট চালাইয়া (M. N. Venkatachaliah) দ্বিতীয় চেয়ারপার্সন নিযুক্ত হন।

মানবাধিকার কমিশন এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তিনটি প্রতিবেদন পেশ করেছে। এই প্রতিবেদনের তথ্য বিশ্লেষণ করলেই মানবাধিকার কমিশনের কার্যাবলি সম্পর্কে একটা সুনিশ্চিত ধারণা তৈরি করা সম্ভব হবে।

প্রথম প্রতিবেদনে ৪৯৬টি অভিযোগ প্রেরিত হয়েছিল বলে বলা হয়েছে। তারপর ২৭৪টি খারিজ হয়ে যায়; বাকি ১৭৪টি অভিযোগের তদন্ত ও অনুসন্ধান হয়। এর মধ্যে ২৬টি অপরাধ ছিল পুলিশ লক আপে আটক ও ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু। এই অপরাধগুলির ভিত্তিতেই মানবাধিকার কমিশন রাজ্য সরকারের কাছে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে সমস্ত জেলাশাসক, পুলিশ সুপারইনট্যানডেন্টকে অপরাধ সংগঠিত হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে রিপোর্ট পাঠাতে বলে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—জম্মু ও কাশ্মীরে বিজবেহরায় সীমান্ত নিরাপত্তা পুলিশের ব্যাপক গুলিচালনার ঘটনায় ৩১জন মানুষের মৃত্যু ও ৭৫ জন নিরীহ মানুষের আহত হওয়ার ঘটনার পূর্ণ তদন্ত। এই ঘটনায় ১৪জন নিরাপত্তা রক্ষীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক অভিযোগের ভিত্তিতে শাস্তির ব্যবস্থা হয় এবং মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতেই ব্যাপক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়। তাছাড়া নিরাপত্তা রক্ষীদের নির্বিচার গুলি বিনিময় নিষিদ্ধ করে বি. এস. এফ-এর ডিরেক্টর জেনারেলকে একটি নির্দেশ পাঠানো হয়। এই ধরনের অনুসন্ধানমূলক কাজ চালাতে গিয়েই মানবাধিকার কমিশন অধিকাংশ জেলে কতগুলি আতঙ্কজনক তথ্যের পরিচয় পান। যথা—অস্বাস্থ্যকর ও বিপজ্জনক ঘনবসতি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অত্যন্ত অপ্রচুর রোগ নিরাময় ব্যবস্থা, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ইত্যাদি। সন্ত্রাস ও ধ্বংস সৃষ্টিকারী প্রতিরোধ আইন প্রয়োগের (TADA-Terrorist and Detention Act) স্বেচ্ছাচারিতার ফলে যে সমস্ত আটকের নির্দয় ঘটনা ঘটে, আইন কমিশনের সঙ্গে এক যৌথ অভিযানে মানবাধিকার কমিশন তা নিরীক্ষা করে। তাছাড়া শিশুর অধিকার, শিশুশ্রম ও মহিলাদের অধিকার নিয়েও কমিশন বিচার-বিশ্লেষণ করে।

১৯৯৪-৯৫ সালে কমিশনের দ্বিতীয় প্রতিবেদনে ৬৯৮৭টি অভিযোগের কথা বলা হয়। তাছাড়া ১৫২টি

জেলাখানায় মৃত্যুর রিপোর্টও কমিশন পায়। ৬৯৮৭টির মধ্যে ৫৭১০টি মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক বিবেচিত হয়। অভিযোগ ও অভিযোগ নিষ্পত্তির পরিমাণ দেখেই স্পষ্ট বোঝা যায় মানবাধিকার কমিশন কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল মানবাধিকার কমিশনই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নির্দিষ্ট বলবৎকালের পরে 'টাডার' প্রচলন নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব দান করে। মানবাধিকার কমিশন বহু জেলখানার অবস্থা ঘুরে ঘুরে দেখে এবং ১৮৯৪ সালের ভারতীয় জেলখানা আইনের সংশোধনের কথা বলে।

মানবাধিকার কমিশনের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত। এই কমিশনই অরুণাচলপ্রদেশের সরকারকে গারো এবং হাজং উপজাতীয় অধিবাসীগণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দান করে। শ্রীলঙ্কার তামিল উদ্বাস্তুদের অনতিবিলম্বে পুনর্বাসনের নির্দেশ দান করে তামিলনাড়ু সরকারকে। এছাড়া কমিশন সুনির্দিষ্ট তদন্তের ভিত্তিতে শিশু শ্রম ও শিশু-বনিতা বৃত্তি দূর করার জন্য একটি কার্যকরী গোষ্ঠী গঠন করে। উড়িষ্যায় অনাহারে মৃত্যু এবং রাজস্থানে পুলিশের মৃত্যুর বিষয়গুলিও কমিশনের বিবেচনার মধ্যে ছিল এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও তাদের আত্মীয়স্বজনকে ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা গ্রহণেও কমিশন রাজ্যসরকারকে বাধ্য করে। একই সঙ্গে উল্লেখ করা যায় রাজ্যসরকার পরিচালিত মানসিক হাসপাতালগুলির পরিষেবা সম্পর্কিত ত্রুটিও কমিশনের দৃষ্টি এড়ায়নি। ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে মানবাধিকার কমিশন গঠন করে। অন্যান্য রাজ্যগুলিও ধীরে ধীরে কমিশন গঠনের সুস্পষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

১৫.১০ সংক্ষিপ্তসার

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে মানবাধিকারের বিভিন্ন দিকগুলি আলোচিত হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে প্রত্যক্ষভাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও মানবাধিকার সম্পর্কিত কোনো আলোচনা এই এককে স্থান পায়নি। কিন্তু মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক ও তার বিস্তৃত আলোচনা গ্রামও পৌর প্রশাসন সংস্থাকে যথেষ্ট সাহায্য করবে। উল্লেখযোগ্য যে ভারতবর্ষে প্রথম মানবাধিকার আইন রচিত হয় পশ্চিমবঙ্গেই এবং তদনুযায়ী একটি মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি এই কমিশনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রেখে চলতে পারে এবং তাদের এলাকায়, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, সামাজিক কুসংস্কার থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে ঘটনাগুলি ঘটতে পারে, তার সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে তুলতে পারে। স্বাস্থ্যরক্ষা পানীয় জল, আন্ত্রিক এবং সংক্রামক রোগ নিরাময় ইত্যাদি সম্পর্কে গ্রাম সংসদ আরো অনেক বেশী প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এবিষয়ে স্বেচ্ছা সংস্থাগুলিরও একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। আবার ঘনবসতিপূর্ণ শহরের ঘিঞ্জি ও বস্তি এলাকায় এবং প্রকট আবাসন সমস্যার মধ্যে যে অস্বাস্থ্যকর এবং অবৈধ জীবনযাত্রা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে ; স্বাস্থ্যরক্ষার ন্যূনতম উপাদানগুলি যেভাবে দূষিত হয় পৌর প্রশাসকগণ তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপকতা অনেক কমানো যায়। স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলিকে মানবাধিকার বিষয়ে সচেতন করার কাজে বর্তমান পাঠ অনেকখানি সাহায্য করবে।

১৫.১১ অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ আকারে উত্তর দিন ঃ

(ক) মানবাধিকার বিকাশের দীর্ঘ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করুন।

(খ) মানবাধিকার রক্ষায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করুন।

(গ) মানবাধিকার রক্ষায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

(ঘ) ভারতীয় সংবিধানে মানবাধিকার রক্ষার বিষয়গুলি বিশদ আলোচনা করুন।

(ঙ) ভারতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যাবলির মূল্যায়ন করুন।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(ক) প্রাচীন ভারতবর্ষে যুদ্ধ সংক্রান্ত নিয়মাবলির উল্লেখ পাওয়া যায় কোন্ কোন্ শাস্ত্রীয় গ্রন্থে? তাদের সময়কাল নির্দেশ করুন।

(খ) 'ম্যাগনা কার্টা' বা মহাসনদ কী?

(গ) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কী? তার কাজগুলি কী কী?

(ঘ) মানবাধিকার চেতনার উদ্ভবে ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে প্রণীত কতগুলি উল্লেখযোগ্য আইনের উল্লেখ করুন।

(ঙ) মানবাধিকার সুরক্ষায় জাতিসংঘের ভূমিকা আলোচনা করুন।

(চ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণায় উল্লিখিত অধিকারগুলি কী কী?

(ছ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোন্ কোন্ অপরাধকে গণহত্যা বলে চিহ্নিত করেছে?

(জ) ভারতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের পক্ষে আপনার মতে প্রধান দুটি যুক্তি কী?

(ঝ) ভারতীয় মানবাধিকার কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদানের উল্লেখ করুন।

৩। সংক্ষিপ্ত দু-একটি বাক্যে প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকারের ঘোষণা হয় কবে? কতগুলি রাষ্ট্র এই ঘোষণার সাক্ষর করে?

(খ) কোন বছরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গণহত্যা বন্ধকারী আইন রচনা করে? এই আইনে কতগুলি রাষ্ট্রের সম্মতি ছিল?

(গ) ইংরাজীতে Extradition (এক্সট্রেডিশন) বলতে কী বুঝায়?

(ঘ) কোন্ বছরকে আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়?

(ঙ) কোন দিবসটি মানবাধিকার দিবস হিসাবে চিহ্নিত?

(চ) ভারতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয় কবে?

(ছ) ভারতীয় মানবাধিকার কমিশনের নেতৃত্ব দান করেন কে এবং তিনি কতদিন পর্যন্ত দায়িত্বে বহাল থাকেন?

(জ) এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল কী?

(ঝ) প্রথম মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন কে ছিলেন?

১৫.১২ গ্রন্থপঞ্জি

(ক) Chiranjevi T. Nirmal-- *Human Rights in India, Oxford Publications.*

(খ) H. O. Aggarwala-*Implementation of Human Rights Covenants with special reference of India,* Kitab Mahal, Allahabad.

(গ) P. N. Bhagabati--*Dimensions of Human Rights* (From Legal Aid as a Human Right).

(ঘ) A. R. Desai--*Violation of Democratic Rights in India, Popular Prahashan.*

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, [illegible]গুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

—*সুভাষচন্দ্র বসু*

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—*Subhas Chandra Bose*

Price : Rs. 150.00

Published by Netaji Subhas Open University, 1, Woodburn Park, Kolkata-700 020 & Printed at Prabaha, 45, Raja Rammohan Roy Sarani, Kolkata-700 009, Phone : 2354 5688